এপিডেমিক

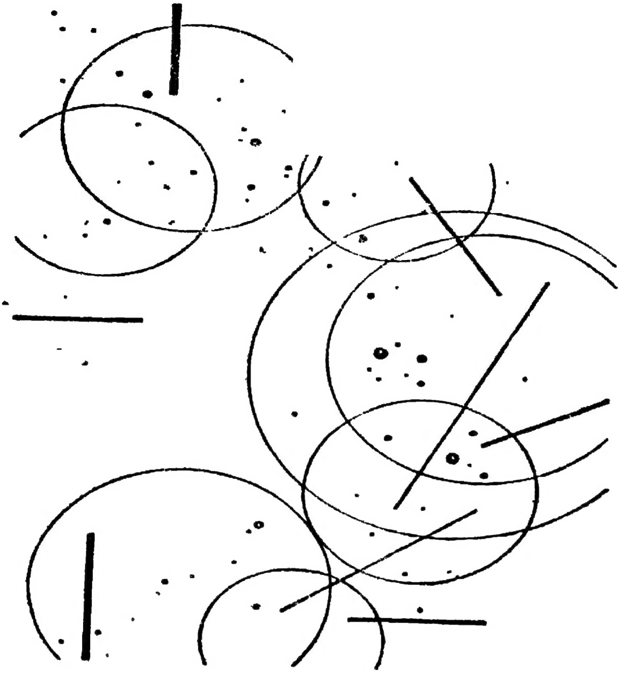

সুনীলকুমার ঘোষ

বসু চৌধুরী
৬২এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯

প্রকাশক ঃ শ্রীশুভেন্দু চৌধুরী
৬৭-এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

মুদ্রণ ঃ শ্রীসুনীলকুমার রুদ্র
রুদ্র এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ (প্রিন্টিং সেক্‌সন)
৩২, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-৬

ব্লক ঃ স্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীগণেশ বসু

প্রথম প্রকাশ ঃ আষাঢ় ১৩৬৯
জুন ১৯৬২

সারাটা দিনই প্রায় ধুঁকতে-ধুঁকতে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল ট্রেণটা। বিকেলের দিকে একটা দেহাতি স্টেশনে থামল। ভুস-ভুস করে খানিকটা ধোঁয়া ছাড়ল, দেহটা টান করে দিল। তারপর চুপ করে গেল।

এইটিই এদিককার শেষ স্টেশন। এর পরেই এদিকে-ওদিকে পাহাড়ের ঘন বসতি, আরণ্য শিশুর স্বচ্ছন্দ বিহার। কড়া পাহারা ওদের। যন্ত্রদানবের প্রবেশ নেই ওখানে।

স্টেশন থেকে পাকা দু'টি মাইল মাটিতে-বালিতে-পাথরে মেশামেশি। তার পরেই সদানন্দদেবের আস্তানা। আনন্দধাম।

চারিদিকেই পাহাড, অথবা উঁচু-নিচু পাথরের টিলা। তাদের গায়ে-মাথায় ঘন সবুজের অরণ্য। দীর্ঘ তরু, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ছোট-বড় ঝোপ। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হবে একটি প্রশস্ত উপত্যকা। এই অমসৃণ আরণ্য ধূসরতার মাঝখানে আধুনিকতার আভিজাত্যে অনেকটা ছন্দপতনের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে আশ্রমটি।

ঘড়ির হিসাবে সন্ধ্যা নামার কথা নয়। কিন্তু এখানে সন্ধ্যার ছায়া আলতো ভাবে নেমে এসেছে। সেই স্বল্প আলোতে আশ্রমটিকে একটি শান্ত সমাহিত কাব্যবিতান বলেই মনে হল রবীনের।

আয়তনে বড না হ'লেও, আশ্রমটির পিছনে যে বেশ একটি যত্ন আর প্রচেষ্টা রয়েছে সেটুকু বোঝা গেল। সামনেটায় কাঁটাতারের বেড়া। প্রধান ফটক থেকে একটি খোয়া-মেশান লাল-পথ আশ্রমের দুইদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মাঝামাঝি জায়গায় একটি মন্দিরের উঁচু চূড়া; শেষ সূর্যের স্তিমিত আলোতে একটু চিকচিক করছে। যতদূর দেখা যায়, গাছের ঘন সুশৃঙ্খল বিন্যাস; ছোট, বড়, মাঝারি। অশ্বথ, বট, দেওদার, পাইন, বকুল, কদম, আর মাঝে মাঝে কয়েকটি কৃষ্ণচূড়া। কিছু মহুয়াও রয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে অজস্র ফুলের সমারোহ। ফুল আর বৃক্ষছায়ায় জায়গাটি স্নিগ্ধ আর মনোহর।

অন্ধকার ক্রমেই গাঢ় হয়ে উঠছে। ঘুরতে ঘুরতে একটি দিঘির কাছে গিয়ে দাঁড়াল রবীন। জলের চেহারা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না; কিন্তু তার মৃদু আলোড়ন

কানে আসছে। কোথায় যেন একটি পাহাড়ী ঝর্ণার গলায় ঘুমপাড়ানি গানের মহরৎ সুরু হয়েছে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর তার শরীর জুড়ে একটা ঘুমের আবেশ নামছে।

ধীরে ধীরে জলের রঙ বদলে গেল। মনে হল, কে যেন অজস্র মোহর ছড়িয়ে দিল জলের বুকে। চাঁদ উঠেছে। অন্ধকারকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে সারা পৃথিবীর বুকে। কতক্ষণ যে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেটা খেয়াল ছিল না রবীনের।

আপনারই নাম কি রবীন বাবু?

চমকে উঠল রবীন। দেখল, মুণ্ডিত মস্তক একজন সাধু দাঁড়িয়ে তার পিছনে।

হ্যাঁ।

আসুন; আচার্যদেব আপনাকে স্মরণ করেছেন।

চলুন।

আশ্রমের পথ ধরে দুজনেই এগিয়ে চলল। পথের দুপাশে মাঝে মাঝে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে উঠেছে। সামনেই নাটমন্দির। নাটমন্দির পিছনে ফেলে আরও কিছুটা পথ যেতে হল ওদের। তারপরেই ছবির মত ছোট ছোট বাড়ীগুলি। লতায়-পাতায় ঘেরা। সামনে একটি করে ছোট বাগান।

এই ধরনেরই একটি বাড়ীর সামনে হাজির হল দুজনে; আশেপাশের বাড়ীগুলির চেয়ে এটি একটু বড। আর কোন পার্থক্য চোখে পড়ল না।

সামনের দিকে চেয়ে দেখতেই রবীনের চোখে পড়ল একটি সাইনবোর্ড: আচার্যপল্লী।

পথপ্রদর্শক এইখানে থেমে বললে: আমাদের আচার্যদেব থাকেন এখানে। আপনি ভিতরে যান। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন তিনি।

গেটটি খুলে ভিতরে ঢুকে গেল রবীন। বাগান পেরিয়ে লম্বা দালান। সামনে পড়ল একটি মাত্র ঘর। দরজা খোলা। ভিতরে জোরাল বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে। দরজার ওপর একটি হালকা নীল রঙের পর্দা। মাঝে মাঝে হাওয়ায় উড়ছে।

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল রবীন। বেশ বড় ঘর। দক্ষিণদিকে কয়েকটি জানালা। লাল সিমেণ্টের মেঝে। কোথাও কোন মালিন্য নেই। দরজার দিকে মুখ করে একটি পুরু গদীর ওপর অজিন আসন বিছিয়ে বসে রয়েছেন সদানন্দদেব। তাঁর পাশে আর দুজন। তাদের পোষাকও গেরুয়া। দূরে একটি জলচৌকির ওপর গৌর-নিতাই এর ছবি।

সদানন্দদেবের সামনে কয়েকটি মোটা খাতা। তারই একটির পাতা উল্টাচ্ছিলেন তিনি।

রবীন ঘরে ঢুকতেই সদানন্দদেব খাতা বন্ধ করে একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেনঃ এতক্ষণ কোথায় ছিলি রে? আমরা তো তোর আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম।

রবীন বললেঃ একটু এদিক-ওদিক ঘুরছিলাম।

উপবিষ্ট দুজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন সদানন্দদেবঃ তারাদাস, আর ইনি হচ্ছেন নিতাই ব্রহ্মচারি।

তারপর রবীনের দিকে লক্ষ্য করে ওদের বললেনঃ এর কথা আগেই বলেছি। আমাদের আশ্রমের নতুন ডাক্তার। এখনও তোর কোয়ার্টার তৈরি হয়নি রবীন। শীগগীরই হয়ে যাবে। আপাতত তোর জন্যে তারাদাস একটা আস্তানা যোগাড় করেছে।

রবীন জিজ্ঞাসা করলেঃ ডাক্তারখানাটা কোথায়?

তারাদাস হেসে বললেনঃ এখনও কিছুই নেই, ডঃ দত্ত। সবই আপনাকে তৈরি করে নিতে হবে।

সদানন্দও সমর্থন করলেন তারাদাসকেঃ ঠিক, ঠিক। চাকরিটা এখানে গৌণ। আসল হ'ল কাজ। কেতাব-দুরন্ত ডাক্তারের চেয়ে কর্মীরই দরকার বেশী আমাদের।

তারাদাস বললেনঃ তাই আমরা আপনার মত একজন যুবককেই চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন ওসব আলোচনা থাক। কাজে নামলেই সব বুঝতে পারবেন। আপাতত বিশ্রাম করবেন চলুন।

সদানন্দ বললেনঃ সেই ভাল।

রবীনকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তারাদাস। গেটের কাছে যে লাল কাঁকরের রাস্তাটা রবীনের চোখে পড়েছিল এখানে সেটা নেই। তার বদলে রয়েছে কাঁচা পথ। দুপাশে কিছু কিছু ইট-পাথরের কাজ চলেছে।

বাঁশ, ইট, পাথর, আর কাঠের বিশৃঙ্খল স্তূপ এড়িয়ে একটি বাড়ীর সামনে দাঁড়ালেন তারাদাস। বললেনঃ এইটি আমাদের অতিথিভবন। দেশ-বিদেশ থেকে অনেক সম্ভ্রান্ত অতিথির পায়ে ধুলো পড়ে এখানে। সহর থেকে দূরে এই পাহাড়তলীর মধ্যে ইচ্ছে থাকলেও তাঁদের সেবা করার সুবিধে আমাদের নেই।

তাঁদের যাতে অসুবিধে না হয় সেই ভেবেই অতিথিভবনের পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হয়েছে।

কথা বলতে-বলতে দুজনে ভিতরে ঢুকে এল। তারপর একটি ঘরের সামনে এসে তারাদাস বললেন: আপনার কোয়ার্টার না হওয়া পর্যন্ত এই ঘরটিই আপনার জন্যে বরাদ্দ হয়েছে। একটু অসুবিধে হবেই। তবে....

রবীন বললে: কী যে বলেন? অসুবিধে হলেই হল?

একটু যেন বিব্রত বোধ করেন তারাদাস: না, না, সে কি কথা! নতুন জায়গা, অসুবিধে একটু হবেই। তবে কি না....সবই নির্ভর করে মানিয়ে নেওয়ার ওপর।

ঘরের মধ্যে ঢুকে তারাদাস বললেন—আজ তাহলে বিশ্রাম করুন। আমি এখন....

নিশ্চয়, নিশ্চয়; আসুন।

হাত তুলে নমস্কার করল রবীন।

তারাদাস দুচার পা এগিয়ে গিয়ে পিছন ফিরে বললেন: জায়গাটা বড় নির্জন, ডঃ দত্ত। ভয় করবে না তো?

রবীন তারাদাসের ইঙ্গিতটা বুঝতে না পেরে একটু অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

তারাদাস সহজ হয়ে বললেন: এই সময়টা আশ্রমিকদের সাধনভজনের সময় কি না। তাই এত চুপচাপ। নইলে..........

রবীন বললে: তাই বুঝি? না, না। নির্জনতায় আমার কোন অসুবিধে নেই।

তারাদাস আর কোন কথা না বলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এতক্ষণে ঘরটির ভিতরে চেয়ে দেখার সুযোগ হ'ল রবীনের। তার দুটো বড় সুটকেশ, আর বিছানা আগেই পৌঁছে গিয়েছে। একপাশে একটি শূন্য খাটিয়া। তার পাশে একটি ড্রেসিং টেবিল। ড্রেসিং টেবিলের লাগোয়া একটি ট্রিপয়—দুপাশে দুটি চেয়ার। ঘরের এক কোণে একটি ইজিচেয়ার, আর একখানি আলনা। ড্রেসিং টেবিলের উপর স্নানের সাজ-সরঞ্জাম পরিপাটি করে সাজানো।

পুরো দুটি দিনের একটানা ট্রেণের ধকল আর সেই সঙ্গে ধোঁয়া ও ধুলো-বালিতে সত্যিকার ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল রবীন। তাই আর দেরি না করে জামা, কাপড়, তোয়ালে, সাবান নিয়ে সে তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে ঢুকে গেল। কল খুলে তারই নিচে এলিয়ে দিলে দেহ।

স্নানঘর থেকে বেরিয়ে রবীন দেখল, এরই ভিতর ঘরটিও তার প্রসাধনপর্ব শেষ করেছে। শূন্য খাটিয়ার ওপর সাদা ধবধবে বিছানা পড়েছে, এসেছে বালিশ। মাথার ওপর মশারি খাটানো হয়েছে। ড্রেসিং টেবিলের ওপর একটি চিনেমাটির ঝকঝকে ফ্লাওয়ার ভেস-এ রজনীগন্ধার কয়েকটি তাজা ডাঁটাও রয়েছে দেখা গেল।

অথচ কেউ কোথাও নেই। চারদিকে নিস্তব্ধতা থমথম করছে। এখনও হয়ত আশ্রমিকদের সাধনভজন শেষ হয় নি। তবু যেন ঘরটির দেওয়ালে-দেওয়ালে একটি অদৃশ্য হাতের ছোঁয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একটু ভাববার কথাও যে নেই, তা নয়। তারাদাস তাকে এই ঘরটিতে পৌঁছে দিয়েই চলে গিয়েছেন। আর তিনি আসবেন কি না, না এলে, কে আসবে, আর কখন আসবে, প্রয়োজন হলে কাকে ডাকতে হবে, ডাকলে কারুর সাড়া পাওয়া যাবে কিনা, এই সব সমস্যাসঙ্কুল প্রশ্নগুলি তারও মনে আসে নি, তারাদাসও সে-সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্চ করেন নি।

বর্তমানে তার প্রয়োজন কেবল এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল, আর বিছানা। দ্বিতীয়টি আগেই তৈরি হয়ে রয়েছে। তবে কি সেই অদৃশ্য হস্তটি প্রথম প্রয়োজনের কথা খেয়ালেই আনে নি? রবীন জানালার দিকে চেয়ে দেখল। না, ঠিকই রয়েছে। একটি কাঁচের জগ, তার মাথায় ঢাকা একটি কাঁচের গ্লাস। ঢকঢক করে পর পর দুটি গ্লাস জল খেয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলে রবীন।

হয়ত নয়, সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিল রবীন। আচমকা ঘুমটা ভেঙে গেল। ঘুমের ঘোরে আলতো চোখে চেয়ে দেখল সে।

তার বিছানার পাশে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। অত্যন্ত সাধারণ পোষাক। লম্বা, দোহারা চেহারা। পরিচ্ছন্নতা তার সর্বাঙ্গে। মাথার চুলগুলি এলো করা। সেই সঙ্গে জড়ানো একটি বেল ফুলের মালা। চোখ দুটি বড বড়। যেন অবাক হয়ে তার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে রয়েছে।

মাথাটায় ঝাকানি দিয়ে বিছানায় উঠে বসল রবীন। তার চোখের পাতাগুলি তখনও করকর করছে।

মেয়েটি বললে: বাইরে থেকে দেখলাম, আপনি স্নান সেরে ঘরে এলেন। তারপর মাত্র কুড়ি মিনিট হয়েছে। ফিরে এসে দেখি ঘুমে অচৈতন্য আপনি। খুব পরিশ্রম হয়েছে বুঝি?

একটু লজ্জা পেল রবীন: তা একটু হয়েছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছেন নাকি?

মেয়েটি দুপা পিছিয়ে গিয়ে বললে: একটু তো বটেই। অনুদি দুবার ঘুরে গিয়েছেন।

অনুদি কে?

আমাদের কিচেনের সুপারভাইসর

ওঃ! আর আপনি?

মেয়েটি রবীনের দিকে পিছন করে টি্রপয়ের ওপর রাখা খাবারের ঢাকা খুলতে খুলতে বললে: বাবুর্চি।

খাবারটি খুলে ফিরে দেখলে রবীন তারই দিকে চেয়ে রয়েছে।

বুঝতে পারলেন না? বাংলায় যাকে বলে বাধুনী।

বুঝেছি।

চোখমুখের যা অবস্থা, তাতে এক্ষুণি না উঠলে আবার ঘুমিয়ে পড়বেন; বাথরুম থেকে বেশ ভাল করে চোখ মুখ ধুয়ে আসুন। যান।

রবীন উঠে পড়ল। তারপর বাথরুমে চোখমুখের ওপব ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে ফিরে এল ঘরে। মেয়েটির হাত থেকে তোয়ালে নিযে মুখচোখ রগড়ে-রগডে মুছলো।

সব খেয়ে নিন। রাত্রের খাবার আসতে সেই বারটা।

একখানা লুচি মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে রবীন জিজ্ঞাসা করল: কেন?

আজ আরতির পর ভজন সুরু হবে।

ওঃ।

আর কোন কথা না বলেই মেয়েটি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল; একটু পরে ধূমায়িত এক কাপ চা নিয়ে হাজির হল।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে রবীন বললে: দেখলেন, আসল ব্যাপারটাই ভুলে যাচ্ছি। মানে, আপনার নামটাতো এখনও জানা হল না।

আমার নাম? নামের কোন দরকার আছে কি?

বাঃ, আমাকে যে এখন থাকতে হবে। আমি চাকরি করতে এসেছি যে?

ওঃ! অন্য কোথাও জুটল না বুঝি?

রবীন এবারেও অবাক হয়ে চাইল মেয়েটির দিকে। কিছুই দেখা গেল না। সে মুখ নিচু করে ড্রেসিং টেবিলটার ধুলো ঝাড়ছে।

রবীন বললে: চাকরি যখন করতে হবে, তখন আর স্থান-অস্থান কি? আর সত্যি কথা বলতে কি, যেটুকু দেখেছি তাতে আপনাদের আশ্রমটি আমার ভালই লেগেছে।

সে আমাদের সৌভাগ্য।

ছোট, খাটো, কেতাবদুরস্ত উত্তর। নেহাৎ বলার জন্যেই বলা।

আবার সে চেয়ে দেখল মেয়েটির দিকে। না, সেখানে কোন ভাবান্তর নেই, নেই এতটুকু কৌতূহল। তার হাবভাব অত্যন্ত স্বাভাবিক, আর নিয়মতান্ত্রিক। এতটুকু খুঁৎ নেই তার চলনে-বলনে।

চা খাওয়া শেষ হল। সব কিছু পরিষ্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল মেয়েটি।

কই, নাম বলে গেলেন না?

মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ল; তারপর বললে: শীলা। শীলা লাহিড়ী। অবশ্য ইচ্ছা ক'রলে দুঃশীলাও বলতে পারেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল শীলা। তার যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে রইল রবীন। সেখানে চাঁদের আলোর সঙ্গে ঘরের আলো মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। ঘরের ঠিক সামনে যে করবীর ঝাড়টা এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, তার পাতাগুলি এবার দুলতে সুরু করেছে। রবীন উঠে পড়ল; পায়চারি করল দু'চারবার; দক্ষিণদিকে একটা জানালা, তার শিকের ওপর হাতে ভর দিয়ে দাঁড়াল একটু, বার দুই হাই তুলল, তারপর ফিরে এসে টান হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

রাধাকৃষ্ণের মন্দিরের কাছাকাছি একটু কোলাহল জেগে উঠেছে। শুয়ে শুয়েই বুঝতে পারল রবীন। মানুষের যাওয়া-আসা চলেছে। তাদের কথাবার্তার অস্ফুট গুঞ্জন ভেসে উঠেছে; সেই সঙ্গে টুকরো-টুকরো শব্দ কানে আসতে লাগল।

হঠাৎ একসঙ্গে বেজে উঠল কাঁসর, ঘণ্টা, খোল, করতাল, মৃদঙ্গ—আর সেই সমবেত ঐক্যতান বাদনের উচ্চনাদ রাত্রির স্তব্ধতাকে টুকরো-টুকরো করে ভেঙে দিয়ে আশ্রম ছেড়ে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ল; দূরের ঐ পাহাড়তলী আর অনন্ত বনরাজি অবাক বিস্ময়ে ক্লান্ত চোখে চেয়ে রইল আশ্রমের দিকে।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে আরতি চলল। কিছু বেশীও হতে পারে। রবীন বিছানায় শুয়ে শুয়ে সব শুনল। অথবা শুনল না কিছুই। সমস্ত ক্ষণই দক্ষিণ-

দিকের জানালার ভিতর দিয়ে আকাশে চাঁদের দিকেই চেয়ে রইল। কিছুই ধরা পড়ল না তার চোখের তারায়, তার মনের তন্ত্রীতে ধরা দিল না কোন আবেদন। সে নিজের মধ্যেই নিজে ডুবে গেল।

মাত্র কটা দিন, কটি ঘণ্টারই বা হেরফের। এরই ভিতর তার মনে হল, সে যেন অনেক নদী, অনেক সমুদ্র পার হয়ে এসেছে।

কলকাতা থেকে কতদূরেই বা সে এসেছে? মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার দূরত্ব। কিন্তু তার মনে হল সে যেন ধ্রুবনক্ষত্র থেকে দূরে পাড়ি জমিয়েছে।

কেন সে এতদূরে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছে? কেন, তা সে নিজেই জানে না। জানতে চেষ্টাও করে নি। বন্ধুবান্ধবরা তার এই চাকরি নির্বাচনে টিটকিরি দিয়েছে। ডাক্তারি পাশ করে কলকাতা ছেড়ে কেউ বনবাসে যায়? মওকা লোটার এমন উর্বর ক্ষেত্র তামাম দুনিয়ায় আর দুটি পাবে না। একটা হসপিটালে কিছুদিন লেগে থাক; প্রফেসারের পিছনে ঘুরতে না পার, য়্যাসিসটেন্ট প্রফেসরের পিছনে পিছনে বছর দুই ঘুর-ঘুর কর। তারপর একটা ড্রাগিস্টশপ খুলে দাও। ফি প্রথম থেকেই ষোল টাকা না পার, আট টাকা কর। এনগেজমেণ্ট-খাতায় ভূরি-ভূরি ভুয়োনাম লিখে রাখ। রোগীর বাড়ীতে যখন যাওয়ার কথা ঠিক তার চল্লিশটি ঘণ্টা পরে যাও। কাজ না থাকে, চেম্বার থেকে সোজা বাড়ীতে গিয়ে মটকা মেরে পড়ে থাক। অর্থাৎ নিজের ডিম্যাণ্ড বাড়াতে পারলে, একটি বছরও অপেক্ষা করতে হবে না তোমাকে। হু হু করে পসার বেড়ে যাবে। সুতরাং, সোনা যদি ফলাতেই হয়, তাহলে তার সর্বোত্তম ক্ষেত্র হচ্ছে এই কলকাতা।

রবীন জানে কথাগুলির মধ্যে এতটুকু আতিশয্য নেই। কলকাতার মত জায়গায় অর্থ রোজগার করাটা বড় কথা নয়; সব চেয়ে বড় কথা হ'ল, অর্থ রোজগারের পথটি বেছে নেওয়া। সেই দিক থেকে বিচার করলে ডাক্তারি ব্যবসাটি যে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু মাঝে-মাঝে এমন মানুষও জন্মায় যাদের সঙ্গে এ-বিশ্বের কোথায় যেন একটা বিশেষ গরমিল রয়েছে। তারা কিছুতেই এখানকার চিরাচরিত, অথবা বাঁধা সড়কে চলতে পারে না; আর পারে না বলেই, তাদের কাছে য়্যাকসিডেণ্ট অনিবার্য হয়ে পড়ে।

জ্ঞান হওয়ার পর মাকে সে দেখেনি। দেখেছিল বাবাকে। এলাহাবাদের কোন একটি সরকারি অফিসের কেরানী ছিলেন অবিনাশবাবু। শান্ত, শিষ্ট, ভদ্র ও অল্পভাষী। কাজের অবসরে ছেলেকে নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াতেন, গল্প করতেন, হাসতেন। আবার কখনও কখনও গম্ভীর হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকতেন। আর মনে পড়ে, টেবিলের উপর সাজানো মায়ের সেই বড় বাঁধানো ফটোটার কথা, যার দিকে প্রতিদিনই কিছু না কিছু সময় একদৃষ্টে চেয়ে বসে থাকতেন তিনি।

একটু বড় হয়েই বুঝতে পারল, কেন অবিনাশবাবু তাকে নিয়ে একলা থাকতেন। তার একমাত্র কারণ তার মা। যে-যুগে আন্তর্জাতিক বিবাহ অনুমোদিত, সে-যুগে আন্তশ্রেণী বিবাহ নিয়ে তাদের সমাজ এতটা হৈ হৈ করল কেন রবীন তা বুঝতে পারে নি। কিন্তু রবীন বুঝতে না পারলেও যা ঘটেছিল তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। ব্রাহ্মণ আর কায়স্থের এই বিয়েটি দু' তরফের আত্মীয় স্বজনদের কেউই মেনে নেয় নি। ফলে, অবিনাশবাবু সযত্নে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছিলেন। স্ত্রী-বিয়োগের পর একবার অবিনাশবাবুর বাবা তোড়জোড় করেছিলেন ছেলের বিয়ে দিতে ; কিন্তু পারেন নি।

রবীন যেবার ম্যাট্রিক পাশ করল সেইবারের কথা। মোটামুটি ভাল ছেলে রবীন। অবিনাশবাবুর সখ, ছেলে ডাক্তারি পড়ে। এবং যেহেতু ডাক্তারি পড়ার পক্ষে কলকাতাই শ্রেষ্ঠ স্থান, সেই হেতু তারই প্রস্তুতি হিসাবে আই, এস, সি'র দুটো বছর কলকাতাতে থাকাই তার পক্ষে বাঞ্ছনীয় বলে তাঁর মনে হল। কলকাতার একটি কলেজে ভর্তি করে দিলেন অবিনাশবাবু। যে কটা দিন তিনি কলকাতায় বদলী হতে না পারেন সে কটা দিন কলেজ হোস্টেলে থেকেই লেখাপড়া করুক। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করতে তখনও বছর দশেক দেরী ছিল তাঁর। তারই ভিতর ছেলেকে তিনি মানুষ করে তুলতে পারবেন এ বিশ্বাস তাঁর ছিল।

কিন্তু ভগবান নামে অরসিক দেবতাটির চিন্তাধারার সঙ্গে মানুষের চিন্তাধারার মিল হয় না। বরং দুটি জিনিষই যেন বিপরীতমুখী। তাই যদি না হবে, তাহলে রবীন কলেজে ভর্তি হওয়ার ঠিক দুটি মাস পরেই বা তাঁকে হঠাৎ নোটিশ না দিয়ে চাকরি এবং এই জগতের সমস্ত রকম চাহিদা থেকে অবসর নিতে হবে কেন ?

পূজার ছুটির পর ছেলেকে নিয়ে কলকাতায় আসছিলেন অবিনাশবাবু।

অন্ধকারের বুক চিরে আপনার মত্ত আবেগের উন্মত্ততায় ছুটে চলেছিল ট্রেণটা। যতদূর মনে পড়ছে রবীনের, সে তখন জানালার ধারে বেঞ্চটার উপর শুয়ে নীল আকাশের দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল। ট্রেণের চাকার একটানা খটাখট আওয়াজ আর দুপাশে প্রচ্ছদপটের দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে হচ্ছিল সেও যেন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে আকাশের ঐ অযুত নক্ষত্ররাজির দিকে। কিসের যেন একটি দুর্ণিবার আবেশে তার বুকখানা ভরে উঠেছিল—

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ঝাঁকানি, তারপরেই তীব্র আর্তনাদ আর ভয়ার্ত চীৎকার। মনে হল, যেন হাজার-হাজার বোমা ফাটছে তার মাথার উপর। কী যে হল, কী যেন ঘটে গেল, কিছুই বুঝল না সে। তার সম্বিত ফিরে এলে দেখল, ট্রেন থেকে কিছুটা দূরে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কেমন করে যে সে ঐ জায়গায় এল কিছুতেই ভেবে গেল না রবীন—ভাববার শক্তিই বুঝি হারিয়ে ফেলেছিল তখন।

অনেক মানুষ মরেছিল সেদিন, যদিও সরকার হিসেব দিয়েছিলেন কুড়ি জনের। কুড়িজনই হক আর যাই হক, সেই মৃতদের মধ্যে অবিনাশবাবুও ছিলেন একজন, রবীনের জীবনে সেইটাই হল সব চেয়ে বড় কথা।

আত্মচিন্তায় বহু এলোমেলো জট পাকিয়ে উঠেছে রবীনের। একটা নিদারুণ অস্বস্তিতে ভরে উঠছে তার সমস্ত দেহ আর মন। মনে হল, তার বুকের হাড়-পাঁজর চুরমার করে একখানা পাগলা ইঞ্জিন যেন হুস হুস করে এগিয়ে চলেছে আজও। আর তারই খেয়ালের তলায় পিষে-যাওয়া কোটি-কোটি মানুষের আর্তনাদ আকাশকে বিষিয়ে দিচ্ছে।

তারপরেই জীবনসংগ্রাম সুরু; যাকে বলে কঠোর নির্মম জীবনসংগ্রাম। এতদিন তার পায়ের তলায় শক্ত মাটি ছিল, এখন সেখানে এসে দেখা দিয়েছে চোরাবালি; অভিজ্ঞ পথচারি না হলে বিপদের অতর্কিত আবর্তে যে কোন মুহূর্তেই মানুষ তলিয়ে যেতে পারে। আর একবার তলিয়ে গেলে তাকে টেনে তোলার সাধ্য নেই কারুর। বিচিত্র এই বিশ্ব। এখানে তোমার জন্যে লোকে শোকসভা করবে, তোমার স্মৃতিরক্ষা করার জন্যে চাঁদাও তুলবে, কিন্তু তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে একটি মানুষও বোধ হয় স্বেচ্ছায় আঙুল তুলবে না। মানব-সমাজের এই মূল নীতিবোধের গোপন কথাটি যেন তার কাছে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আজ।

অবিনাশবাবুর সঞ্চিত যা অর্থ তাই দিয়ে বেশীদিন চলে না। অবশ্য ট্রেণ

য়্যাকসিডেণ্টের খেসারৎ সরকার দেবেন বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন; তবে সে কবে, আর কত, তা গবেষনার বিষয়। সুতরাং তাকেও ক্যাপিট্যাল করে মানব-জমিতে ফসলের চাষ করতে যাওয়াও নিরর্থক।

যদিও ভাববার মত কিছু ছিল না, তবু অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত দেশের বাড়ীতেই হাজির হল রবীন। কাকা, কাকী, ঠাকুমা, আত্মীয়ের দল কেউ তাকে সরল চিত্তে গ্রহণ করল না; বরং এই কথাটাই তারা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলে যে পরজাতের মেয়েকে বিয়ে করে অবিনাশ তাদের মনে যে দাগা দিয়ে গিয়েছে, তারই পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয়েছে এতদিনে। বাপ-মার অবাধ্য হলে জীবনে দুঃখ আসবে না তো আসবে কোথায়?

এতটা জ্ঞানগর্ভ আলোচনা আশা করে নি রবীন। বাবার মৃত্যুর পর হঠাৎ নিজেকে অসহায় মনে করেছিল বলেই সে আত্মীয়স্বজনের কাছে ফিরে গিয়েছিল। তার পিছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

সেও সেদিন একটু হেসে বলেছিল: বাবাও তাই বলতেন, যেখানে তোর আত্মসম্মান বাধা পায় সেখানের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিস নে তুই।

ফিরে এল কলকাতায়। হোস্টেলে শুয়ে থাকে, আর চিন্তা করে। দুটি বছরের পরিকল্পনায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে রবীন। তার যা সম্বল তাতে একটি বছরও চলার কথা নয়। দুটি বছর সে চালাবে কেমন করে?

অনেক ভেবেচিন্তে সে দাদুর কাছেই গেল। যদি কিছু সুহারা হয়। মেয়ে বাপের অবাধ্যতা করেছিল বলে তার অসহায় ছেলের ওপরেও তাঁর রাগ থাকবে একথা সব সময়ে সত্যি নাও হতে পারে। আর যদি হয়-ই, তাতেই বা কী যায় আসে? মরার বাড়া গাল নেই জগতে।

পরিচয় ছিল না, পরিচয় করতে হল। দাদু ছিলেন জজসাহেব। কলকাতার বাইরে ফলোয়া করে বাড়ী করেছেন। দুটি মেয়ে তাঁর। তার মা-ই বড়। বড় মেয়ে অবাধ্য ছিল বলে ছোট মেয়ে সাবিত্রীর সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধান ছিলেন তিনি। সাবিত্রীকে কলেজে পড়ান নি। শিক্ষয়িত্রী রেখে বাড়ীতে কিছুটা লেখাপড়া শিখিয়ে একটি মুনসেফের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। সাবিত্রী নাচতে গাইতে জানত না বলে অনেক টাকার দাদন দিতে হয়েছিল তাঁকে।

কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়ে গেল, জামাইটি মারা গেল; রেখে গেল তিনটি অপগণ্ড শিশু, আর অশিক্ষিত কর্মবিমুখ স্ত্রী। তাদেরই ভরণপোষণের দায় আর দায়িত্ব দাদুর।

পরিচয় হতে না হতেই মাসীমা কিছুটা আত্মগত হয়েই বললে : বললেই তো হবে না, বাছা। তোমাকেও কখন দেখি নি, আর তোমার মা-ও নেই। বুঝব কেমন করে? দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে কি না।

দাদু কোন কথা না বলে তার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তীক্ষ্ণ সে দৃষ্টি, অনেক দূর অতীতের ঢেউ কাটিয়ে ক্লান্ত দেহে ভেসে এল যেন। সে চাহনিতে ভাষা ছিল না, ছিল কিছু বিস্ময়, আর কৌতূহল। আর সেই সঙ্গে কিছুটা জ্বালা।

রবীনও চেয়েছিল দাদুর চোখের দিকে। দেখল, দাদুর চোখের রঙ বদ্‌লাচ্ছে; কপালের শিরাগুলি দাপাদাপি করছে; শেষ পর্যন্ত কৌতূহল ছাপিয়ে উপছে পড়ল জ্বালা।

অবিনাশের ছেলে তুমি?

হ্যাঁ।

অবিনাশ ট্রেণ-য়্যাকসিডেণ্টে মারা গিয়েছে?

হ্যাঁ।

কুড়ি বছর আগে মারা গেল না কেন?

চমকে উঠল রবীন। একি প্রশ্ন? এর উত্তর তাকে দিতে হবে নাকি?

আবার কথা বললেন দাদু : কুড়ি বছর আগে মারা গেলে তার সোনার মূর্তি গড়িয়ে রাখতাম। বাট ইট ইস ভেরি ভেরি লেট। অনেক দেরী করল মরতে। আমার কিছু উপায় নেই আজ।

দাদু ভিতরে চলে গেলেন।

মাসীমার অর্দ্ধ উলঙ্গ ছেলে-মেয়েরা তাকে ঘিরে তখন তাথৈ তাথৈ নৃত্য করছে।

মাসীমা বললে : অমন সং-এর মত আর দাঁড়িয়ে কেন? এবার এস তুমি।

কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল রবীন। মাসীমার মন্তব্যে তার সম্বিত ফিরে এল।

হ্যাঁ যাচ্ছি।

গেটের বাইরে বেরিয়ে এল রবীন। হঠাৎ দালানে দাদুর গলার স্বর শোনা গেল : কোথায়, কোথায় গেল ছোকরা?

রবীন একটু আড়ালে দাঁড়াল।

মাসীমা বললে : তুমিও যেমন বাবা! ও নাকি দিদির ছেলে? ঠগবাজির জায়গা পেলে না আর।

দাদু বললেন : চুপ কর সাবিত্রী ; ও সীতারই ছেলে। একেবারে হুবহু সেই মুখ। সেই রকম অবাধ্যতা ওর চোখে, মুখে, সর্বাঙ্গে। ডাক ওকে, ডাক।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আর ফিরে গেল না রবীন। রাত্রের অন্ধকারে অভিমানে ভারাক্রান্ত ছোট বুকটাকে চেপে এ-বিশ্বের সমস্ত মানুষের ওপর আস্থা হারিয়ে সে সোজা হোস্টেলে এসে বিছানায় উপুড় হয়ে কেঁদে উঠেছিল : বাবা, মা!

সময় আর নদীর গতির মধ্যে কবি-দার্শনিকেরা নাকি একটা মিল খুঁজে বার করেছেন। রবীন কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও দুটির মধ্যে কোন মিল পায় নি। নদীর জল ফিরে আসে। সময় কি ফিরে আসে? না; পিছনের দিকে সে একটুও ফিরে তাকায় না, কাউকে ফিরে তাকাতে দেয় না। আর দেয় না বলেই, জীবনপথের সোজা রাস্তাটাকেই মূলধন করে এগিয়ে গেল রবীন।

রবীনকে দুশ্চিন্তায় পড়তে হল। তার সামনের দিনগুলি কঠোর জিঘাংসা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। উঁচু খাড়াই পাহাড়ের দেওয়ালের মত। যদি আরও এগোতে হয়, পাহাড় ফাটাও। তা না হলে ঐখানে চুপটি করে বসে-বসে কাঁদ। ঐ ছাড়া তৃতীয় কোন পথ খোলা নেই তোমার কাছে।

ভবিষ্যতের কথা ভুলে গেল রবীন। বর্তমানটাই তার ঘাড়ের ওপর চেপে রয়েছে, ঘোরাচ্ছে তাকে একটি ক্ষুদ্র আবর্তের চারপাশে।

অনেক চেষ্টার পর একটি টুইশানী জোগাড় করল। তখনও কলকাতা সহরের রাস্তায়-রাস্তায় বারোয়ারী কোচিং স্কুলের নামে ছেলেমেয়েদের রাতারাতি বিদ্যাসাগর বনিয়ে দেওয়ার কারখানা তৈরি হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে সাধারণ মানুষের খাওয়া-পরাই জুটত না, তারা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় বিলাসী করবে কেমন করে? সে যুগে যারা বাড়ীতে গৃহশিক্ষক রাখত, তারা মোটামুটি পয়সাওয়ালা মানুষ। শোফার, চাকর, আর গৃহশিক্ষক, এগুলি ছিল তাদের বনেদীয়ানার মাপকাঠি। প্রথম দুটির প্রয়োজনীয়তা ছিল ; তৃতীয়টি ছিল অপ্রয়োজনীয় বিলাস।

তবুও শেষ পর্যন্ত জুটে গেল একটা। পেটভাতায় মাস্টারি। বড় লোকের বাড়ী। দরোয়ান, ড্রাইভার, চাকর, আর সে। খাওয়া-শোওয়া সব বাইরের দেউড়ীতে। অন্দরমহলের সঙ্গে সংস্রব কেবল পড়াতে যাওয়ার সময়।

সকাল আর সন্ধ্যায় পড়ানোর মেহনদ। মেহেনদই বটে। ওর চেয়ে মাটি কোপানও বোধ হয় অনেক সহজ। কেঁদো-কেঁদো ঘি-দুধ-খাওয়া ঘাড়ে-গদ্দানে একাকার তিনটি ছেলে। মারামারি, হৈচৈ, হট্টোগোল আর বাঁদরামি ছাড়া যারা আর কিছু জানে না, তাদের শেখাতে হবে লেখাপড়া। এর চেয়ে গাধাকে পিটিয়ে ঘোড়া করাও বুঝি কম কষ্টসাধ্য।

কিন্তু দুর্ভাগ্য আবার তাকে ঠোক্কর দিল। একটা নয়, অমন তিন তিনটে কোঁদো ছেলেই পরীক্ষায় গাড্‌ডু মেরে তকমা-আঁটা শোফারের পিছনে মোটরে বসে হৈ হৈ করতে করতে বাড়ীতে ফিরে এল। আর ঠিক পরের দিনই কর্তার ঘরে ডাক পড়ল রবীনের।

বিরাট একটি ঘোরান চেয়ারে বিরাটতর চেহারা নিয়ে কর্তা বসে বসে মেওয়া খাচ্ছিলেন। রবীন গিয়ে দাঁড়াল বলির পাঁটার মত। রবীনের হঠাৎ মনে হল, জু থেকে একটা আস্ত বাঘ ছাড়া পেয়ে হুংকার দিয়ে এখনই তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে বা।

কী পড়াচ্ছ হে ছোকরা? তিনটে ছেলেই ফেল করল?

তারপর তাঁর বক্তব্যটিকে বিশদ করে বললেন, একবারে হান্‌ড্রেড পারসেন্ট?

শতকরা হিসাবে ঐ দাঁড়ায় বটে। হিসাবে এতটুকু গলদ নেই।

রবীন বললে, তাইতো দেখছি।

আবার ধমকে উঠলেন পিতৃদেবঃ দেখছ? দেখছ মানে? ছেলেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দেখার কী রয়েছে?

আমতা-আমতা করে রবীন; ওরা যে পড়তে চায় না……

চায় না? না চাইলেই হল? তাহলে, তুমি রয়েছ কেন? ভাত ছড়ালে কাকের অভাব?

রবীনের মাথাটা রি রি করে উঠল। তারপর, আর কোন কথা কানে যায় নি তার। সে প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল ঘর থেকে।

ঘর থেকে রাস্তা। রাস্তা থেকে পার্ক। সেইখানে একটা বেঞ্চের ওপর গা এলিয়ে দিলে রবীন।

হ্যালো, রবীন যে! মাই গড্‌! এখানে বসে করছিস কিরে?

মুখ ফিরিয়ে দেখল, দীপক তার দিকে এগিয়ে আসছে। এক হাতে জলন্ত সিগারেট, আর এক হাতে চিনেবাদাম। একবার চিনেবাদাম ফাটাচ্ছে,

আর একবার সিগারেট ফুঁকছে। তাদের কলেজের একেবারে বখা ছেলে। যাকে বলে পয়লা নম্বরের গিরমবাজ। তার কাজ ছিল, বন্ধুদের বই চুরি করে বিক্রী করা, আর ক্লাশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বিড়াল-ডাকা। সিগারেট আর চায়ের দাম পেলে সে বসে-বসে একশটি ছেলের প্রক্‌সী দিতে পারত।

দীপক এসে ওর পাশে বসল।

কলেজ যাস না কেন ?

কলেজ ছেড়ে দিয়েছি।

সে কি রে ? আজ ছ'মাস ধরে তাহলে বৃথাই তোর প্রক্‌সী দিয়ে মরলাম ?

চুপ করে রইল রবীন।

পকেট থেকে এক মুঠো চিনেবাদাম আর একটা সিগারেট বার করে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে দীপক বলে, সিগারেটের সঙ্গে চিনেবাদাম পাঞ্চ্‌ করে খা, ফাইন লাগবে। সিগারেট খাবি নে ? তা, নেই তো নেই, বাদামই চালা।

রবীন একটা চিনেবাদাম নিয়ে চুপ করে বসে রইল। দীপক একটানা কিছুক্ষণ বক বক করে গেল। হঠাৎ খেয়াল হল, রবীন অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছে।

কী ব্যাপার রে ? আছিস কোথায় ?

কোথাও না।

ঘুরে বসল দীপক। একটু অবাক হয়ে বলল, মানে ?

রবীনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল দীপক। কোথায় যেন একটা ছন্দপতন ঘটেছে। আগেকার সেই স্ফূর্তিবাজ ছোকরা তো নেই। খানিকটা বুড়োটে মেরে গিয়েছে। চুপ করে বসে রইল একটু। মুহূর্মুহু ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

চাকরি করবি ?

চোখ দুটো বড় বড় করল রবীন : কোথায় ?

সেকথার জবাব না দিয়ে দীপক বলল : থাকবি, দুবেলা খাবি, আর মাসে পঁচিশ টাকা মাইনে পাবি। কাজটা কিন্তু ভাই ভাল নয়।

কী কাজ ?

লেবেল মারা, ছিপি আঁটা।

করব ? কবে থেকে ?

চল্‌ আজকেই। বলেছিল অবিশ্যি কাল। দেখি, খালি রয়েছে কি না।

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে ধর্মতলা ষ্ট্রীটের একটা গলিতে ঢুকল; যেমন নোংরা, তেমনি অস্বাস্থ্যকর। দুপাশে ছেঁড়া কাগজের বস্তা, চটের বাণ্ডিল; শিশি বোতলের পাহাড়, মুসলমান রেস্তোরাঁ, কাঁচা মাংসের দোকান, প্রেস। ওরকম রাস্তা রবীন দেখে নি কোনদিন। দোকানঘরগুলি সব অন্ধকার। অমন চড়া রোদও এখানের মাটিতে পড়ে নি, পাছে হারিয়ে যায় এই ভয়ে। আর কী লোক! একেবারে গিজগিজ করছে।

খানিকটা গিয়ে দীপক বলল: লোকটা যদি জিজ্ঞাসা করে, কতদূর লেখাপড়া শিখেছেন, বলবি, কিছু না। কেবল নামটা সই করতে পারি।

একটি প্রসাধনের দোকানের সামনে দাঁড়াল দুজনে। চকচকে সাইনবোর্ড। বোর্ডের একধারে একটি তরুণীর ছবি, তুর্কী, পার্শী, বাঙ্গালীর মিশ্রন। কেউ কারও তোয়াক্কা রাখে না। প্রত্যেকেই স্ব স্ব মহিমায় সমুজ্জ্বল। তারই একপাশে "নিউ বেঙ্গল টয়লেট"। তারপর অজস্র বাচন, হিন্দী, বাংলা, আর উর্দুতে। অর্থাৎ কারও যেন বুঝতে দেরি না হয় কিসের দোকান সেটি, অবশ্য ধৈর্য ধরে কেউ যদি পড়ে। সামনে একটা শোকেশে কতগুলি লেবেল মারা শিশি। শোকেশের জেল্‌লা নেই; ভাঙা কাঁচের ওপর রাজ্যের ধুলোবালি পড়েছে।

দোকানটি ছোট। একটা টেবিল, খানকত চেয়ার। ঘরের চারপাশে ঝুল আর মাকড়শার রাজত্ব। মেঝের ওপর রাজ্যের শিশিবোতল। জন দুই লোক সেখানে বসে রয়েছে।

কই, কোথায় কেষ্ট দা? কেষ্ট দা?

চেঁচাতে-চেঁচাতে রবীনকে সঙ্গে নিয়ে সুইং ডোরটা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল দীপক। সেখানে একটি বড় দালান। বাতি জ্বলছে। একপাশে প্রচুর শিশিবোতল। রকের ওপর লেবেল আর ময়দার আঁটার ছড়াছড়ি। সামনেই কল। সেইখানে লুঙ্গীকে হাঁটুর ওপরে তুলে একটি লোমশ বপু কচলে-কচলে শিশিবোতল পরিষ্কার করছিল। মাথার চুলগুলি কদমছাঁট। ঘাড় আর গদ্দানের মধ্যেকার স্থানটি কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হবে লোকটা একটা গুণ্ডা।

হাই দেখ, তুমি ওখানে? আমি যে এদিকে ডেকে ডেকে হাল্‌লাক।

কেষ্টদা মুখটা নামমাত্র তুলে জিজ্ঞাসা করলে, কি বলবি বল না। কাজের সময় চিল্‌লাস কেন?

তোমার গুণধরটি কোথায় ?

কেষ্টদা এবার মুখ তুলে চাইল। চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল। বললে : অমন গুণের মাথায় মার ঝাড়ু। ব্যাটা এক নম্বরের গিধ্যোড়। কাঁড়ি-কাঁড়ি ভোজন, আর লম্বা লম্বা নিদ্রা। দিয়েছি ব্যাটাকে তাড়িয়ে।

শিশি ধোয়া শেষ করে গুটি-গুটি এগিয়ে এল কেষ্টদা। এতক্ষণ বোধ হয় দেখতে পায় নি রবীনকে। রোযাকের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল : কে র্যা দীপে ?

দীপক বলে : দেখ কাণ্ড ! তুমি যে কাল আমাকে বললে, তোমার একজন য়্যাসিসটেণ্ট চাই। তাই তো একে ধরে আনলাম।

তা তুই কি আমার ব্যবসা ডকে তুলবি নাকি র্যা ? এই কচি ছেলে করবে কী এখানে, যঁ্যা ! গলা টিপলে এখনও ওর দুধ বেরোয়, আর ও তোর ঝুড়ি-ঝুড়ি শিশি বইবে ? ভাগ।

তাহলে বাজি হয়ে যাক। এক সপ্তাহের কড়ার। হারলে, তুমি পঞ্চাশ টাকা দেবে আমায় ?

কেষ্টদার চোখ কপালে উঠল : ঐ লেখাপড়ার দোষ, বুঝেছিস। দু' কলম ইংরিজি শিখে বিটিং ছাড়া কথা বলিস নে তোরা। হুঁ !

আর একবার রবীনের দিকে চেয়ে দেখলে কেষ্টদা। তারপর দীপকের দিকে চেয়ে বললে : নিজেই চালিয়ে নিতুম। তা যখন এনেছিস····

ঝটপট ট্রায়ালে বসিয়ে দাও, দাদা।

কেষ্টদা মুখ বাঁকিয়ে বলে : একি তোদের মেসিনের কাজ যে টেরাল দিতে হবে ? সাদাসিধে কাজ। ইচ্ছে থাকলে সবাই পারে। তা, মাইনে-টাইনের কথাটথা কিছু হয়েছে ? না, খুব ফলোয়া করে কয়ে এনেছ ? তোমার তো আর গুণে ঘাট নেই। কেষ্টদার মাথায় মুগুর মারতে সবাই ওস্তাদ !

হা হা করে হাসল দীপক, তুমি ফলোয়া করে দেওয়ার লোক কিনা····

কেষ্টদা বাধা দিয়ে বললে : ফলোয়া করে দেব কেন র্যা ? কারা ফলোয়া করে দেয় ? যারা কাজের কিচ্ছু জানে না। গদী-আঁটা চেয়ারে বসে টেলিতে মেয়েলি গলায় কথা বলে। আমি ব্যবসার নাড়ি-নক্ষত্র জানি। বুঝেছিস ?

তারপর রবীনকে জিজ্ঞাসা করলে : তা তোমার লেখাপড়া টড়া·······

দীপক বললে : কিছু ভাবনা নেই তোমার। ফিফ্‌থ ক্লাশের ওপরে উঠতে পারে নি। না হলে আর····

এবার চটে ওঠল কেষ্টদাঃ থাক, থাক; আর লেখাপড়া শেখাস নি আমাকে। ঐ যে ছোট ভাই এল, এ পাশ করেছে; আর ঐ যে মেজকাটা—বি. এ. পাশ করেছে। একজন পেল্লয় বড় বাড়ীতে ফ্যানের তলায় বসে কাজ করে। মাইনে পায় তিরিশ। আর ঐ মেজকা। ম্যাস্টরী করে, মাইনে পায় পঞ্চাশ। আর দেখ্, আমার তো ক-অক্ষর গোমাংস রে। কিন্তু মাসে কমসে কম পাঁচশ রোজগার কম্মি। চুরি বাঁচাতে পারলে আরও কোন না শ' চারেক। করুক দেখি ছোটকা-মেজকা? তাই বললাম, আমার দোকানে এসে বস। পরে চুরি করে কেন, তোরাই কর। হাজার হক, তোরা মায়ের পেটের ভাই। তা কি আসবে? মা গো, কী নোংরা জায়গা! হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে শিশি বোতল ধোওয়া? রামঃ! অথচ করকরে টাকাগুলো যখন এসে নিয়ে যায় তখন ব্যাজার নেই, যত ময়লা নোটই দিই। ছোঃ, ছোঃ!

তারপর রবীনের দিকে চেয়ে বললেঃ ভাল করেছ, ভাল করেছ। হাতের কাজ কর, ব্যবসা কর। তার জোড়া আর জিনিষ আছে? তা, মাইনে ঐ মাসে পঁচিশ। তার বেশী আমার ক্ষমতা নেই। কাজকর্ম শিখে নিয়ে যে বলবে, মাইনে বাড়াও, সেটি হবে না। এখন থেকেই বলে রাখছি। এছাড়া থাকা খাওয়া, তার উপর রোজ দুআনা টিফিন। ব্যাস। ঐ পাশের দোকানের শিখকাবাব খেতে পার, কিন্তু নিজের পয়সায়, হ্যাঁ। কাজের সময় কাজ কর, তারপর সিনেমায় যাও, ফূর্তি কর। কিছু আপত্তি নেই আমার। প্রথমেই সব কথা বলে দেওয়া ভাল। কেমন—রাজি?

ঘাড় নাড়ল রবীনঃ হ্যাঁ।

ব্যাস, ব্যাস। তুই এবার ভাগা দে দীপে। অনেক কাজ পড়ে।

দীপককে আর কোন কথা বলতে না দিয়ে রবীনকে পাশের ঘরে টেনে নিয়ে এল কেষ্টদা। সেখানে আরও জন পাঁচেক লোক কাজ করছিল। তাদের একজনকে ডেকে বললেঃ এ ছোকরার নাম রবি। কাজকম্ম সব বুঝিয়ে দাও। কেবল ফাঁকিটা শিখিয়ো না বাপধন।

জীবনের আর একটি অধ্যায় সুরু হল রবীনের। খেটে খাওয়ার অভ্যাস যে মানুষের কত বড় সম্বল, আর সম্পদ সেদিনই যেন সে প্রথম উপলব্ধি করল।

আর ঐ কেষ্টদা। যেমন দশাসুর চেহারা, তেমনি অতিকায় বর্বরতা। চারপাশে তার নজর। সকাল থেকে একটা লুঙ্গি আর হাতকটা গেঞ্জি পরে রাত্রি বারটা পর্যন্ত এক নাগাড়ে খেটে চলেছে। ফাঁকি দেয় সাধ্য কার? যে

লোক নিজে ফাঁকি দিতে জানে না, তার কাছে ফাঁকি দেওয়াটা বোধ হয় বড় কষ্টকর। কেনাবেচা থেকে সুরু করে জিনিষ পত্র তৈরি করা সবই তার নিজের হেপাজতে। কত রকম জিনিষ যে তৈরি হয় সেখানে তার ইয়ত্তা নেই। স্নো, পাউডার, এসেন্স, কালি, লিপস্টিক, টাকের তেল, হাজার ওষুধ, বাতের মলম, দন্তঃশূল মাজন। এছাড়া স্বপ্নাদ্য ওষুধও দু-চারটে আছে।

কারিগররা আড়ালে গালাগালি দিত: শালা চামার! একটি পয়সা তো উপরটাইম দেবে না; কেবল খাটিয়ে মারবে।

কিন্তু ওভারটাইম না দিক, লোকটিকে বেশ ভাল লাগল রবীনের। কাউকে খুশি হয়ে একটি পয়সা বেশী দিত না বটে, তবে কারও পাওনাগণ্ডা মেরে দেয় নি।

সেই প্রথম রোজগারের আনন্দে রাতদিন পরিশ্রম করত রবীন। লেবেল নাগানোর কাজ ছাড়াও, তাগাদার ভার ও হিসাব দেখার ভার পড়ল তার উপর। মাস তিনেক পরে কেষ্টদা হঠাৎ একদিন তার জন্যে একজোড়া ফিনফিনে ধুতি আর আদ্দির পাঞ্জাবি নিয়ে হাজির।

হ্যাঁ হে ছোকরা, বলি, আমি না হয় পাড়াগাঁয়ে ভূত। তাই বলে তুমিও ময়লা কাপড় আর প্যাণ্ট পরে ঘুরবে? তোমার আক্কেলকে বলিহারি।

রবীন হেসে বললে: পয়সা কোথায় কেষ্টদা?

কেষ্টদা চোখ পাকিয়ে বলে: কেন? চারমাসে তোমার একশ টাকা জমা রয়েছে না আমার কাছে? আমার মত অকালকুষ্মাণ্ড চারটে ছেলে থাকলে না হয় তবু একটা কথা ছিল। বলি, বাপ মা রয়েছে?

না।

হুঁ। তা জানতাম। থাকলে, একবার অন্তত নামও করতে। আর বিয়ে নিশ্চয়ই করনি। তবে তোমার ঠেকাটা কিসের শুনি?

পড়ব!

পড়বে?

চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠল কেষ্টদার: ঐ, আবার ঐ ভূত চেপেছে মাথায়! ইংরেজের ভূত!

এই পড়ার জন্যেই মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে উঠত রবীন। এক একটা মাস যাচ্ছে; আর তার মনে হচ্ছে যেন এক একটা বুকের হাড় খসে যাচ্ছে। কিশোর মনে স্বপ্নটাই বাস্তব, বাস্তবটা রূঢ়। তার সেই দুটি বছরের পরিকল্পনার ব্যর্থতা বারবার তাকে উন্মনা করে তুলেছিল।

কেষ্টদা বললে : তাই তো ভাবি, সবাই যেখানে টাকা-টাকা করে অস্থির করে তোলে তখন তুমি সব টাকা আমার কাছে গচ্ছিত রাখ কেন ? কী পড়বে ?

ডাক্তারি।

ডাক্তারি ? কলেজে ?

হ্যাঁ।

থ হয়ে গেল কেষ্টদা।

সে কত টাকার ব্যাপার জান ?

জানি।

কেষ্টদার মুখে একটা তাচ্ছিল্যের সুর : কচু জান। এর চেয়ে কাঠবিড়ালীর সাগর বাঁধাও সহজ যে হ্যা।

তাই তো দেখছি।

কেষ্টদা দুহাতের দুটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ একসঙ্গে করে : ঘোড়ার ডিম দেখছ। আরে বাপু, চোখ থাকলেই কি মানুষে সব জিনিষ দেখতে পায়, না, তোমার বয়সে সব জিনিষ দেখা যায় ? মহা জ্বালায় ফেললে দেখছি আমাকে !

রবীন হেসে বললে : জ্বালার কিছু নেই, কেষ্টদা।

না, তা থাকবে কেন ? তুমি তো না হয় ড্যাং ড্যাং করে কলেজে ডাক্তারি পড়তে গেলে। এদিকে আমার কী অবস্থা বলত ? নাও, এখন ঐ ট্যানা ছেড়ে এই জামাকাপড় গুলো পর দেখি। আরে বাপু, যে বয়সের যা।

মাস-কাবারে কেষ্টদা পঁচিশের ওপর পঞ্চাশ বাড়িয়ে টাকাগুলো তার হাতে দিয়ে বললে : নাও, রেভিনিউ স্ট্যাম্পের ওপর সই কর।

রবীন অবাক হয়ে চেয়ে রইল কেষ্টদার দিকে।

কেষ্টদা বললে, দেখ বাপু, তোমার সঙ্গে আদিখ্যেতা করার সময় নেই আমার। এখনও রাজ্যের কাজ পড়ে রয়েছে।

কিন্তু মাইনে বাড়ানোর কথা তো ছিল না।

ছিল না ? তুমি কী ভাবছো যে তোমাকে ভালবেসে পঞ্চাশটা টাকা বেশী দিচ্ছি ? ভুলেও তা মনে স্থান দিওনা। কেষ্ট মিস্ত্রিকে ফাঁকি দিয়ে একটা টাকা কেন, একটা আধলা নিয়ে যাক দেখি কেউ,—দেখব কেমন বাপের ব্যাটা !

তাহলে এই বাড়তি টাকা ?

কেষ্টদা অবাক হয়ে বলে : বাড়তি কোথায় দেখলে হে ? এই

চার মাস আদায়ের ভার ছিল তোমার হাতে। বলি, লেখাপড়া তো করবে, খুব এলেমদার লোক হবে। কিন্তু হিসেব জান? এই দেখ।

এই বলেই মোটা হিসেবের খাতাটা ঝপাং করে খুলে ফেলল কেষ্টদা। বললে: দেখ, এই অঘ্রান, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন; আদায়কারীর নাম নলীন দাশ। মোট আদায় দু হাজার তিন টাকা ছ আনা তিন পয়সা। মাল গিয়েছে পাঁচ হাজার টাকার। আরপর দেখ এই চৈত্র, বৈশাখ, জৈষ্ঠ, আষাঢ়। আদায়কারীর নাম—রবীন্দ্রনাথ দত্ত, অর্থাৎ তুমি। মাল গিয়েছে প্রায় পাঁচ হাজার টাকার মত; আদায় চার হাজারের কিছু বেশী। এই দু হাজার থেকে দু পাঁচশ তুমি বেমালুম সাফ করতে পারতে? তাহলে সবটাই লস হ'ত আমার। তার বদলে দিচ্ছি তোমাকে পঞ্চাশ।

তারপর নিজের রসিকতাতে হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠে কেষ্টদা: তুমি এসেছ আমাকে হিসেব বুঝোতে! আরে, তোমাকে বাগবাজারে কিনে চোরাবাজারে ঝেড়ে দিয়ে আসতে আমার দশ মিনিটও সময় লাগেনা জানো? নাও, সই করে দাও। এখনও অনেক কাজ বাকি আমার।

কটা দিনই কেমন উন্মানা হয়েছিল রবীন। সত্যিই বিচিত্র এই জগৎ! তার নিকট-আত্মীয়দের কথা মনে পড়ল। বিরাট বিরাট বাড়ীর মধ্যে প্রাচুর্যের বাতাস লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা। আর এই অনাত্মীয়, অপরিচিত কেষ্ট মিত্রী। কতই না তফাৎ!

আরও একদিনের কথা মনে পড়ল রবীনের। প্রায় দেড় বছর পরে সরকার অনেক তথ্য সংগ্রহ করে, অনেক গবেষনার পর অবিনাশ বাবুর জীবনের দাম ধার্য করলেন পাঁচ হাজার। তাঁদের হিসাবে একজন কেরানীর জীবনের দাম ওর বেশী হওয়া উচিত নয়।

তা না হক, টাকাটা কাজে লাগল রবীনের।

খবরটা শুনেই কেষ্টদা রবীনকে বুকে জড়িয়ে ধরলো।

রবীন হেসে বললে: এবার যদি অনুমতি দেন তো····

আর আমার ব্যবসা?

কিছুক্ষণ পিছনে দুটো হাত মুঠো করে পায়চারি করলে কেষ্ট দা। তারপর বললে: যাক গে, ও আমি চালিয়ে নেব। তুমি কিন্তু বাপু, আমার হিসেবটা দেখে যেও রোজ একবার। ওটা আমার মাথায় ঢোকে না। কিন্তু মাইনে ঐ পঞ্চাশ!

রবীন হেসে বললে : তথাস্তু।

ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি ডাক্তারবাবু?

ধড়পড় করে উঠে পড়ল রবীন। দেখল, শীলা দাঁড়িয়ে।

ও:, আপনি?

হ্যাঁ। স্বপ্ন দেখছিলেন বুঝি?

রবীন একটু ম্লান হাসি হেসে বললে—স্বপ্ন? হ্যাঁ, তাই বটে।

নাটমন্দিরে যাবেন না? ভজন সুরু হবে এবার।

রবীন উঠে পড়ে বলে : চলুন।

২

রাধাকৃষ্ণজিউর মন্দির। তার সামনেই প্রশস্ত নাটমন্দির। প্রায় তিনশ লোকের বসার জায়গা রয়েছে এখানে। চাতালের ওপর সুন্দর জাজিম পাতা। ফুলের তোড়া আর মালা দিয়ে সাজানো। মাঝখানে খানিকটা গোল জায়গা ফাঁকা। সেইখানে একটি বড় জলচৌকির ওপর রাধাকৃষ্ণ আর গৌরনিতাই-এর ছবি। ছবি দুটির গলায় একটি করে ফুলের মালা। তারই পাশে সিল্কের গেরুয়া পরে নিতাই ব্রহ্মচারি। কপালে চন্দনের তিলক, গলায় মোটা গোড়ের মালা আজানুলম্বিত। কাঁধের ওপর একখানি সিল্কের চাদর।

রবীন যখন নাটমন্দিরে হাজির হল, তখন আয়োজন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। নাটমন্দিরে এত লোক জমায়েত হয়েছে যে তিলধারনের জায়গা নেই আর। কয়েকটা জিপ-গাড়ি এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সুতরাং পদস্থ ব্যক্তিদের কেউ কেউ যে এসেছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া রয়েছে দেহাতি লোক। তারা দলে দলে এসে হাজির হয়েছে, এবং হচ্ছেও।

নাটমন্দিরের ওপর স্থান নেই, তাই মন্দিরের পাশে একটা কদমগাছের তলায় দাঁড়িয়ে রইল রবীন।

ধীরে ধীরে খোল আর মৃদঙ্গের বোল সুরু হল। রুমুঝুমু রুমুঝুমু করতাল বেজে উঠল। নিতাই ব্রহ্মচারির কণ্ঠ থেকে একটি মৃদু সুর ভেসে এল সেই সঙ্গে। ধীরে ধীরে, অতি ধীরে উদারা থেকে তারা।

রাধাকৃষ্ণের তত্ত্বটুকু সুরের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করলেন নিতাই ব্রহ্মচারি।

তারপর সুরু হল গৌরচন্দ্রিকা। গৌর বিনা কৃষ্ণরসাস্বাদনে বৈষ্ণবের অধিকার নাই। তাই গৌরবন্দনাই কৃষ্ণারতির প্রথম সোপান।

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল-অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব॥

ব্রহ্মচারি ব্যাখ্যা করলেন: রাধাকৃষ্ণের দ্বৈতাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের সর্বশরীরে মহাভাবের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর দেহ, মন, আত্মা, তাঁর সমস্ত সত্ত্বা একটি অনৈসর্গিক আনন্দরসে আপ্লুত। চক্ষু দুটি মেঘের সঙ্গে তুলনীয়, কারণ সেই চক্ষুদুটি থেকে অনবরত অশ্রুর ধারা ঝরে পড়ছে। আর সেই বৃষ্টি-ধোয়া কদম্বের রোমাঞ্চ মহাপ্রভুর সর্বদেহে সঞ্চারিত।

তারপরেই আরম্ভ হল:

আধক আধ- আধ দিঠি-অঞ্চলে
যব ধরি পেখলুঁ কান।
কত শত কোটী কুসুম-শরে জর জর
রহত কি যাত পরাণ॥

ব্রহ্মচারির সুরেলা কণ্ঠে একি সমস্যা, একি আর্তনাদ! রাধার আক্ষেপ ব্রহ্মচারির প্রাণের আকুতির সঙ্গে মিশে বিশ্বের সেই চিরন্তন শাশ্বত আকুতির সঙ্গে যেন এক হয়ে গেল। যমুনার কালো জলের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন রাধা। সেই জলে নাকি কৃষ্ণের প্রতিবিম্ব পড়েছে। হায় অভাগিনী নারী, ও তো ছায়া; ওর পিছনে না ছুটে তোমার অন্তরের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর। মুহূর্তের ইঙ্গিতে যাকে তুমি অনুভব করেছ সেই তো তোমার চিরজীবনের সঞ্চয়। স্থূলস্পর্শের মধ্যে এনে কামনার চিতানলে দগ্ধ করো না তাকে।

নিতাই ব্রহ্মচারিকে আর চেনা যাচ্ছে না। দরদর বিগলিত করুনাধারায় তাঁর কপোল আর গণ্ড আর্দ্র হয়ে উঠেছে, ভিজে যাচ্ছে তাঁর বসন। শ্রোতাদের অনেকেই মুহ্যমান। রাধার সঙ্গে গলা মিশিয়ে বিশ্বজগৎ যেন একই সুরে যুগযুগ ধরে বিলাপ করে চলেছে। এর সুরু হয়েছিল কোথায় জানি নে, সমাপ্তি কোথায় হবে তাও আমাদের কাছে সমান অজানা।

এমনি করে একটীর পর একটি পদ। পূর্বরাগ, অনুরাগ থেকে মান, বিরহ,

মিলন, সম্ভোগ, আবার বিরহ। পূর্ণতা বুঝি কোথাও নেই। দিকচক্রবালের সীমান্তরেখার মত মানুষের বেদনার পূর্ণচ্ছেদও চির-অপসৃয়মান।

গান শেষ হল ব্রহ্মচারির, কিন্তু সুরের সমাপ্তি হল না অত সহজে। রবীনের কানের কাছে অনেকক্ষণ ধরে একটা অনাস্বাদিত বেদনাকুহক গুনগুন করতে লাগল। সে বারবার ভাবতে লাগল, এই যদি মানুষের সত্যিকার প্রানের আকুতি হয়, তাহলে এত যুগ ধরে মানুষ কেবল হত্যা আর হিংসাকেই মহীয়ান গরীয়ান করার জন্যে নিজেরই বা প্রাণ দিল কেন, আর রাশি রাশি মানুষেরই বা প্রাণ নিল কেন? অথবা এ মাত্র একটি সুরের ইন্দ্রজাল, একটি ক্ষণিক মাদকতা? প্রভাতের কুয়াসার মতই বাস্তবের রূঢ় ধাক্কায় চুরমার হয়ে যাবে এ।

সুর-মূর্ছনার তরঙ্গ নিশীথ বাতাসের দোলায় দূর থেকে দূরান্তরে ভেসে গেল; শালবীথি আর দেওদার কুঞ্জের সীমানা ছাড়িয়ে, বিরাট উপত্যকার মাঝখান দিয়ে পাহাড়ের বুকে প্রতিধ্বনি তুলে আরও দূরে মিলিয়ে গেল। ধীরে ধীরে জেগে উঠল রবীন। তার মনে দেখা দিল সন্দেহ, আর জাগল সংশয়। মনে হল, এতক্ষণ সে মোহাচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশ্বব্যাপী বিরহ যদি কোথাও থাকে তো থাক, সে তার সীমানার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাধার বিরহ রাধারই একান্ত নিজস্ব হয়ে থাক। পরকীয়তার অপবাদে সমাজ, আর সংস্কার তার ওপর কত অত্যাচারই না করেছে। কিছুতেই তাকে হটাতে পারে নি। আর পারে নি বলেই এরা তাকে হত্যা করে ধর্মের কফিনে মুড়ে ধর্মযাজকদের হাতে তুলে দিয়েছে, ঠিক যেমন করে ব্রীটিশের কুচক্রান্তে ফরাসী পাদরীরা জোয়ান অফ আর্ককে ডাইনী বলে পুড়িয়ে তাকে সেণ্টের মর্যাদা দিয়েছিল। কিন্তু তবু ওরা কাউকেই মারতে পারে নি। রাধা আর জোয়ান পুরানো নয়। ওরাই সত্যিকারের নতুন মহিলা।

এমন করে ভাবছেন কী?

চমক ভাঙল রবীনের। দেখল, সে একটি গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নাটমন্দির ফাঁকা। চাতালের ওপর কেবল একটি হ্যাজাক জ্বলছে। সামনে দাঁড়িয়ে শীলা।

শীলার স্বরে বিস্ময়ঃ বাবা, এ কী ঘুম? দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মানুষ ঘুমোতে পারে নাকি?

না, ঘুমোই নি। আসলে খেয়াল ছিল না এতক্ষণ।

কথাটা তৎক্ষণাৎ সমর্থন করল শীলা: থাকার কথা নয়। নিতাই ব্রহ্মচারির গান একবার যে শুনেছে তার পক্ষে অন্তত কিছুক্ষণ অন্য কিছু খেয়াল রাখা কষ্টকর। কিন্তু চলুন, আর দেরি নয়।

হ্যাঁ, চলুন।

দুজনেই অতিথিভবনের দিকে এগিয়ে চলল।

আপনাদের এই আশ্রমটি কতদিন গড়ে উঠেছে, মিস লাহিড়ি?

বছর পনের তো বটে।

হুঁ। আচ্ছা, আপনাদের এখানে আগে কোন ডাক্তার ছিলেন না?

ছিলেন। বছরখানেক হল মারা গেছেন।

কী করে?

শীলা এবার একটু চুপ করে রইল। তারপরে বললে: সাপকাটি হয়ে।

সাপে কামড়ে?

শীলা থমকে দাঁড়াল। বললে: আশ্চর্য হলেন যে? সাপ যে মানুষকে কামড়ায় তা কি আপনি জানেন না?

রবীন যেন একটু লজ্জিত হল। বললে: নিশ্চয় জানি। কিন্তু চিকিৎসা হ'ল না?

ডাক্তার রোগী হলে কে কার চিকিৎসা করবে বলুন।

তা অবশ্য সত্যি কথা। চলুন।

কয়েক পা চলার পর রবীন আবার প্রশ্ন করল: আচ্ছা, এই পাণ্ডববর্জিত দেশে হঠাৎ একটা আশ্রম খোলার দরকার হল কেন বলুন তো?

এ অঞ্চলের পাপীতাপীদের উদ্ধার করতে।

এবার দাঁড়িয়ে পড়ল রবীন। তারপর হেসে বলল: আচ্ছা, আপনাদের এই আশ্রমটির পরিকল্পনার কথা কিছু বলতে পারেন আমাকে?

এবার হাসার পালা শীলার: আচার্যদেব পনের বছর ধরে যা বুঝতে পারেন নি, তাই আপনি দুমিনিটে বুঝে নেবেন?

তবু, যতটুকু পারি;

কী বলব আপনাকে? আমি নিজেই জানি নে। তবে এইটুকু বলতে পারি যে অনেক পরিকল্পনার মত আনন্দধামের পরিকল্পনাটিও বেশ জটিল আর দুরূহ। ক্রমশ বুঝবেন। এখন চলুন।

৩

খুব ভোরেই ঘুম ভেঙে গেল রবীনের। নূতন জায়গা বলেই বোধ হয় অজস্র ক্লান্তির মধ্যেও তার ঘুমটা যথেষ্ট গাঢ় হয় নি।

ঘুম ভেঙে যেতেই জানালার ভিতর দিয়ে যে জিনিষটি তার চোখে পড়ল তা মনোরম। তখনও অন্ধকার কাটে নি, ফিকে হয়েছে মাত্র। আকাশের শেষ প্রান্তে চাঁদ ঢলে পড়েছে; শুকতারাটিই কেবল শেষ রাত্রির বাসর জাগিয়ে রেখেছে। উত্তর-হেমন্তের বাতাসে হিমকণার প্রাচুর্য রয়েছে। পাতলা কুয়াসার একটা আস্তরণ ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। ফুলে-ফুলে ছেয়ে গিয়েছে দক্ষিণদিকের প্রায় গোটা অঞ্চলটাই। গাঁদা ফুল ফুটেছে; বেল-টগরের শেষ নেই যেন। শিউলি বনে আজ মাতাল মৌমাছির অবিশ্রাম অভিসার চলেছে। দূরের কৃষ্ণচুড়াটাও তার আগুনে রঙ ছড়িয়ে দিয়েছে।

সেই বাগানে একদল মেয়ে ফুল তুলে বেড়াচ্ছে। তাদের হাসির উচ্ছ্বাসে ভোরের বাগানেও একটি শিহরণ জেগে উঠেছে। রাশি রাশি ফুল তুলে জমিয়ে রাখছে কেউ; কেউ বা কিছু ফুল খোঁপায় পরেছে, কেউ বা সেই ফুল নিয়ে নিজেদের মধ্যে ছোঁড়াছুড়ি করছে।

আর আশ্রমের কোন একটি অন্তরাল থেকে প্রভাতকালীন ভজন সুরু হয়েছে।

চারপাশে এই অনাবিল আনন্দের মধ্যে নিজেকে কেমন একা-একা মনে হল রবীনের। বাইরের বিশ্বে আলো আর অন্ধকারের মাঝামাঝি একটা জায়গায় যে বিপুল আলোড়ন জেগে উঠেছে তা থেকে নিজেকে সযত্নে সরিয়ে না রেখে সে উঠে পড়ল। তারপর কোনদিকে আর নজর না দিয়েই সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

বাইরে আসার পর যেটি সবার প্রথম তার দৃষ্টি আকর্ষন করল সেটি হ'ল ফিকে অন্ধকারের বুকে পূর্বদিকের উঁচু পাহাড়ের চূড়াটি। সেই পাহাড়টি লক্ষ্য করেই হন হন করে এগিয়ে গেল রবীন।

আশ্রমের ঠিক পাশ দিয়েই একটি দেহাতি পথ দীনতার মালিন্যে নিজেকে ঢেকে রেখে এঁকেবেঁকে পূবদিকে এগিয়ে গিয়েছে। পথের ধারে ধারে আশ্‌শ্যাওড়া-বাবলাগাছের সারি; আবার মাঝে মাঝে কাশফুল আর শরগাছের চাপে পড়ে এ-পথেরও স্থানে স্থানে বিলুপ্তি ঘটেছে।

একপাশে মাঠ, আর একপাশে বিরাট দিঘি। কাল রাত্রির অন্ধকারে যাকে ভাল করে বুঝতে পারে নি, আজ প্রভাতসূর্যের চিকন আলোতে তাকেই ভাল করে লক্ষ্য করল রবীন। টলমল করছে নিটোল কাল জলরাশি। অল্প অল্প বাতাসে হেলছে, দুলছে, ছোট ছোট বৃত্তে পাক খাচ্ছে।

আশ্রম থেকে বেরিয়ে মিনিট পনেরর মধ্যেই বিরাট একটি পরিবর্তন তার চোখে পড়ল। রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রচ্ছদপট পরিবর্তিত হচ্ছে, মাটি হয়ে উঠছে রুক্ষ থেকে রুক্ষতর। মাঝে মাঝে যব, মাকাই আর ভুট্টার চাষ; কিন্তু মাঠের অনুপাতে তাও সামান্য।

কড়া রোদের ঝাঁঝ থেকে চোখ দুটো বাঁচিয়ে রবীন আরও এগিয়ে গেল। বাঁ দিকে বেঁকে নদীর বুকে গিয়ে মিশে গিয়েছে পথটি। একদিন হয়ত ছিল, আজ আর কোন নদী নেই ওখানে। রয়েছে কেবল চর, ধূ-ধূ করছে বালির স্তূপ। অনেক দূর পর্যন্ত রোদের আভায় বালিগুলি চিক চিক করছে। নদীর ওপাশ থেকে শুকনো হাওয়া দৌড়ে আসছে। রবীন ঘুরে চেয়ে দেখল, উঁচু বাঁধ আর গাছ-গাছালির আড়ালে আশ্রমের শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়েছে।

ঘুরতে-ঘুরতে একটা পাথরের টিলার ওপর এসে বসল রবীন। চারপাশে চেয়ে দেখল। জায়গাটি একরকম নির্জন বললেই চলে! কিছু দেহাতি লোক মাঝে-মাঝে এপাশ-ওপাশ থেকে আসছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। কেউ গাঙ পেরিয়ে আসছে, কেউ বা আবার গাঙ পেরিয়ে ওদিকে চলে যাচ্ছে। চেহারায় পোষাকে বেদেদের মত। মেয়ে, পুরুষ, বাচ্চা, সবার একরকম অবস্থা, মাথায় ছেঁড়া কাঁথার বস্তা, কাঁধে ব্যাখারির বাঁক। বাঁকের দুধারে ঝোলানো হাঁড়ি-কলসী। দুচারটে কাচ্চাবাচ্চাও রয়েছে সেই বাঁকে। কারও কাঁধে ঢোল, মাদল। কাল আবলুস কাঠের মত গায়ের রঙ। স্বাস্থ্য বলতে কোন পদার্থই এদের নেই।

বেশ কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক করে ফিরল রবীন। কিছুদূর আসার পর দেখল, অদূরে একটি গাছের ছাওয়ায় দুটি মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে। রোদের ঝাঁঝে স্পষ্ট বুঝতে পারল না; তবে মানুষ দুটি যে বেদেদের কেউ নয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না তার।

আরও কিছুটা এগিয়ে এসে দেখল, একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছেন। তাঁর শরীরের ওপর পোষাকের সংখ্যা আর বৈচিত্র্যটি লক্ষ্য করার মত। তাঁর পাশে একটি মহিলা। তাঁরও শরীরে পোষাক কম নেই।

পোষাকের চাপে ভদ্রলোকের চোখ দুটি ছাড়া অন্য কিছুই দেখার উপায় নেই। হয়ত ওঁরা নবাগত। এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে মোটেই পরিচিত নন। তাই শীতের বিরুদ্ধে সাবধান হলেও, গরমের সম্বন্ধে সচেতন হতে পারেন নি তাঁরা।

রবীন দেখল ভদ্রলোকটির দম বন্ধ হযে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। তাই তাড়াতাড়ি বলল : এ কী করেছেন ? জামাগুলো খুলে ফেলুন।

ভদ্রলোক বিস্মিত হযে বললেন : সে কি মশাই ? এখনই ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে।

না, না, লাগবে না।

ঠিক বলছেন ?

হ্যাঁ বলছি। আমি ডাক্তার। আপনার কোন ভয় নেই।

ভদ্রলোকের কথায় এবার কিছুটা সাহসের সুর শুনতে পাওয়া গেল ; তিনি ভদ্রমহিলার দিকে মুখ ফিরিযে বললেন : তাহলে খুলেই ফেলি, কি বলিস সুকু ?

কিন্তু কেউ কারও সমর্থনের অপেক্ষা না করেই পোষাক খুলতে আরম্ভ করলেন। একটির পর একটি পোষাক ; মাথার টুপি, হাতের দস্তানা, মোটা ওভার কোট, মাফলার, পুলওভার, পায়ের মোজা। পোষাকের পাহাড় জমে উঠল একেবারে।

পোষাক ছাড়ার পর ভদ্রলোক একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বললেন : আঃ, বাঁচলাম। কিন্তু আপনি সত্যিকারের ডাক্তার তো ?

মেয়েটি এই প্রথম কথা বলল : তোমাকে তো কালকেই বললাম বাবা, আশ্রমে একজন বিলেত ফেরৎ ডাক্তার আছেন।

রবীন প্রথমে একটু অবাক হয়েই চেয়ে রইল মেয়েটির দিকে ; তারপর বলল : বিলেতফেরৎ ডাক্তার ? কই, তেমন তো শুনিনি।

তাহলে হয়ত ভিয়েনা থেকেই এসেছেন।

মেয়েটির স্বরে এতটুকু খিঁচ নেই।

রবীন ঘাড় নাড়লো : তাও ঠিক নয় বোধ হয়।

মেয়েটি এবার একটু ঝাঁজের সুরে বলল : তাহলে ঠিকটা কী সেটাই বলুন। আপনি কী বলতে চান আশ্রমে কোন ডাক্তার নেই ?

নিশ্চয়ই রয়েছে। তবে এম. বি., বি. এস।

ভদ্রলোক এবারে মুখ খুললেন : ওতেই হবে, ওতেই হবে। বিদেশ বিভুঁই

কিনা। সুকুর আবার সর্দির ধাত ভীষণ। একজন পাশ করা ডাক্তার হলেই চলবে। আমার নাম নিবারণ তালুকদার। এইটি আমার মেয়ে সুকন্যা।

সুকন্যা জিজ্ঞাসা করে : আশ্রমের পথটা কোনদিকে বলে দিন তো।

আপনারা কি এখন আশ্রমেই যাবেন ?

নয়ত কি এই রোদে পুড়ব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ?

তাহলে আসুন আমার সঙ্গে।

তিনজনেই ধীরে ধীরে আশ্রমের দিকে এগিয়ে গেল।

রবীন নিজের ঘরে ফিরে দেখল শীলা দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরিপাটি করে সাজানো হয়েছে ঘরটি। সকালবেলার টাটকা ফুল এসেছে অনেক। ফ্লাওয়ার ভেসে বসেছে সে সব। টেবিলের ওপরে দুটি লাল গোলাপ।

রবীন ফিরতেই শীলা জিজ্ঞাসা করল : প্রাতর্ভ্রমনে বেরিয়েছিলেন বুঝি ?

প্রশ্নটি যাই হক, শীলার ধরণটি গুরুগম্ভীর। অনেকটা কৈফিয়ৎ চাওয়ার মত।

হেসে ফেলল রবীন ; বলল : হ্যাঁ।

একটু বলে গেলেই পারতেন। তা হলে অনর্থক আর খোঁজাখুজি করতে হত না।

রবীনের দুটি চোখই বিস্ফারিত হল : খোঁজাখুজি করেছেন নাকি ? হায় ভগবান ! কেন বলুন তো ? আমি নাবালক বুঝি ?

আপনার ঠিকুজি কুষ্টী তো আমার কাছে নেই। যাদের কাছে আছে তাঁদের না হয় জিজ্ঞাসা করুন গে। কিন্তু এদিকে যে দু-দুবার চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল তার কি ?

রবীনও যথেষ্ট গম্ভীর হয়েই উত্তর দিল : স্বাস্থ্যের দিক থেকে বিচার করলে ঠাণ্ডা চা-ই শরীরের পক্ষে উপকারী। নিয়ে আসুন।

এবার হেসে ফেলল শীলা ; বলল : স্বাস্থ্যের জন্যে যা বিধান দেওয়া দরকার বলে মনে করেন তা ঐ হাসপাতালে দেবেন। আমি আপনার হাসপাতালের নার্স নয়, কিচেনের বাবুর্চী। ভদ্রলোককে ঠাণ্ডা চা দিলে আমার দুর্ণাম রটার ভয় রয়েছে। চাই কি, কর্তাব্যক্তিরা জানতে পারলে চাকরিও নষ্ট হতে পারে।

রবীন গভীর সহানুভূতি দেখিয়ে বলল : তাহলে, স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়া সত্বেও গরম চা-ই খেতে হবে। আর দেরি করে লাভ নেই।

শীলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রবীন প্রথমেই আড়মোড়া ভাঙল। লাল গোলাপটি হাতে নিয়ে এক মনে দেখল, গন্ধ শুকল। তারপর দক্ষিণের জানালা দিয়ে চেয়ে রইল।

খাবার আর চা নিয়ে ঘরে ঢুকল শীলা।

হাত মুখ ধুয়েছেন, না সারাদিন জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে?

রবীন হঠাৎ পিছু ফিরে শীলাকে দেখে মুখ কাঁচুমাচু করে বলল: এই দেখেছেন, একদম ভুলে গিয়েছি। এক মিনিটে সব সেরে আসছি।

আর কোন কথা না বলেই সে সোজা বাথরুমে ঢুকল। হাত মুখ ধুয়ে ফিরে এল। তারপর টেবিল-এ বসেই বলল: এই সাত সকালে এত খাওয়া যায়?

খুব যায়। তাড়াতাড়ি খেয়ে চাকরি করতে বেরিয়ে পড়ুন। তারাদাস ব্রহ্মচারি দুবার আর রজনী কম্‌পাউণ্ডার চারবার খুঁজে গিয়েছেন আপনাকে। চাকরি আপনার থাকা দায় হবে দেখছি।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল শীলা। রবীন নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করে ঘরের মধ্যেই একটু পায়চারি করল। তারপর বেরিয়ে পড়ল হাসপাতালের দিকে।

৪

অতিথিভবন ছাড়িয়ে একটা পথ সোজা পূব দিকে এগিয়ে গিয়েছে প্রধান ফটক পর্যন্ত। সেই প্রধান ফটকের পাশে আশ্রমের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে কয়েকখানি একতলা পাকা বাড়ি। রবীন শুনল এইটিই এখানকার হাসপাতাল। বোধ হয় কিছু সারানোর কাজ চলছিল; একপাশে কয়েকটি বাঁশের ভারা, আর মিস্ত্রীদের দেখলেই তা অনুমান করা যায়।

এদিকে-ওদিকে চেয়ে হাসপাতালের ভিতরেই ঢুকে গেল সে। আনুষ্ঠানিক ভাবে সে এখনও হাসপাতালের দায়িত্ব গ্রহণ করে নি; এখানকার কর্মীদের সঙ্গেও তার আলাপ পরিচয় হয় নি। সেই আলাপ করার উদ্দেশ্যেই রবীন হাসপাতালের মধ্যে ঢুকে এল।

ঢোকার মুখেই কিছু ভিড় জমেছে। লোকগুলিকে দেখলেই মনে হবে এরা হয় চাষী, আর না হয় দিন-মজুর। মাথায় রুক্ষ চুলের ঝাঁপ, গালে দাড়ির

অরণ্য। পরণে নোংরা কাপড়; তাও হাঁটু পর্যন্ত তোলা। কারো গায়ে ততোধিক অপরিষ্কার ফতুয়া; কেউ আবার ছেঁড়া চাদরে আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে এসেছে। কেউ রোদে পিঠ দিয়ে বসে রয়েছে, কেউ পায়চারি করছে।

এদের পাশ কাটিয়ে ভিতরে চলে গেল রবীন। সামনেই ছোট একখানি ঘর। দরজা খোলা। ভিতরে একটি বিরাট লোক মালকোছা দিয়ে মুখ নিচু করে কচলে-কচলে শিশি ধুচ্ছে। টেবিলের ওপর আধ গামলা লাল জলের মত কি একটা পদার্থ রয়েছে।

লোকটিকে সে চিনত না। একটু কাশল রবীন। ওপাশে কর্মনিরত ব্যক্তিটির কাছ থেকে কোন শব্দ এল না। দরজার ওপর একটু ঠক ঠক করল। এবার লোকটি মুখ তুলে চাইল। প্রথমে ভ্রূকুটি, তারপর অগ্নিদৃষ্টি।

রবীন লক্ষ্য করল লোকটির বয়স পঞ্চাশের কম তো হবেই না, বরং কিছুটা বেশী হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অসুরের মত চেহারা। মাথার ঠিক চাঁদিটি ঘিরে বিরাট একটি বর্তুলাকার টাক চকচক করছে। তার আশেপাশে যে কয়েকগাছি চুল আছে সেগুলি সাদা হয়ে গিয়েছে। বিরাট মুখের ওপর খোঁচা-খোঁচা কাঁচায়-পাকায় মেশান ঘন চাপ দাড়ি। চোখ দুটি বড়-বড়। লাল টকটক করছে। হঠাৎ দেখলেই মনে হবে লোকটি বোধ হয় দিন রাত গাঁজা আর চরসে ডুবে রয়েছে। দীর্ঘ এবং সুঁচোলো নাক।

মুখের ওপর একটি অসামান্য রুক্ষতা ফুটিয়ে লোকটি তার দিকে চেয়ে রইল একটু। ক্রমশ সেই রুক্ষতা মিলিয়ে এল। দেখা দিল কিছু বিস্ময় আর কিছুটা কৌতূহল। তারপরেই মুখ থেকে একটা শব্দ বার করল। জিব দিয়ে অকস্মাৎ তালুতে আঘাত করলে যে রকম শব্দ হয় অবিকল সেই রকম। তারপর লোকটি প্রায় লঙ জাম্প দিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

গুড মর্ণিং, স্যার, গুড মর্ণিং। সকালেই আপনার ওখানে গেছলাম। শুনলাম, আপনি মর্ণিং ওয়াকে গিয়েছেন। আমার নাম রজনী মুখার্জি। এখানকার কমপাউণ্ডার।

রবীন একটু হেসে জিজ্ঞাসা করল: ওষুধ দিচ্ছিলেন বুঝি?

হ্যাঁ স্যার।

রোজ কত রোগী এখানে আসে, মিষ্টার মুখার্জি?

হপ্তায় বিশ পঁচিশ জন।

ব্যস্?

রজনী কমপাউণ্ডারের ঘাড় নড়ে উঠল : ব্যস। তাও ঐ সর্দি-কাশি হাঁপানি-জ্বর। আপনি যে বেশী লেখাপড়া শিখে এসে একটু ভাল করে চিকিৎসা করবেন স্যার, সে উপায় এখানে নেই।

একেবারে স্বর্গরাজ্য বলুন।

নরকের বেহদ্দ স্যার। যেমন নোংরা, তেমনি বজ্জাৎ। ওষুধ খেয়ে ওদের হবে কী ?

ঘরের দিকে চেয়ে রবীন জিজ্ঞাসা করল : ওষুধের বুঝি এই একটিই আলমারি ?

হ্যাঁ স্যার। ঐ একটাই শেষ হল না এক বছরে। আর কি হবে ? ওষুধ শুধু শুধু পচিয়ে লাভ কী ?

আপনার কাজ সারা হলে হাসপাতালটা একবার ঘুরে আসব, কেমন ?

রজনী কমপাউণ্ডার বলল : ঘুরে দেখার আর কি রয়েছে স্যার ? এই সবে ধন নীলমনি। একে হাসপাতাল বলতে চান বলুন, আর ডাক্তারখানা বলতে চান বলুন।

সে কি ?

রবীনের চোখে বিস্ময়ের পাহাড় নেমে আসে।

রবীনের মানসিক অবস্থাটা লক্ষ্য করে রজনী কমপাউণ্ডারের হয়ত একটু করুণার উদ্রেক হল। তাই সে বলল : কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না স্যার। এখানে দেখার অনেক জিনিষ রয়েছে। চলুন, দেখিয়ে আনি।

ওরা অনর্থক বসে থাকবে তো ?

থাকুক। কি এমন লাটসাহের দল এসেছেন ! বিনা পয়সায় ওষুধ নিতে গেলে অমন বসে থাকতে হয়।

রবীন একটু হেসে বলল : না, না, আপনার হাতের কাজটা শেষ করুন। আমি বরং একটু অপেক্ষা করছি।

যা বলেন।

আর কথা না বাড়িয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে গেল রজনী কমপাউণ্ডার। শিশিগুলি একজায়গায় জড় করল। গামলার ভিতর ডুবিয়ে সেইগুলি লাল জলে ভর্তি করল। ছিপি আঁটল। একটা ময়লা তোয়ালে দিয়ে সেগুলি মুছে সাঁই সাঁই করে বারকত ঝাঁকানি দিল। তারপর হাত মুছে হাঁকল ; রামশরণ, ধনিয়া, হেই গুলাল........

দল বেঁধে সবাই ডাক্তারখানায় হাজির হল। রজনী কমপাউণ্ডার প্রত্যেকের হাতে একটা করে শিশি তুলে দিয়ে হিন্দী-বাংলায় মোটামুটি বুঝিয়ে দিলে ব্যাপারটি। আর একথাটিও তাদের সবিশেষ বলে দিলে যে সাত রোজকা ইধার তারা যেন ভুলেও এদিকে পা-টি না বাড়ায়। তাহলেই বিপদ ঘটবে।

লোকগুলি রজনী কমপাউণ্ডারের ব্যবস্থা ভাল ভাবে সমঝে দু'চারবার এদিক ওদিক ঘাড় দুলিয়ে প্রস্থান করল।

রবীন জিজ্ঞাসা করলে : কি ওষুধ দিলেন?

সাইলেসিয়া মিক্সচার।

সকলকেই?

রজনী কমপাউণ্ডার কাঁধে একটা শ্রাগ করে বলল : কি করব স্যার? ডাক্তার নেই, তা শোনে কে? বেরাম হয়েছে, দাওয়াই দাও। তা একেবারে হাঁকিয়ে দেওয়ার চেয়ে কিছু দেওয়া ভাল। আপনি এবার এসেছেন, চাজ পত্র বুঝে নেন। আমার দাযিত্ব কাটল।

যেন একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলল রজনী কমপাউণ্ডার।

রবীন বলল : কিন্তু ওষুধপত্র না আনলে........

রজনী কমপাউণ্ডার বলে : ও-টি আর আমার কাছে বলবেন না স্যার। সেক্রেটারীকে বলে বলে হাললাক হয়ে গিয়েছি। কিন্তু কে কার কথা শোনে? কিছু বলতেও ভরসা পাইনে। হয়ত বলে বসবে, তুমি আদার ব্যাপারী, তোমার জাহাজের খবরে দরকার কি হ্যা? নিজের মান নিজের কাছে, স্যার। তাই আমিও মুখটি টিপে বসে রয়েছি।

রজনী কমপাউণ্ডারকে নিয়ে রোঁদে বেরোল রবীন; অর্থাৎ পাশের বড় ঘরটিতে গিয়ে বসল। এ-ঘরটি একটু বড়ই। তিনটি জানালা; দুটি দরজা। একটি টেবিল, চারটি চেযার।

তাড়াতাড়ি চারপাশের জানালা, আর কপাট খুলে দিয়ে রজনী কমপাউণ্ডার বলল : এইটি আপনার ভিজিটিং রুম। আপনি আসবেন বুঝতে পারিনি, তাই ধুলো ঝাড়া হয় নি। আপনি কি স্যার এইখানেই বসবেন?

হ্যাঁ, নয়ত আর বসব কোথায়?

বসার জায়গার আর অভাব কি? আপনার আগে যিনি ছিলেন তাঁর তো পায়ের ধুলো এখানে পড়তই না। রোগী এলেই বলে দিতেন, কমপাউণ্ডার বাবুর কাছে যাও।

তাই বুঝি ? তাহলে তিনি করতেন কী ?

ডাক্তারি ছাড়া বাকি সব কাজ।

রবীন আশ্চর্য হল : বাকি সব ?

রজনী কমপাউণ্ডার বড় চোখ দুটিকে আরও বড় করে বলল : এখানে কি কাজের অভাব স্যার ? তারাদাস ব্রহ্মচারির পিছু পিছু ঘুরে বেড়ানই তো জবর কাজ। ইহকাল পরকালের সব কাজ সারা হয়ে যাবে।

লোকটির কথা বলার ধরণ-ধারণে নূতন মানুষের পক্ষে হোঁচট খাওয়ারই কথা। রবীনও একটু অস্বস্তি বোধ করল। অস্বস্তিভাবটা কাটলে সে ভাবল রজনী কমপাউণ্ডারের মূল বক্তব্যটিকে বেশ কিছুটা এপাশ-ওপাশ করে নিতে হবে। এখানকার ব্যবস্থাপনার ওপর সে বেশ চটা। তাই সে প্রসঙ্গটিকে ঘুরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল।

আপনি এখানে কতদিন এসেছেন, রজনীবাবু ?

এই ফাগুনে পাঁচ বছর দশ দিন হবে। কিন্তু এ কাজ আর ভাল লাগছে না স্যার। এর চেয়ে গরু চরানোও অনেক ভাল।

রজনী কমপাউণ্ডারের কাছে সেদিন কিছুটা শুনল রবীন। বছর চারেক আগে আচার্যদেবের একজন ধনী শিষ্যা এসেছিলেন এই আশ্রমে। সঙ্গে তাঁর ছিল একটি শিশুপুত্র। বার ঘণ্টার মধ্যেই ছেলেটি ভেদবমিতে মারা গেল। তখন এ অঞ্চলে কাছাকাছি কোথাও কোন ডাক্তার ছিল না। সেই দুঃখেই ভদ্রমহিলা এখানে একটি হাসপাতাল তৈরি করার জন্যে পাঁচলাখ টাকা, আর পরিচালনার জন্যে তিনশ বিঘে জমি কিনে দেন। তাঁর দেখাদেখি আচার্যদেবের অন্যান্য ভক্তরাও আরও পাঁচলাখ তুলে দিয়ে একটি ট্রাসটি বোর্ড গঠন করেন। সেও প্রায় বছর তিনেক আগের কথা। সেই থেকে ধীরে ধীরে হাসপাতালটি গড়ে উঠেছে।

গড়ে উঠেছে বলা ভুল। গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে যে অবস্থায় এসে এটি দাঁড়িয়েছে তাতে হতাশ হওয়ারই কথা। সহরের হাসপাতালগুলির সঙ্গে তার যথেষ্ট পরিচয় ছিল বলেই সে এখানে একটা বড় আশা নিয়ে এসেছিল। তার সেই কল্পনায় প্রথম আঘাত হানল রজনী কমপাউণ্ডার। দ্বিতীয় ঘা দিল হাসপাতালটির আভ্যন্তরীণ অবস্থা। যে-কোন পাড়াগাঁয়ে দাতব্য-চিকিৎসালয় বলে যে জিনিষটি রয়েছে এটি অবিকল সেই বস্তু। কিছুমাত্র ইতর-বিশেষ নেই। একখানি ছোট ঘর ; অপরিচ্ছন্নতাই তার অঙ্গসৌষ্ঠভ। একটি মাত্র ওষুধের আলমারি। তার কাঁচও কিছু ভেঙেছে, ভিতরে ওষুধও দুচার

বোতলের বেশী নেই। সেগুলি এত অপরিষ্কার এবং এত প্রাচীন যে স্বাস্থ্যরক্ষার অতি প্রাথমিক নিয়ম মানতে গেলে সেগুলির সমূলোৎপাটন অবশ্য করণীয়।

কিন্তু তাই বলে সে চুপ করে বসেছিল না। সে কেবল কটা টাকা রোজগার করতেই এখানে আসে নি। এসেছিল সত্যিকার একটি আদর্শ নিয়ে, সেই সঙ্গে এনেছিল অফুরন্ত কাজের উদ্দীপনা। সহরের নামজাদা ডাক্তারদের দেখে-দেখে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। যেখানে রোগের চিকিৎসার চেয়ে ডাক্তারের কাছে মেডিক্যাল এথিকস বড় সেখানে চিকিৎসক আর রোগীর মধ্যে কোন নাড়ির যোগ থাকতে পারে না। যেখানে পয়সা না থাকলে মানুষকে ফুটপাতের ওপর পড়ে মরতে হয়, যেখানে হাসপাতাল আর গোয়ালঘরের মধ্যে পার্থক্য নেই, যেখানে চিকিৎসাশাস্ত্রে সত্যকার দক্ষতা অর্জন করার মত মনঃসংযোগ অধিকাংশ চিকিৎসকের নেই, সেই সভ্য জগত থেকে তাই সে ছুটে এসেছিল এইখানে। নিজের সমস্ত শক্তি, সামর্থ্য আর সহানুভূতি দিয়ে সে মানুষের সেবা করবে, এই ছিল তার তরুণ মনের আদর্শ।

সুতরাং পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা যত প্রতিকূলই হক, সে হাল ছেড়ে দিল না। আশ্রমের অধিকর্তাদের সঙ্গে যুক্তি করল, তর্ক করল। আর সেই সঙ্গে প্রাথমিক কাজের সূচনা হিসাবে কিছু আদায়ও করল। ওখানকার দু'খানি ঘরই হাসপাতালের জন্যে বরাদ্দ হল। মোটামুটি ভাবে ডাক্তারখানাটিকে সাজানো হল। আন্তর্বিভাগের জন্যে তিনখানি ঘর পৃথক করে রাখা হল। ওষুধপত্র আনার জন্যে কলকাতায় অর্ডার গেল।

কিন্তু কয়েকটি সপ্তাহের মধ্যেই তার গতি ব্যাহত হল। যাদের জন্যে হাসপাতাল তাদেরই দেখা নেই। আগে তবু সপ্তাহে বিশ পঁচিশ জন আসত, এখন তাও কমে এল। এ অঞ্চলে যে রোগ ছিল না তা নয়; তবে রোগের অনুপাতে রোগীর সংখ্যা ছিল যথেষ্ট কম। শয্যাশায়ী হওয়ার আগে এরা রোগকে রোগ বলে ভাবতে শেখে নি। শয্যাশায়ী হওয়ার পরেও এরা ডাক্তারের চেয়ে দেবতা, পুরুত, আর ওঝার ওপর নির্ভর করেছে বেশী। কেবল তাই বা কেন? কিছুদিনের মধ্যেই রবীন বুঝতে পারল যে ভাগ্যচক্রে এমন একটি জায়গায় সে এসে পড়েছে যেখানে স্বাস্থ্যের ওপর মানুষের নজর যত কম, ওষুধের ওপর বিদ্বেষ ততটা বেশী।

শীলা মাঝে-মাঝে গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করে: রোগী নেই, অথচ শ্মশান জেগে বসে থাকেন কেন?

রবীন হেসে বলে : আমার চাকরিই যে এই, মিস লাহিড়ী।

চাকরি না ছাই ; তার চেয়ে তারাদাস ব্রহ্মচারির পিছু পিছু ঘুরুন, আখেরে কাজ দেবে।

তারাদাস কেন ?

তা জানি নে। যা করলে ভাল হবে তাই বলছি শুধু।

সদানন্দদেবও একটু হেসে বলেন : ঘাবড়াস নি, রবি। আদর্শবাদ আর বাস্তব এক জিনিষ নয়। ভগবান দুটো চোখ দিয়েছেন ; একটু চেয়ে চলিস।

রবীন এদের অনেক কথাই বুঝতে পারে না। তবে এটুকু বোঝে যে এখানকার মানুষদের জন্যে হাসপাতাল খোলার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। প্রয়োজনীয়তা ছিল আশ্রমিকদের স্বাস্থ্যরক্ষা করার জন্যে ; আর প্রয়োজন ছিল হাসপাতালের জন্যে বরাদ্দ টাকা খরচ করার। রবীনের বুঝতে দেরি হল না যে দাতার ইচ্ছা, আর ট্রাস্টি বোর্ডের অনুশাসন অনুযায়ী হাসপাতালটি তৈরি হয়েছে ; সেই অনুযায়ী ডাক্তারও আনতে হয়েছে। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটিই আনুষ্ঠানিক। তার ব্যবহারিক প্রয়োজনটা বড় কম।

সেদিন তারাদাস নিজেই বললেন রবীনকে : উৎসব তো এগিয়ে এল, ডঃ দত্ত ; এখন আপনার দিকটা গুছিয়ে নিন।

রবীন একটু হেসে বলল : মাথা না থাকলে আর মাথাব্যাথা কোথায় ব্রহ্মচারি ? রোগী কোথায় যে গুছিয়ে নেব ?

তারাদাসও একটি পরিচ্ছন্ন হাসি হেসে বললেন : আপনার নৈরাশ্যের কারনটা বুঝতে পারি, ডঃ দত্ত। তবে, ওষুধ খেয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে নীরোগ হয়ে বেঁচে থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তবু আমাদের তৈরি থাকতে হবে ; কারণ, সামনে আশ্রমের বার্ষিক উৎসব। ভারতের নানা জায়গা থেকে বহু গন্যমান্য অতিথির শুভাগমন হবে। তাঁদের পরিচর্যায় কোন ক্রুটি হলে চলবে না আমাদের।

তা বটে।

সেজন্যে ব্যবস্থাও আমি একটা করেছি। হাসপাতালের জন্যে যা যা প্রয়োজন হবে বলে মনে করেন আপনি তার একটা লিস্ট করে দিন। দশ হাজার টাকার যেন বেশী না হয় দেখবেন একটু দয়া করে।

দশ হাজারের মতই রবীন লিস্ট করে পাঠিয়েছিল। তার কী হল তা তার জানার কথাও নয় ; জানেও না সে।

৫

উত্তরমাঘের দিনগুলি কর্মব্যস্ততায় মুখর করে তুলেছে আশ্রমটিকে। পরিবর্তন, পরিবর্জন, আর সংস্কার চলেছে আশ্রমের ভিতর। অতিথিভবন আর হাসপাতাল নতুন সাজে সেজে উঠেছে। আর কয়েকটি দিন পরেই দোল উৎসব। এ কেবল আশ্রমেরই উৎসব নয় ; দশ-বিশ মাইল জুড়ে মানুষের উৎসব। গোটা বছর ধরেই তারা এই কটি দিনের জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকে। সে ক-দিন আবিরে-আবিরে লাল হয়ে যায় এখানকার মাটি, পাথর, গাছ আর জল। এখানকার আকাশে-বাতাসে গরম খিঁচুড়ির গন্ধ ওঠে। আর হাজার হাজার লোক ঝাঁপিয়ে পড়ে বছরের শেষ মেলাটিতে।

রবীন একটু ফাঁকাতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সন্ধ্যা তখন নেমে এসেছে আশ্রমের আঙিনায়। রাস্তার বাতিগুলি জ্বলে উঠেছে। মন্দিরের চারপাশ ঘিরে তখনও পুরোদমে কাজ চলেছে।

আশ্রমটিকে বাইরে থেকে হঠাৎ দেখলে যেমন শান্ত সমাহিত বলে ধারনা হয়, ভিতরে এ কিন্তু মোটেই তা নয়। এ এক বিচিত্র জগত। এখানকার আশ্রমিকদের বাইরে যে মূর্তি তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নকল, মঞ্চের উপর অভিনয়-শিল্পীর পোষাকের মত। এদের যদি বুঝতে হয় তো ভিতরে আসতে হবে, ধাক্কা দিতে হবে এদের অসতর্ক মনের দরজায়।

ডাক্তার হিসাবে সে সুযোগ রবীনের এসেছে। ডাক্তারের কাছে নাকি মানুষ অসহায় ; তাই এত সহজে অসতর্ক হয়ে পড়ে সে।

ডাক্তার, ডাক্তার !

গভীর রাত্রিতে রবীনের দরজার কড়া নড়ে উঠল ; তখন কত রাত কে জানে ; কিন্তু সমস্ত পৃথিবী নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে কেবল নিশাচর পাখির পাখার ঝাপট আর পাহাড়ের অন্তরালে হায়নার অট্টহাসি।

ধড়পড় করে উঠে পড়ল রবীন।

ডাক্তার, ডাক্তার !

আবার সেই ব্যাকুল আর্তনাদ !

দরজা খুলে বেরিয়ে এল রবীন। দেখল তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আনন্দ মহারাজ।

কি ব্যাপার ? এতরাত্রে ?

ঘরের মধ্যে আনন্দ ঢুকে এলেন। তারপর সটান ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বললেন : এক গ্লাস জল দাও ডাক্তার, গলাটা শুকিয়ে গিয়েছে।

রবীন তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল নিয়ে আসতেই প্রায় ছিনিয়ে ঘটঘট করে সমস্ত জলটা খেয়ে ফেললেন : আঃ!

তারপর গ্লাসটা নামিয়ে রেখে বললেন : অন্ধকারকে বড় ভয় করে ডাক্তার।

অন্ধকারে বেরিয়েছিলেন কেন ?

আনন্দ একটু চুপ করে রইলেন ; তারপর বললেন : দেখতো ডাক্তার আমার প্রেসারটা। বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে। বুকের ওপর যেন একটা চাপ লাগছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

রবীন চেয়ে রইল আনন্দ মহারাজের দিকে। মাথার চুলগুলি উসকো খুসকো। মনে হয়, এইমাত্র যেন প্রচণ্ড কোন ঝড়ের মধ্যে পড়েছিলেন। চোখ দুটো লাল। নাড়ী টিপে দেখলে সেখানে দ্রুততার লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

এই প্রথম নয়। মাঝে মাঝে আনন্দ মহারাজ এই রকমই করেন। অন্ধকারকে তিনি ভয় করেন ; অথচ সুযোগ পেলেই গভীর রাতে ঘর ছেড়ে আশ্রমের পথে পথে ঘুরে বেড়ান। সকাল বেলা কেউ কেউ তাঁকে গাছের তলায় ঘুমিয়ে থাকতে দেখেছে।

দিনের বেলায় আনন্দ মহারাজ অন্য মানুষ। শান্ত, শিষ্ট, কেতাবদুরস্ত, বুদ্ধিমান। আশ্রমের একটি গুরুদায়িত্ব তাঁর ওপর। আশ্রমিক শিল্পকেন্দ্রের অধ্যক্ষ তিনি। এক সময় কলকাতা হাইকোর্টের বেশ নামকরা ব্যারিস্টার ছিলেন। পৈত্রিক অর্থ যা ছিল তাতে রোজগার না করেও অধস্তন তিন পুরুষ বহাল তবিয়তে থাকতে পারত ; তিনি নিজেও যা রোজগার করতেন তাও যথেষ্টর অনেক অনেক ওপর। সংসারধর্ম পালন করবেন বলেই বিয়ে করেছিলেন ; মাত্র বছর দুই পরে হঠাৎ তিনি সব ছেড়ে বিবাগী হয়ে যান। তারপর চার বছর একেবারে নিরুদ্দেশ। সদানন্দের সঙ্গে দেবপ্রয়াগে তাঁর আলাপ। সেখান থেকে সটান এখানে এসে উপস্থিত হন। তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে এখানে একটি শিল্পকেন্দ্র স্থাপন করেন। দশ বছর আগে যে শিল্পকেন্দ্রটি স্থাপিত হয়, আজ সেখানে প্রায় একশটি নারী আর পুরুষ হাতের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। কম কৃতিত্ব নয় আনন্দ মহারাজের।

সেই মহারাজ অন্ধকারে আশ্রমের পথে-পথে একা-একা ঘুরে বেড়ান কেন, সে সংবাদ কেউ জানেনা। তিনি নিজেই কি জানেন ?

রবীন একটা সেরিডন এগিয়ে দিয়ে বলে : খেয়ে আমার বিছানায় শুয়ে পড়ুন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব কমে যাবে!

মহারাজ ফ্যাল-ফ্যাল করে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন রবীনের দিকে। বলেন : তুমি কিচ্ছু জান না ডাক্তার। ও-তে কিছু হবে না। ঘুম আমার হবে না। জীবনে কোনদিনই আমি ঘুমোতে পারব না।

পারবেন, পারবেন। নিশ্চয় ঘুম হবে আপনার।

সংশয়ে ঘাড় নাড়েন মহারাজ। কী যেন ভাবেন একটু। তারপর আস্তে-আস্তে বলেন : আচ্ছা ডাক্তার, মনের রোগ সারাবার কোন ওষুধ নেই তোমাদের শাস্ত্রে ?

নিশ্চয় রয়েছে।

রয়েছে ?

আপনার কি ধারনা আমরা কেবল দেহেরই চিকিৎসা করি ?

আনন্দ মহারাজ একটু নিঃশ্বাস ফেলে বলেন : আছে ? বেশ, তাহলে আমার মনেরই চিকিৎসা কর। আমি বলে যাই, তুমি ওষুধ বাতলাও।

রবীন পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বলল : বলুন। কিন্তু তার আগে সিগারেট খান। যতগুলি পারেন। এই টিন রইল কাছে।

ধন্যবাদ।

একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলেন আনন্দ মহারাজ। দু একবার টানার পর প্রাথমিক উত্তেজনাটা যেন থিতিয়ে এল কিছুটা। ইজি চেয়ারে গা-টা এলিয়ে দিলেন! তারপর বললেন : শোন ডাক্তার, আজ থেকে বিশ বছর আগের কথা বলছি। তখন আমি গ্রেস-ইনে পড়ি।

সেই সময় আমার যিনি ল্যাণ্ডলেডী ছিলেন তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ। ডলি, ডলি বেনেট। ক্যাপটেন বেনেট যখন দমদম ক্যানটনমেণ্টে, সেই সময় মিসেস বেনেটের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। মিসেস বেনেট অর্থাৎ সুষমা মুখার্জি বিধবা ছিলেন। সুষমাদেবীর বাবা ছিলেন ক্যাপটেন বেনেটের একজন কর্মচারী। সুষমাদেবীর তখন ভরা যৌবন; অথচ তাঁর বাবা ছিলেন সেকেলে রক্ষণশীল। সেই অনিশ্চিত ভরা যৌবনের নিষ্ঠুর আবেগ যে তাঁর মনের মধ্যে তোলপাড় করত না একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়; তবু উপায় ছিল না তাঁর। বাপ-মার মত তিনিও এই ভাগ্যের পরিহাসকে স্থিরচিত্তে মেনে নিয়েছিলেন।

হঠাৎ দেখা হল ক্যাপটেন বেনেটের সঙ্গে। এই রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের

লৌহ যবনিকা ভেদ করে কেমন করে যে বেনেটের সঙ্গে তাঁর আলাপ হ'ল, সে ইতিহাস আমি জানি নে; কেবল এইটুকু জানি যে ক্যাপটেন বেনেট যখন সিঙ্গাপুরে বদলি হয়ে যান, তখন তাঁর পাসপোর্টে তিনি নিজেকে বিবাহিত বলে জানান, এবং পাশপোর্টে যে মহিলাটির ছবি ছাপা থাকে সেটি সুষমাদেবীর।

এই অর্দ্ধশিক্ষিতা বাঙ্গালী তরুণীটিকে নিয়ে ক্যাপটেন বেনেট সিঙ্গাপুর চলে গেলেন। তাঁদেরই মেয়ে ডলি। ক্যাপটেন বেনেটের অকস্মাৎ মৃত্যুর পর সুষমা বেনেট আর বাংলাদেশে ফিরেন নি; সোজা চলে গিয়েছিলেন বিলেতে, তাঁর স্বামীর ভিটেতে। তাঁর স্বামীর আত্মীয়স্বজন তাঁকে অনাদরে দূরে সরিয়ে না দিয়ে আদর করে আত্মীয়ার স্থান দিয়েছিলেন।

সুষমা বেনেট ছিলেন আমার ল্যাণ্ডলেডী, অবশ্য কিছুদিনের জন্যে। মনের দিক থেকে আমি চিরকালই একটু বোহেমিয়ন। ল্যাণ্ডলেডীর কোনরকম নিয়মকানুন মেনে চলা আমার পক্ষে কষ্টকর ছিল। ফলে অনেকদিন ডিনার খেতাম না তাঁর বাড়ীতে। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হোটেলেই কাটিয়ে দিতাম।

সেদিনটার কথা বেশ মনে রয়েছে। পিটপিটে বৃষ্টিতে ভিজে ফিরেছি সবে। ঘরের হিটারটা জ্বালিয়ে দিয়ে গুনগুন করে গান করছি। এমন সময় একটি তরুণী ডিনার হাতে নিয়ে হাজির হল। সুশ্রী সুঠাম চেহারা, মুখে বেশ একটি কমনীয়তার আভাস। মেয়েদের নিয়ে তার আগে যে ফস্টিনস্টি করি নি তা নয়; কিন্তু আমার চোখে সেই প্রথম একটি তরুণী পড়ল যার দিকে একবার মাত্র চেয়েই চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হলাম আমি।

তরুণীটি ধীরে ধীরে কাছে এসে টেবিলের ওপর ডিনারপ্লেট রেখে বলল : আমার নাম ডলি। মাস দুই প্যারিতে গেছলাম বন্ধুর কাছে বেড়াতে। আজই ফিরেছি। মায়ের শরীরটা একটু খারাপ। তাই আমিই নিয়ে এলাম।

পরিষ্কার ঝরঝরে বাংলা। এতটুকু আড়ষ্টতা নেই।

বললাম : আপনাদের কষ্ট দিলাম। ডিনার খেয়ে এসেছি।

ডলি বেনেট একটু হেসে বলল : ক-দিনই শুনছি আপনি বাইরে খেয়ে আসছেন। তাহলে পেমেণ্ট করছেন কেন ?

বললাম : ও কিছু নয়, কিছু নয়।

আরও দু'চারটে কথার পর সেদিন চলে গেল ডলি বেনেট।

আনন্দ একটু চুপ করে রইলেন। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন : সেই থেকে সে এক অদ্ভুত মাতলাম সুরু হল আমার। ডলি বেনেটের

আকর্ষন আমাকে টেনে নিযে এল ঘরের ভিতর। খেলাধূলা ছাড়লাম, বন্ধুবান্ধব ছাড়লাম। ডলিকে একান্ত নিজস্ব করে পাওয়ার চেষ্টাটাই তখন আমার মনে প্রবল হয়ে দেখা দিল।

স্বচ্ছন্দবিহারিণী ডলি। দৈনন্দিন জীবনে তার এতটুকু বিচ্যুতি নেই। সে আমার সঙ্গে হাসত, গল্প করত, সিনেমায় যেত, নাচে যেত। সময় সময় ডিনার খেতেও আপত্তি ছিল না তার।

একদিন ডিনার খাওয়ার পর ডলিকে আমার মনের কথা খুলে বললাম। তাকে না হলে আমার চলবে না।

ডলি যেন এইটিই আশা করছিল আমার কাছে। তাই আমার প্রস্তাব শুনেও সে আশ্চর্য হয় নি। আপনার মনে নখ খুঁটতে-খুঁটতে বলল: বড় দুঃখিত মুখার্জি। আমি এনগেজড।

তিনটি মাস আমি ডলির সঙ্গে ছায়ার মত ঘুরেছি। কিন্তু কোনদিন জানতেও পারি নি যে আর একজনের প্রত্যাশায় সে তার হৃদয়-দুয়ার খুলে বসে রযেছে।

আশ্চর্য হযে বললাম: সে কি? এ-কথাটাতো শুনি নি আগে?

ডলি বেনেট কেবল একটু হেসে বলল: আমি দুঃখিত।

আর কোন কথা না বলেই সেদিন দুজনে বাড়ীতে ফিরে এলাম। ট্যাক্সিতে পাশাপাশি বসলাম, তবু কেউ কাঁরও চিন্তার জগতে হস্তক্ষেপ করলাম না। বাড়ীতে এসে শুভরাত্রি জানালাম দুজনেই। তারপর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

পরের কটা দিন একেবারে পরিপূর্ণ নিঃসঙ্গতার মধ্যে কাটল। মনে হল আমার সমস্ত জীবনটাই ব্যর্থ হ'য়ে গিয়েছে। কাজে মন নেই। কোন কিছুতেই উৎসাহ নেই। অনেক রাত্রি করে বাড়ী ফিরতাম।

সাতটা দিন এইভাবে কাটল। সেদিন ছিল রবিবার। রাত্রিতে ফিরলাম একটু তাড়াতাড়ি। পরীক্ষা শেষ হযেছে। পাশ করেছি।

দরজা খুলে ঢুকল ডলি। আমি মুখ নিচু করে রইলাম।

ডলি বলল: কনগ্র্যাচুলেসনস। কিন্তু এভাবে আত্মনির্যাতনের অর্থ কি মিঃ মুখার্জি?

বললাম: মাঝে-মাঝে মানুষের ওটা প্রয়োজন হয়, মিস বেনেট।

ডলি একটু চুপ করে রইল। দু'এক পা এগিয়ে এল। আমার মাথাটা হাত দিয়ে তুলে বলল: মানুষের ভুল তো হয়। নারী আর পুরুষের মধ্যে আরও সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। আমাদের বন্ধু হতে আপত্তি কী?

মুখ তুলে চাইলাম। হয়ত আমার চোখ ভিজে উঠেছিল। ডলি তার হাতের চেটো দিয়ে আমার চোখ মুছিয়ে দিল। আর ঠিক সেই সময় আমি পাগলের মত ডলিকে সজোরে বুকে চেপে ধরলাম; চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলাম তার মুখ। ডলি প্রথমটায় বাধা দিল একটু; তারপর আমার সেই পশুশক্তির কাছে হার মানল।

কয়েক মিনিট পরে আর কোন কথা না বলেই ডলি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। রাত্রিতে ডলির মা এসে খাবার দিয়ে গেলেন। পাশের জন্য অভিনন্দন জানালেন। ডলির শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গিয়েছে সে কথাটাও বলে গেলেন।

সে-রাত্রি আমার চিন্তার জগতে একটি বিপর্যয় ঘটিয়েছিল। একদিকে ডলি, আর একদিকে আমার ভবিষ্যৎ। মানুষ যে আসলে পশু সেই কথাটাই সেদিন বারবার আমার মনে এসে উঁকি দিচ্ছিল; আর সহস্র ধিক্কারের চাপে আমি যেন মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ডলির চোখের ঘৃনা আমার সমস্ত হৃদয়কে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছিল। সমস্ত রাত বিনিদ্র অবস্থায় কাটিয়ে ভোরের দিকে হঠাৎ ঠিক করে ফেললাম, কনটিনেণ্টে একটু ঘুরে আসব।

মিসেস বেনেটের নামে একটি চিঠি লিখে ওখানকার পাট একেবারে চুকিয়েই বেরিয়ে পড়লাম।

প্যারিতে দিন পনের থাকার পর সুইটজারল্যাণ্ড। সেখানে মাস খানেক থাকার পর রোম; রোম থেকে একদিন সোজা দেশে ফিরলাম। এই ক-টা মাসই ডলির সেই ঘৃনা গ্রীক ট্যাজিডির ফিউরির মত আমার পিছু পিছু তাড়া করেছে। কোন জায়গতেই শান্তি পাই নি। বারবার নিজেকে নিজে বলেছি, একী করলে তুমি? তুমি তো এমন ছিলে না; কী করে তুমি এতটা নীচে নামতে পারলে?

সময়ের কিছু আগেই ফিরে এলাম বলে বাবা খুশিই হয়েছিলেন। এবং আমিও সব কিছু ভোলার জন্যে কলকাতা বারে জয়েন করলাম। প্রচুর কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলাম। যদি ভোলা যায়।

আবার একটু থামলেন আনন্দ মহারাজ। হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে গ্লাসটা নিয়ে একটু জল খেলেন। একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর চোখ বুজিয়ে ধোয়া ছাড়তে লাগলেন।

বাবা ছিলেন কলিকাতার একজন ব্যারিস্টার। সুতরাং আমারও পসার

জমতে দেরি হল না। মাস ছয়েকের মধ্যেই এক রকম জোর করেই বিয়ে দিলেন বাবা।

একটি বছর কাটল। নূতন জীবনের মোহ আর কাজের চাপ এ-ত্নটির মধ্যে পড়ে হয়ত ডলিকে ভুলেই গেছলাম। সাগর-পারের একটি নির্জন রাত্রির নির্লজ্জতার স্মৃতি মাঝে মাঝে মনের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করলেও, তার তীব্রতা ক্রমেই কমে কমে আসছিল। হয়ত একদিন সেটা বিস্মৃতির অতল তলেই তলিয়ে যেত ; কিন্তু সবই ওলট-পালট করে দিল বম্বে থেকে লেখা ডলির চিঠিখানা। ছোট্ট চিঠি ; কিন্তু তারই মধ্যে লুকিয়ে ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজিডি।

ডারলিং,

জানতাম তুমি আমাকে ভালবেসেছিলে। কিন্তু ভালবেসে এত বড একটি ত্নঃখকে আমার মাথায় তুলে দিয়ে এলে কেন ? সেদিন সমস্ত রাত্রি ধরেই নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। বার বার নিজেকে বোঝাতে চেয়েছি যে তোমার ও ভালবাসা নয়, অভিনয়। কিন্তু বারবার তোমার সেই ছলছল চোখত্নটির কথা আমার মনে পডেছে।

পরের দিন সকালেই তোমার ঘরে ছুটে গেলাম। দেখলাম টেবিলের ওপর তোমার ডিনারটি পড়ে রয়েছে। রাত্রে কিছু খাও নি তুমি। তারই পাশে তোমার একখানি চিঠি, আর তোমার খরচের টাকা।

চিঠিখানি পডেই সব বুঝতে পারলাম। আমার আত্মসমর্পণকে সেদিন বুঝতে পার নি, তুমি। তার পরিবর্তে তোমার নিজের বর্বরতার গ্লানিটাকেই বড করে দেখেছিলে। আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম তোমার উদারতার সৌজন্যে। এতদিন তোমাকে কেবল প্রেমিক বলেই জানতাম। সেদিন জানলাম তোমার প্রেম মহীয়ান। কিন্তু তুমি কি জানতে না যে নারী চিরদিনই বীর্যবানের কাছে সানন্দে আত্মসমর্পণ করে এসেছে ? ভালই যদি বেসেছিলে, তাহলে এত বড় ভুল করলে কেন ? জোর করে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলে না কেন ?

তোমাকে খুঁজতে প্যারিতে গিয়েছি, গিয়েছি সুইটজারল্যাণ্ডে ; রোমে হাজির হয়েছি। তার পরেই তুমি নিখোঁজ।

তারপর দীর্ঘ এতগুলি দিন কাটল। অসুস্থ মাকে ফেলে কোথাও যাওয়ার উপায় ছিল না আমার। তিন মাস হল মা মারা গিয়েছেন। আজ আমি একা। ইংলণ্ডে তোমারই একটি বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা একদিন। সেইখানেই শুনলাম

তোমার কথা। অভিমানে ভেঙে পড়েছিলাম সেদিন। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আর তোমার কথা ভাববো না। কিন্তু পারলাম না। বম্বেতে এসেছি। তোমার সঙ্গে দেখা করার সাহস নেই আমার। যদি বল, কলকাতায় যেতে পারি। ইতি, ডলি।

এই পর্যন্ত বলে আনন্দ মহারাজ করুন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন রবীনের দিকে। তাঁর চোখের তারায় একটি দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষা টলমল করছে।

তারপর? রবীনই কথা বলল প্রথমে।

কোন দিন ভূমিকম্প দেখেছ, ডাক্তার? একটার পর একটা বাড়ি যখন পৌষের ঝরাপাতার মত মাটিতে লুটিয়ে পড়ে? আমার জীবনেও সেই রকম একটি ভূমিকম্প ঘটে গেল। একটি অকস্মাৎ, দুর্বার ভূমিকম্প। আর তাতেই আমার সমস্ত ভিত্তি চুরমার হয়ে গেল। বারবার দেওয়ালে মাথা ঠুকে বলেছি, তুই এ কী করলি, তুই এ কী করলি?

ছুটে গেলাম বম্বেতে। সেই জলভরা দুটি চোখ, আর ঠোঁটের পাতে-পাতে মৃদু হাসির রেখা। যেন অনেক দিন ধরে কেঁদেছে ডলি; যেন অনেক ঝড় বয়ে গিয়েছে তার ওপর দিয়ে।

কাজ ছাড়লাম, সংসার ছাড়লাম, ধর্ম ছাডলাম। একটি মাস কাটিয়ে দিলাম বম্বেতে।

তারপর একদিন আমার স্ত্রী হাজির হল। দুটি কাজ নিয়ে সে বম্বেতে এসেছিল।

ডলির সঙ্গে প্রথম সম্ভাষণেই সে বলল: একলাখ টাকার চেক দিচ্ছি তোমাকে। পাসপোর্ট রেডি করে দিচ্ছি দুঘণ্টায়। তুমি ফিরে যাও।

আমাকে বলল: যদি এই মুহূর্তে তুমি কলকাতায় ফিরে না যাও তাহলে হাইকোর্টের বারে তোমার বিরুদ্ধে ব্যাভিচারের মামলা দায়ের করতে হবে। বেছে নাও কী করবে?

আমার জীবনে আর একটি সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হল। জীবনে একবার ভুল করেছিলাম। দ্বিতীয়বার আর করব না। আর স্ত্রীর দম্ভও উপেক্ষার বস্তু নয়। হাইকোর্টের একটি বড় য়্যাটর্নীর কন্যা তিনি। তাঁর দাদু কলকাতা হাইকোর্টের একজন জাজ। সহজেই তিনি আমার বিরুদ্ধে ব্যাভিচারের মামলা আনতে পারেন। আর, একবার এ-ধরনের কেলেঙ্কারি রটলে আমার বৃদ্ধ, রুগ্ন, বাবার তা সহ্যাতীত হবে; সেই সঙ্গে আমার সুনামও। কাগজে কাগজে হৈ চৈ

করবে, হাইকোর্টের প্রতিটি দেওয়াল সেই নিয়ে মুখরোচক আলোচনা করবে; এবং প্রয়োজন হলে বাবার সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত হব।

ঠিক এই রকম একটি পরিণতি আশা করিনি আমি। আমার ভবিষ্যৎ আমি চোখের সামনেই দেখতে পেলাম।

তাই কিছু একটা করা দরকার, এবং অত্যন্ত তাড়াতাড়ি।

এবার স্তিমিত হয়ে এলেন আনন্দ মহারাজ। তাঁর চোখ দুটি রাত্রি-জাগরণের ক্লান্তিতেই বোধ হয় ঝিমিয়ে এল।

তারপর ?

হোটেলের একটি কক্ষে অধীর প্রতীক্ষায় পায়চারি করছিলাম আমি। যেন কিছু একটা ঘটবে, একটা কিছু ঘটা উচিত। মানুষের জীবনবোধের সত্যিই যদি কোন মূল্য থাকে তাহলে একটা কিছু চরম প্রত্যাশার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে আমাকে। আমি সেই অন্ধকার রাত্রির মসীলিপ্ত রাজপথে দূরান্তের অন্তরাল থেকে একটি অবশ্যম্ভাবী নির্মম অনাগতের নিঃশব্দ পদসঞ্চার শুনতে পেয়েছিলাম।

আনন্দ মহারাজ হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন। কান আর মনকে সজাগ করে দিলেন। যেন সত্যিই কোন পদশব্দ শোনার উত্তেজনায় তিনি আপনার মনের নিভৃত কন্দরে বসে বসে কাঁপছেন।

উত্তেজনাটা ধীরে ধীরে কমে এল।

সেই নির্মম অনাগত এল। গভীর রাত্রে ডলি মারা গেল।

সে কি! কেমন করে ?

ডাক্তারে বলেছিল : পোটাসিয়াম সায়নাইড ছিল ওর জলের ভিতরে।

ছিঃ, ছিঃ! আপনার স্ত্রী শেষ পর্যন্ত·······

আনন্দ মহারাজ একটু হেসে বললেন : স্ত্রী নয়; আমি।

রবীন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেঃ আপনি মিস বেনেটকে মারলেন ?

আমি মারতে চেয়েছিলাম আমার স্ত্রীকে। কিন্তু ভুল করে সায়নাইড-মেশান জলের গ্লাসটা রেখে এসেছিলাম ডলির ঘরে। জীবনের সেই আমার চরমতম আর শেষ ভুল।

দুজনেই চুপ করে গেলেন। রবীন চেয়ে দেখল, আনন্দ মহারাজ ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজিয়েছেন। ওদিকে রাত্রির অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে।

পূর্ব আকাশের শুকতারাটা ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে। রাত্রি শেষ হয়ে এল। আশ্রমে প্রভাতকালীন ভজন সুরু হয়েছে।

আনন্দ মহারাজ এখনও বুঝি সেই হোটেলের কক্ষে বন্দী। সূর্য-ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের রঙ পালটাবে। তাঁকেও তখন আর চেনা যাবে না।

৬

কাজে কোন তাড়া নেই রবীনের। আশ্রমের গতানুগতিকতায় সেও প্রায় গা ঢেলে দিয়েছে। মাঝে-মাঝে যে অকর্মণ্যতা আর আলস্যের কশাঘাতে জর্জরিত হয়ে উত্তেজনা প্রকাশ করে নি, তা নয়; কিন্তু পরক্ষণেই তারাদাস তার পিঠে হাত চাপড়ে হেসে বলেছেন: শনৈঃ শনৈঃ, ডাক্তার। কাদের নিয়ে আপনি দৌড়বেন? এরা সবাই আপনার বেতো ঘোড়া।

কথাটা কিছু মিথ্যা বলেন নি তারাদাস। ব্রহ্মচারির দল থেকে আশেপাশের মানুষগুলি—এদের না রয়েছে শরীরের শক্তি, না রয়েছে মনের সাহস। এখানের সবাই যে রাধাকৃষ্ণের ভক্তিকে মূলধন করে জীবন-তরণী ভাসিয়েছেন তাও নয়; এখানে এসেছেন জীবনের বাকি ক-টা দিন নিরুপদ্রবে কাটিয়ে দিতে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, এঁদের শিরায়-শিরায় গেরুয়ার ঢল নেমেছে, কাছে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে এঁদের ধমনী ঝাঁঝরা করে লাল রক্তের উষ্ণ প্রস্রবণ নিঃশব্দে ঝরে পড়ছে। এত রক্তক্ষরণ যাঁদের, তাঁদের জীবনীশক্তি কতটুকু?

সেদিন আসন্ন সন্ধ্যায় আশ্রমের পথে-পথে ঘুরছিল রবীন। হঠাৎ দেখা নিতাই ব্রহ্মচারির সঙ্গে।

নিতাই ব্রহ্মচারির বয়স চল্লিশের ওপর। গৌরবর্ণ, ঋজু চেহারা। বয়সের অনুপাতে স্বাস্থ্য সত্যিই ভাল। এই তিন মাসের মধ্যে রবীন তার মুখে হাসি ছাড়া অন্য কিছু দেখে নি।

নিতাই ব্রহ্মচারি জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি একা-একা ঘুরে বেড়ান কেন, ডঃ দত্ত? কারও সঙ্গে তো বিশেষ আলাপ করতে দেখি না।

রবীন হেসে জবাব দেয়: মানুষ দেখে-দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, ব্রহ্মচারি।

নিতাই ব্রহ্মচারি রবীনের দিকে চেয়ে এবার একটু হাসলেন: বয়সে আপনি আমার চেয়ে অনেক ছোট। এরই মধ্যে ক্লান্তি এলে চলবে কেন? তা ছাড়া,

মানুষের বৈচিত্র্য আপনার ঐ গাছ-পালার চেয়ে অনেক বেশী। সুতরাং মানুষ দেখে তো ক্লান্ত হওয়ার কথা নয়।

তা ঠিক। গাছ পালাকে বোঝা অনেক সহজ; কিন্তু মানুষ আমার সব ধারনাই কেমন যেন ওলট-পালট খাইয়ে দেয়। পদে-পদে হোঁচট খেতে হয়।

আর সেই এক-একটি হোঁচটই হচ্ছে এক-একটি অভিজ্ঞতা। মানুষের সারাজীবনের সঞ্চয়ের ঘরে এক-একটি অমূল্য সম্পদ।

ব্রহ্মচারির কথায় তারাদাসের প্যাঁচ নেই, পালিশ রয়েছে যথেষ্ট। অতি স্বাভাবিক কথাকে অতি সহজভাবেই বলতে পারেন তিনি। আশ্রমের বহু মানুষের মতই নিতাই ব্রহ্মচারিও তার কাছে একটি প্রহেলিকা; তবু এই জনতার মধ্যে এঁকেই তার কেমন ভাল লাগে বেশী।

এই আশ্রমের খোয়াভরা প্রান্তিক পথটিতে দুজনের মাঝে-মাঝে দেখা হয়। নানা গল্প হয়। তারপর সে যার পথে ফিরে যায়। কেউ কারও কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হয় না।

কথায়-কথায় নিতাই ব্রহ্মচারি বলেন: মানুষ যা করে তাই দিয়ে তার বিচার চলে না, ডাঃ দত্ত। কেন করে, সেইটিই হল তাকে বিচার করার মাপকাঠি।

আপনার কথার গূঢ়ার্থ বুঝলাম না, ব্রহ্মচারি। মোটিভ জিনিষটির দাম স্বীকার না করে পারিনে; কিন্তু মোটিভটাই আসল, একথা মানতে হলে কৃতকর্মের জন্যে মানুষকে দায়ী করা চলে না।

নিতাই ব্রহ্মচারি একটু হেসে বললেন: আপনার কথাকে অস্বীকার করি নে; যেমন অস্বীকার করি নে খাদকে। কিন্তু একথাও তো সত্যি যে খাদ যত বাস্তবই হক, সোনার দাম তার চেয়ে বেশী।

সে কথা সত্যি।

আর একথাও মিথ্যে নয় যে একটা ভাত টিপে যেমন হাঁড়ির ভাতের কথা চোখ বুজিয়ে বলা যায়, তেমনি একটি মানুষের মারফৎ সমস্ত মানুষকে যাচাই করা যায় না।

তুলনার দিক থেকে ভাতের সঙ্গে মানুষের রূপকটা ব্যাকরণ-শুদ্ধি হলেও মানুষকে ঠিক এই পর্যায়ে নামিয়ে আনতে রবীনের কোথায় যেন একটা খটকা লাগে।

চলতে চলতে নিতাই ব্রহ্মচারি একটু হেসে প্রশ্ন করলেন : উপমটা ভালো লাগল না, না ডাক্তার ? আচ্ছা দাঁড়ান।

সামনেই একখানি ঘর। সাদা ধপধপ করছে তার রঙ। দু কুঠরী ; এই রকম পাশাপাশি আট দশ খানি ঘর রয়েছে। এগুলি ঠিক আশ্রমের মধ্যে নয়, আশ্রমের প্রান্তে। কয়েক বছরে জায়গাটির প্রাধান্য বেড়েছে। ধর্মস্থান বলেও বটে, স্বাস্থ্যকর জায়গা বলেও বটে। বাইরে থেকে যাঁরা এসে কিছুদিন থাকতে চান বিশেষ করে তাঁদের জন্যেই এগুলি গড়ে ওঠে। কিন্তু বর্তমানে আশ্রমের মধ্যেই সে-ব্যবস্থা হওয়ায় এগুলিতে কিছু স্থায়ী বাসিন্দা অথচ ব্রহ্মচারি নয়, এমন মানুষদেরই ভাড়া দেওয়া হয়। এঁদের মধ্যে কিছু রয়েছেন পেনসন ভোগী ; আবার কিছু রয়েছেন রোজগারি। আশ্রমের নানা কাজ করে তাঁরা জীবিকা নির্বাহ করেন।

সামনের সেই বাড়ীটিকে লক্ষ্য করে নিতাই ব্রহ্মচারি ডাকলেন : পাকড়াশী দাদা আছেন নাকি ?

কোন সাড়াশব্দ নেই। সামনের দরজাটি বন্ধ। অথচ পাশের জানালা দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে ; ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে শব্দ হচ্ছে ; আর বেশ মিষ্টি গাওয়া ঘি-এর গন্ধ ভেসে আসছে।

নিতাই ব্রহ্মচারি দাওয়ায় এসে কড়া নাড়লেন : কই, পাকড়াশী দা ?

বার দুই তিন ধাক্কা দেওয়ার পর দরজা খুলে গেল ; আর সেই সঙ্গে একটি বিরক্তিকর শব্দ ভেসে এল : কে !!

রবীন দেখল, তার সামনে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। বিরাট চাপদাড়ি ; মাথার চুলগুলির ধপধপে সাদা। চোখ দুটি সেই দাড়ির অরণ্যে আত্মগোপন করে অপরিচিতদের লক্ষ্য করছে। তবে স্বাস্থ্যের ওপর বার্দ্ধক্যের বিশেষ ছাপ নেই। পরনে লুঙ্গি, গায়ে একখানি চাদর। দুটিই গেরুয়ায় ছাপান।

ভদ্রলোক এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে দরজার দুটি পাল্লাই খুলে দিয়ে নিতাই ব্রহ্মচারিকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন : আরে নিতাই ভায়া যে, এস এস। কিন্তু তোমার সঙ্গে........

নিতাই ব্রহ্মচারি বললেন ; আমাদের আশ্রমের নতুন ডাক্তার, আর, দত্ত। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন।

কেন ? হঠাৎ আমার সঙ্গে আলাপ করার দরকার !

চমকে উঠল রবীন। ভদ্রলোক বলেন কী ? স্বরে একটুকু ভদ্রতা নেই ;

বরং একটি বায়স-কর্কশতা তার কানের কাছে ঝনঝন করে উঠল। ব্যাপারটি এতই স্পষ্ট যে নিতাই ব্রহ্মচারি পর্যন্ত প্রথমটায় ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন।

আসুন।

দুজনে ঘরের মধ্যে ঢুকে এল ; সামনের ঘরে একটি টেবিল পাতা। তার ওপরে একটি কেরোশিনের টেবিল ল্যাম্প। টেবিলের চারপাশ ঘিরে চারটি চেয়ার। একটি বই রাখার শেলফ। শয়েক খানেক বই রয়েছে। ইংরিজী বই-ই বেশী, বাংলা আর সংস্কৃতও বাদ যায় নি। দেওয়ালের তাকে চায়ের কাপ, কেতলী, আর কিছু এটা সেটা।

ওপাশ থেকে পোড়া ঘি-এর গন্ধ আসতেই পাকড়াশী বাবু বললেন: আপনারা বসুন ; আসছি এখনই।

পাকড়াশী বাবু ঘরের ভিতরের দরজা দিয়ে অদৃশ্য হতেই নিতাই ব্রহ্মচারি বললেন: কর্মজীবনে ভদ্রলোক ছিলেন একজন কৃতি পুরুষ। ব্রীটিশ সাম্রাজ্যের স্টিল ফ্রেম ; যাঁদের আমরা এককালে বলতাম আই, সি, এস। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় মেদিনীপুর জেলায় ইনি চরম নীতির একজন পরম সার্থক উদ্‌যোক্তা ছিলেন। অমন দুর্দান্ত বাঙ্গালী আই, সি, এস পরাধীন বাংলায় খুব বেশী ছিল না।

রবীন অবাক হয়ে চেয়ে রইল ব্রহ্মচারির দিকে: উনি এখানে জুটলেন কেমন করে? নিশ্চয়ই কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে নয়।

নিতাই ব্রহ্মচারি হেসে বললেন: নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু কেন যে উনি সভ্য জগত ছেড়ে আজ বার বছরের উপর এখানে এসে বাস করছেন তা আমরা জানি নে।

ঘরের মধ্যে দু পা এগিয়েই দুজনে স্তম্ভিত হয়ে গেল। পাশের ঘরে একটি টেবিল পাতা। তার ওপরে একটি রাজসিক আহারের আয়োজন। একটি বড় থালার ওপর অনেকগুলি গরম গরম ফুলকো লুচি। পাশে কয়েকটি বেগুন আর কুঁচো-কুঁচো করে আলু ভাজা। খানচারেক দোহারা চেহারার ফ্রাই। একবাটি মাংস, আর এক পোয়াটাক ক্ষির। নিচে বসে পাকড়াশী বাবু গরম স্টোভটি নিভিয়ে কড়ার ঘি একটি টিনের কৌটোর মধ্যে ঢেলে রাখছেন।

চোখাচোখী হতেই নিতাই ব্রহ্মচারি অপরাধীর মত বললেন: খাবার সময় ব্যাঘাত দিলাম দাদা ; এখন আসি।

হাঁ হাঁ করে উঠলেন পাকড়াশী বাবু: আরে, কর কি, কর কি, ভায়া! তুমি না হয় ঘরের লোক ; কিন্তু ঐ ভদ্রলোক কি মনে করবেন?

রবীন একটু হেসে বললে : এ সময়ে এখানে থাকতে বাধ্য হলেই নিজেকে অভদ্র মনে হবে পাকড়াশীদা। তা ছাড়া, আমার সম্বন্ধে অতটা সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বলায় আমি আগেই যা মনে করার করেছি।

এবার পাকড়াশী বাবু হো হো করে হেসে ফেললেন : তুমি তো ভয়ানক লোক হে ? যাক, এস ; এখন সবাই মিলে কিছু জলযোগ করা যাক।

নিতাই ব্রহ্মচারি হেসে বললেন : এর চেয়ে বড় সেবা সন্ন্যাসীদের কপালে সাধারণত জোটে না। কিন্তু তাহলে আপনার রাত্রির খাবারটি আশ্রম থেকে আনার অনুমতি দিতে হবে আপনাকে।

পাকড়াশী বাবু চোখ দুটি বড়-বড় করে বললেন : তোমরা কি ক্ষেপেছ হ্যা ? এই পঁচাত্তর বছরে আবার রাত্রে খাওয়া ?

রবীনের চোখে বিস্ময় : পঁচাত্তর !! বলেন কি ?

পাকড়াশী বাবু ঘাড় নেড়ে বললেন : তা হবে। এখানেই তো প্রায় বার বছর কাটল। তখন আনন্দধাম তো সুন্দরবন। বাঘ, ভাল্লুক, হায়না, হরিণ আর ডাকাতের রাজ্য। দীননাথ বাবাজী সেইমাত্র এ অঞ্চলে এসেছেন।

প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে জলযোগ পর্ব চলল। তার মধ্যে হাসি-ঠাট্টার শেষ নেই আর। তখন এঁদের দেখলে কেউ কিছুতেই বুঝতে পারত না যে এঁদের প্রত্যেকেরই জীবনে কিছু কিছু সমস্যা রয়েছে ; মনে হত, এ-কটি মানুষ যেন সমস্যাভারাক্রান্ত সংসারের বাইরে উতরোল আনন্দের দমকা হাওয়ায় নিজেদের ভাসিয়ে দিয়েছেন, একটি বৃদ্ধ, একটি প্রৌঢ়, আর একটি যুবক।

শেষ পর্যন্ত রবীনই আলাপের মোড় ঘুরিয়ে দিল : আচ্ছা, পাকড়াশী দা, আপনি অতবড় একজন জাঁদরেল অফিসার ছিলেন ; কিন্তু এ-বয়সে একা-এক এমন জায়গায় পড়ে রয়েছেন কেন ?

চুপ হয়ে গেলেন পাকড়াশী বাবু ; তারপর একটু হেসে বললেন : আরে ভায়া, একাই এ-জগতে এসেছি, যাওয়ার সময়েও সেই একা। সুতরাং একা থাকতে ভয় কি ?

কথাটি গভীর তত্ত্বমূলক সন্দেহ নেই ; কিন্তু কোথায় যেন এর মধ্যে একটা ফাঁক থেকে গেল। তাই তাঁর বক্তব্যের মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের অভাবটা সকলের কাছেই ধরা পড়ল।

নিতাই ব্রহ্মচারিও ছাড়ার পাত্র নন ; তিনি বললেন : তবু বলুন।

তুমি কোনদিন আচার্য হতে পারবে না, নিতাই। ব্যক্তিজীবনের তুচ্ছ

ঘটনাগুলোই হচ্ছে সংসারের সত্যিকার জঞ্জাল। ওতে কাজ নেই। তার চেয়ে একটা ভজন গাও; প্রয়োজন হলে, আসলি ভঁইসা ঘিয়ে আরও ঝুড়িখানেক ফুলকো লুচি ভেজে খাইয়ে দেব।

ভজন আর লুচির কথা পরে ভাবা যাবে। এখন আপনার কথা।

তুমি এ বয়সে সংসার ছেড়ে এসেছ কেন?

সেকথা পরে। আপাতত আপনার কাহিনী।

পাকড়াশী বাবু একটু চুপ করে রইলেন। তারপরে বললেন: নিতান্তই শুনবে?

এবার নিতাই ব্রহ্মচারির সঙ্গে রবীনের ঘাড়ও সমর্থনে দুলে উঠল।

পর পর দুজনের মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন পাকড়াশী বাবু।

তোমার যুবক দোস্তটি সাহিত্যিক নয় তো?

রবীন একটু বেসামাল হয়ে বিস্ফারিত নেত্রে বলল: আ-মি!! কক্ষনো নয়।

তা হলে শোন। কিন্তু মনে রেখ, এ আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার।

একটু চুপ করে থেকে সুরু করলেন পাকডাশী বাবু: অত্যন্ত কম বয়সে আমার স্ত্রী মারা যান। তোমরা বললে হয়ত বিশ্বাস করবে না যে অনেক দিন পরে আমার জুনিয়র চক্রবর্তী যখন লঙ জাম্প দিয়ে আমাকে টপকে ফাইনান্স মেম্বর হয়ে গেলেন তখন যে দুঃখ পেয়েছিলাম সেই দুঃখও আমার স্ত্রীবিয়োগের চেয়ে অনেক কম। আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, হিতৈষীর দল আমার দ্বিতীয়বার বিয়ে দেওয়ার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু পারেন নি। এক বছরের ছেলেটিকে কেন্দ্র করেই আমার জীবনের বাকী দিনগুলো কাটিয়ে দেব স্থির করেছিলাম।

সেই ছেলে বড় হল। পাছে এদেশে তার শিক্ষার অযত্ন হয় সেই ভয়ে তাকে সময়ের অনেক আগে থাকতেই বিলেতে পাঠিয়ে দিলাম। আট বছর সে বিলেতে পড়াশুনা করেছে। তারপর আই, সি, এস হয়ে দেশে ফিরে যেদিন সে প্রথম আমাকে প্রণাম করল সেদিন আমার বুকখানা গর্বে ভরে উঠল। ছেলেকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলাম আমি। আই, সি, এস হয়েছে এই ভেবে নয়; আমি যে আমার স্ত্রীর গচ্ছিত রত্নকে পরম যত্নে রক্ষা করতে পেরেছি এই ভেবে।

ছেলের বিয়ে দিলাম। বেশ অবস্থাপন্ন ঘর থেকেই মেয়ে আনলাম। শিক্ষিতা, সংস্কৃতিসম্পন্ন বনেদী ভদ্রঘরের মেয়ে। রিটায়ার্ড হওয়ার পর সমস্ত

জীবনের প্রায় বার আনা সঞ্চয় দিয়ে বালিগঞ্জে একটা বাড়ী করলাম। পাছে বৌমার মনে কষ্ট হয় এই ভেবে বাড়ীটা দুজনের নামেই দানপত্র করে দিলাম। ছেলে-বৌ তো ঘুরে-ঘুরেই বেড়ায়। ভাবলাম, বাকি দিন ক-টা বালিগঞ্জের বাড়িতেই কাটিয়ে দেব।

ছেলে রোজগার করত ভালই। অথচ প্রায়ই এটা-ওটা করে টাকা চেয়ে পাঠাত। দিতামও। একটা মাত্র ছেলে; আমার যা কিছু সব তো তারই। কিন্তু হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, টাকার তাগাদাটা যেন বেশী ঘন ঘন আসছে। ব্যাঙ্কের হিসাব করতে গিয়ে দেখলাম, এই ভাবে যদি আরও দুটো বছর চলে তাহলে সমস্ত সঞ্চয় শেষ তো হবেই, এমন কি পেনসনের টাকাতেও টান পড়বে। হঠাৎ বিরক্ত হয়ে উঠলাম। লিখেও দিলাম ছেলেকে।

মাস কত চুপচাপ ছিল। তারপরেই তার চিঠি এল। ছেলে লিখেছে, এই বয়সে তোমার একলা থাকাটা আর ভাল নয়; স্বাস্থ্যের দিক থেকেও বটে; মনের দিক থেকেও বটে। আমার এখানেই এস। কোন অসুবিধে হবে না তোমার। আর তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে কলকাতার বাড়ীটা আপাতত ভাড়া দিয়ে দিই।

ভাড়া দেওয়ার জন্যে বাড়ী তৈরি করি নি; তবু ভাবলাম, সেই ভাল। এ সময়ে আর একলা থেকে লাভ নেই। যে-কটা দিন বাঁচি, নাতি-নাতনীদের নিয়েই কাটিয়ে দেব।

সম্মতি জানালাম। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল ছেলের। আমি যেন সাত দিনের মধ্যে চলে আসি। নতুন ভাড়াটে তারা ঠিক করে ফেলেছে।

এতটা তাড়াতাড়ির জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। সেইদিনই সন্দেহ হল, হয়ত অতটা তাড়াতাড়ি বাড়ীটা দানপত্র করা ঠিক হয়নি আমার।

সাতদিনের দিন নতুন ভাড়াটে এল। তার হাতে চাবি দিয়ে আমি ছেলের কাছে হাজির হলাম উড়িষ্যার একটি মফঃসল সহরে।

মাত্র তিনটি মাস। এরই মধ্যে নূতন পরিস্থিতি দেখা দিলে। ছেলের লক্ষ্য আমার পেনসনের ওপর। বৌমার লক্ষ্য আমার স্ত্রীর হাজার দশেক টাকার গহনার ওপর। তিতিবিরক্ত হয়ে উঠলাম। কেন রে বাপু? তোকে মানুষ করলাম, সর্বস্ব দিলাম। বাড়ীটা ছিল, তাও তোরা আত্মসাৎ করলি। তোদের আশা মিটল না। তবু তোরা আমার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলি নে?

কিছুতেই টাকা আদায় করতে না পেরে নাতি-নাতনীগুলোকে লেলিয়ে দিলে আমার পিছনে। টুকরোগুলো কী বিচ্ছু কি বলব ভায়া। চাওয়ার আর বিরাম নেই তাদের।

সেই সময় একবার আমার অসুখ করল। যাকে ধরে আনল সে লোকটা কয়েকটা হোমিওপ্যাথি ওষুধের নাম মুখস্ত করে ডাক্তারি করে। যেমন চেহারা, তেমন মূর্খ। অথচ ছেলে-বৌ তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

ওষুধ খেয়ে নয়, স্বাভাবিকভাবেই অসুখ ছাড়ল। কিন্তু তারপরেই দেখি বাড়ীতে বড় বড় ডাক্তারের আনাগোনা চলেছে। কেন, বুঝতে পারি নি প্রথমটায। কয়েকটা দিন পরেই বুঝলাম। আমাকে পাগল সাজাবার ফন্দী করেছে ওরা। আমার নাকি মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছে।

কানাঘুষা শুনতেই শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। ভাবলাম, আর নয়, এবাব পালাতে হবে। কিন্তু যাব কোথায়? শরীরে জোর নেই, মনে নেই বল। আমার চারপাশে পাহারা বসেছে। এই ভাবে আর কয়েকটা দিন থাকলেই তো সত্যি-সত্যি পাগল হয়ে যাব।

সেই দিনটার কথা মনে রয়েছে আমার। ছেলের বন্ধুবান্ধবরা এসে আমার সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে। নাতি-নাতনীদের মধ্যে আলোচনা চলছে যে আমি পাগল। ডাক্তার এসে আমাকে পরীক্ষা করে যাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত চীৎকার করে উঠলাম আমি ঃ এসব হচ্ছে কী? আমি কি পাগল?

ডাক্তার হেসে বললে ঃ না না ; তা ঠিক নয়, তবে বলা যায় না কিছুই। সাবধান হওয়াই ভাল। এই ঘুমের ওষুধটা খাবেন।

বৌমা কোথা থেকে এক বাটি ঠাণ্ডা বেলের সরবৎ এনে হাজির করলে। ওদের বুড়ী রাঁধুনিটা একজোড়া লোহার বালা এনে বললে ঃ এ-দুটো হাতে পরুন তো বাবা ; তিরল ঠাকুরের দয়ায় কত আকাঠ পাগল ভাল হয়ে গেল।

দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড় হল। ছেলেকে ডেকে কেঁদে বললাম ; তোরা আমাকে শেষ পর্যন্ত পাগল সাজিয়ে দিলি রে?

ছেলে অভয় দিয়ে বললে ঃ কিছু ভয় নেই তোমার, বাবা। রাঁচির মেণ্টাল হসপিটাল খুব ভাল। মাসখানেক থাকলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

সেইদিনই গভীর রাত্রে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। আর ওমুখো হই নি।

একটু থেমে পাকড়াশী বাবু বললেন ঃ এই সতেরটি বছর বাইরে ঘুরছি। একলা রাঁধি, একলা খাই। তোফা আরামেই রয়েছি। ব্যস।

৭

নব বসন্তের আবির্ভাবের সঙ্গে গোটা আশ্রম জুড়ে নেমে এসেছে অবিরল কর্মব্যস্ততা। ঝাড়-পোঁচ আর রঙের পলেস্তারা চলেছে চারপাশে। মিস্ত্রী, মজুর আর মালির কাজ চলেছে দিনরাত।

আশ্রমের বার্ষিক অধিবেশন সুরু হবে এবার। তারই প্রস্তুতি পর্ব চলেছে। অতিথি-অভ্যাগততে ধীরে ধীরে ভরে উঠেছে আশ্রমটি।

ভারতের নানা জায়গা থেকেই যাত্রীরা হাজির হচ্ছেন। কলকাতা থেকে জজ সাহেব হরিহর গাঙ্গুলি, তাঁর মহিষি। ব্যারিস্টার সুবিমল দত্ত ও মিসেস দত্ত। পাটনা থেকে ডাক্তার শ্যাম লাহা। চাটার্ড য়্যাকাউনটেণ্ট বি, বাসু। বম্বে থেকে এসেছেন লোহার ব্যবসায়ী মিঃ শিকদার, গোলমরিচের আড়ৎদার রাধামাধব কারনানি, বিলডিং কনট্রাকটর অরবিন্দ পোদ্দার। এছাড়া এসেছেন অধ্যাপক নিবারন তালুকদার আর তাঁর বিদুষী কন্যা সুকন্যা। অধ্যাপক তালুকদার এসেছেন স্টাডি টুরে। নষ্ট স্বাস্থ্যের সঙ্গে এ অঞ্চলের অধুনালুপ্ত প্রাচীন ইতিহাসের কিছু মাল মশলা উদ্ধার করা যদি সম্ভব হয়, তারই চেষ্টায়। এছাড়া এসেছেন মেডিক্যাল রিপ্রেসেনটেটিভ কাম ইনস্যিয়োরেন্স এজেণ্ট মিঃ ব্যানার্জি। যাঁরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে এঁদের সংখ্যা নগন্য। যাঁরা এখনও আসেন নি, এবং যে কোন মুহূর্তেই এসে পড়তে পারেন তাঁরা সংখ্যাতীত।

সেদিন বিকেলে আগন্তুকেরা আশ্রমটি পরিদর্শন আর পরিভ্রমণ করতে বেরিয়েছিলেন। পথপ্রদর্শক হিসাবে সঙ্গে ছিলেন তারাদাস, এবং কিছু আশ্রমিক আর আশ্রমিকা। আশ্রমের বৈশিষ্ট্য কোথায় আর তার মূল উদ্দেশ্য কী, সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে সেইটিই তারাদাস বিশেষ ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন। বোঝাতে বোঝাতে এক সময় তিনি ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর সঙ্গে আচার্য সদানন্দদেবের তুলনা করে বসলেন। শিবাজী মহারাজের যেমন বাসনা ছিল, তিনি ছিন্ন-ভিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক সূত্রে গেঁথে দেবেন, তেমনি আচার্যদেবের নাকি বাসনা রয়েছে, এই আনন্দধামের মাধ্যমে ধর্ম, এবং কারু ও চারুশিল্পের সম্প্রসারন করে সর্বমানবের কৃষ্টিগত সমন্বয় সাধন করা।

আশ্রমের মূল উদ্দেশ্যটুকু পেশ করে, একটির পর একটি বিভাগ দেখাতে লাগলেন তারাদাস। তাঁতের বিভাগ, সেলাই বিভাগ, নানা রকম নক্সা করার

বিভাগ, প্ল্যাসটিকের খেলনা তৈরি করার বিভাগ, জ্যাম-জেলির কারখানা, চামড়ার ব্যাগ তৈরি করার বিভাগ ইত্যাদি। এসব বিভাগে মহিলা কারিগরই বেশী। পুরুষকর্মী আর শিক্ষানবীশও কম নেই।

তারাদাস উপস্থিত আগন্তুকদের বিহারের এই পার্বত্য অঞ্চলটির জলহাওয়ার উৎকর্ষতা, প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত দেবদেবীর মন্দির, গুহা, গুম্ফা, ইত্যাদির কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করে চলেছেন। তাঁর বিবরণের মধ্যে অনেক কিছু খাদ থাকলেও, তাঁর বক্তব্যের মূল সুরটি অনেককেই উৎসুক করে তুলেছিল।

রবীনও এই দলের সঙ্গেই ঘুরছিল। হঠাৎ এক ফাঁকে সেখান থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল। মাথাটা তার টন টন করছিল, ফাঁকার মধ্যে এসে যেন কিছুটা স্বস্তি পেল সে। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে একটা মহুয়া গাছের তলায় বসে পড়ল রবীন ; কিছুটা পরে হাজির হল সুকন্যা।

হেসে বলল : বাব্বা, যা গোলমাল ! মাথা খারাপ হওয়ার যোগাড় !

সমর্থন করে রবীন : যা বলেছেন। বাবা কোথায় ?

তিনি তারাদাস ব্রহ্মচারির কাছ থেকে এখানকার পুরাতত্ব সংগ্রহ করছেন।

রবীন একটু হাসল : আর আপনি ?

আমি ? আমি এতক্ষণ দিঘীর পাড়ে বসে ঢিল ছুঁড়ছিলাম। জানেন ডঃ দত্ত, কী প্রকাণ্ড দিঘী। আই মিন সিম্প্লী ওয়াণ্ডারফুল।

আর কী পরিষ্কার, ঝরঝরে জল। তাই না, মিস তালুকদার ?

সুকন্যা এগিয়ে এসে বলল : তা বটে। কিন্তু আমার আর এখানে থাকতে ভাল লাগছে না। পালাই পালাই করছে মন।

তা এরই মধ্যে পালাই পালাই করলে চলবে কেন ? দাঁড়িয়ে রইলেন যে ? বসুন না।

সুকন্যা একবার চারপাশে চেয়ে দেখল, একটু ইতস্তত করল ; তারপর বসল রবীনের পাশে।

আপনিও বুঝি বেড়াতে এসেছেন ?

না। চাকরি করি এখনে।

ওঃ, হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই বটে। ভুলেই গেছলাম একেবারে। তা, আপনার ডাক্তারখানায় ভাল ঘুমের ওষুধ পাওয়া যায় ?

একটু আশ্চর্য হল রবীন ; প্রশ্ন করল : রাত্রে আপনার ঘুম হয় না ?

আমার !! মাই গড। বাবা তো আমার নাম দিয়েছেন কুম্ভকর্ণ। আর সমীরণ বলে········

সমীরণ কে ?

সুকন্যা এবার রবীনের দিকে চেয়ে রইল। খানিকটা অবিশ্বাস দলা পাকিয়ে উঠেছে তার চোখের তারায়। সে চোখ নামিয়ে বলল ঃ বাবা আপনাকে বলে নি ? ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিসের মিঃ বাসুর ছেলে। কাবুলে থাকতে আমাদের সঙ্গে আলাপ। আমরা এনগেজড।

ওঃ ! তাই বুঝি ?

যাক গে, ওসব কথা। আপনি আমার বাবাকে যেন তাতাবেন না দয়া করে।

অর্থাৎ ?

ঐ যে আপনাদের কোথায় যেন কী সব পুরাতত্ত্ব, না, মৃততত্ত্ব রয়েছে ঐ সব পাহাড়ের গুহায়। যদি থাকেই, বেচারীদের নির্বিঘ্নে ঘুমোতে দিন। তাদের নিয়ে টানাহেঁচড়া করে লাভ নেই, ডঃ দত্ত। মরার চেয়ে জ্যান্ত মানুষ অনেক ভাল।

কথাটা আপনার বাবাকে বোঝাতে পারেন না ?

সুকন্যার স্বরে এবার ক্লান্তি আর অবসাদ ঃ চেষ্টা তো করি। কিন্তু বোঝে কে ?

আপনার বাবা কি সদানন্দদেবের শিষ্য ?

সুকন্যার স্বরে উত্তেজনা ঃ কক্ষণ না। ধর্মটর্ম উনি মানেন না।

ওঃ।

বাবার ধারনা সব ধর্মই বাজে, আর সব বাবাজীই ধাপ্পাবাজ।

উনি বুঝি নাস্তিক ?

উনি ফ্রি থিংকার। এসেছেন স্টাডিটুরে ; ধর্মচর্চা করতে নয়। কিন্তু আপনি ডাক্তারি পাশ করে কলকাতা ছেড়ে এই পাহাড়ে এসেছেন কেন ? প্র্যাকটিস করতে ?

পাহাড় আমার ভাল লাগে বলে।

সুকন্যা বিস্ফারিত নয়নে বলে ঃ ভাল লাগে ? আমার যা বিশ্রী লাগে কি বলব ?

কিন্তু রবীনের কাছ থেকে কোন উত্তর আসার আগেই হঠাৎ সচেতন হয়ে

উঠল সুকন্যা। সে সোজা হয়ে উঠে অন্ধকারের মধ্যে কী যেন দেখতে লাগল। দূরে একটি মানুষের দ্রুত পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

গাছের নিচেটায় অনেকখানি জুড়ে অন্ধকার জমাট বেঁধে এসেছে। কিন্তু দূরের অন্ধকার তখনও কিছুটা ফিকে। এখানে বসে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ঐ দূরের মানুষটিকে। কিছু দূরে এসে মানুষটি থমকে দাঁড়াল, তারপর চারপাশে চেয়ে গলা ছেড়ে ডাকল : সুকু, সুকু!

সুকন্যা তড়িৎগতিতে রবীনকে ঠেলা দিয়ে বলল : ঐ গাছের পিছনে লুকিয়ে পড়ুন তাড়াতাড়ি।

এই অতর্কিত আক্রমনে রবীনও হকচকিয়ে উঠে দাঁড়াল; বলল : কেন?

সুকন্যা তাকে আর একটা ঠেলা দিয়ে বলল : বাবা! যান, প্লিস, যা-ন।

কোন কিছু বুঝতে পারার আগেই রবীন গাছের পিছনে অদৃশ্য হল। চারপাশে চেয়ে দেখল একবার। কাছাকাছি লুকোবার কোন জায়গা নেই। ওদিকে মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের মত মিঃ তালুকদার মস্-মস্ করে ঝরাপাতার ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছেন। আর চিন্তার অবসর নেই। সে একবার মহুয়াগাছের দিকে চেয়ে দেখল; তারপর সটান উঠে পড়ল তারই একটা ডালের ওপর।

গাছের নিচে সুকন্যার গলার স্বর শোনা গেল : বাবা ডাকছ?

ব্যস। সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে মিঃ তালুকদারের তর্জন শোনা গেল। তিনি দ্রুত এগিয়ে এলেন।

তোমার আজকের ব্যবহারে আমি মর্মাহত, সুকু। প্রথমত, তুমি আমাদের তথ্যপূর্ণ আলোচনা শোন নি। দ্বিতীয়ত, এই অন্ধকারে একজন অজ্ঞাত-কুলশীল যুবকের সঙ্গে গল্পে এতই মশগুল হয়েছ যে এই শীতেও কম্ফটার নেবার সময় পাওনি। তোমার আজকের ক্রিয়াকলাপ মোস্ট ডিস্‌য়্যাপয়েনটিং, ইফ নট স্ক্যান্‌ডালাস। সমীরণ শুনলে কী বলবে জানি নে।

আমার মাথা ধরেছিল তো কী করব?

মাথা যদি ধরেই ছিল তাহলে তার জন্যে ওষুধ খেলে পারতে। আর ফাঁকাতে আসারই যদি ইচ্ছে ছিল তাহলে অজ্ঞাতকুলশীল একটি যুবকের সঙ্গে গল্প না করে..................

কক্ষণ নয়।

মিঃ তালুকদারের স্বরে এবার অবিশ্বাস আর সন্দেহের দোলা : মানে?

কারও সঙ্গে আমি গল্প করি নি। বিশ্বাস না হয় দেখ। একটা আস্ত লোক তো আর কর্পূরের মত উবে যেতে পারে না।

মিঃ তালুকদারের হয়ত ঠিক বিশ্বাস হল না কথাটা। তিনি এদিক-ওদিকে সন্দিগ্ধভাবে চেয়ে টর্চ জ্বাললেন। না; আশেপাশের কোথাও কেউ নেই। মহুয়াগাছের দক্ষিণ দিকে কেয়া গাছের ঝাড়গুলি বিরাট একটি রসিকতায় ঘাড় দোলাচ্ছে কেবল।

এবার মিঃ তালুকদারের স্বরে একটু লজ্জার ভাব ঃ তবে যে ওরা বললে.......

সুকন্যা খিল খিল করে হেসে ওঠে এবার ঃ ওরা ঐ রকমই বলে। যাগ গে। কিন্তু তুমি এ কী করেছ? গায়ে গরম কোট চাপাও নি। এক্ষুনি ঠাণ্ডা লাগবে যে। চল, চল।

এত রকম হাত ধরেই টেনে নিয়ে গেল মিঃ তালুকদারকে।

৮

এতক্ষণ কেমন যেন একটা আড়স্ট হয়ে বসেছিল রবীন। আকস্মিকতার প্রবল ধাকায় কার্য-কারণের পটভূমিকাটিকে বিশেষ ভাবে পর্যালোচনা করার পূর্বেই সে গাছের ডালে উঠেছিল। কিন্তু প্রাথমিক উত্তেজনা কাটার পরেই সে নিজের অবস্থাটা একবার অনুমান করার চেষ্টা করল। তার সারা গা আর মাথার ওপর অজস্র ক্ষুদে ক্ষুদে প্রাণী কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের নিরুপদ্রব জীবনযাত্রার ওপর অকস্মাৎ এই অহেতুক আর বর্বর আক্রমনকে হয়ত তারা ঠিক বরদাস্ত করে উঠতে পারে নি। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না কিছুই। গেলে, হয়ত বুঝতে পারত যে নিজেও সে বেশ একটি কুৎসিৎ ভঙ্গীতে বসে রয়েছে। দুটি হাত দিয়ে শাখামৃগের ব্যর্থ অনুকরণের চেষ্টায় একটা ডাল ধরে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে কোন রকমে পতনের হাত থেকে আত্মরক্ষা করেছে মাত্র। নিজের এই অবিমৃষ্যকারিতায় একেবারে লজ্জায় মরে গেল সে।

ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পনে নেমে এল রবীন। অতি সন্তর্পনে, পাছে কেউ দেখে ফেলে। হাজার হক, সে এখানকার ডাক্তার। তার একটা আভিজাত্য রয়েছে।

নেমে এসে হাত পা জামা কাপড় যতটা সম্ভব ভাল করে ঝেড়ে নিল। কিন্তু তার আগেই কয়েকটি পিঁপড়ে তার চামড়ার ওপর যথেষ্ট ঝাল মিটিয়ে নিয়েছে।

ভীষন রাগ হল রবীনের। অপসৃয়মান মিঃ তালুকদার আর তাঁর কন্যাটির

দিকে চেয়ে চোখ দুটো তার জ্বলতে লাগল। ইচ্ছে হল, এখনই দৌড়ে গিয়ে আচ্ছা করে কয়েকটা কড়া কথা শুনিয়ে দিয়ে আসে ওঁদের।

কিছুটা এগিয়েও গেল। তারপরেই মত পরিবর্তন করল।

পিছন দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলে রবীন।

পায়ে পায়ে এগোতে এগোতে দিঘীর পাড়ে একটি স্তম্ভ দেখে থেমে গেল রবীন। একটি চতুষ্কোন বেদির ওপর পাথরের এই প্রাচীন মূর্তিটি দাঁড়িয়ে। অনেক দিনের পুরানো মূর্তি, কিছুই চেনা যায় না। কেবল বোঝা যায়, এক সময়ে এই মূর্তিটি জীবন্ত ছিল। নাম-না-জানা কোন রাজা বাদশা, নিদেনপক্ষে কোন প্রতিপত্তিশালীর তো বটেই। দিনের বেলায় অনেকবার দেখেছে, তবু আর একবার টর্চ ফেলল তার ওপর। পা থেকে মাথা পর্যন্ত। বহু দিনের অনাদরের ধুলো জমে রয়েছে তার বুকের পাঁজরে-পাঁজরে, দেহের খাঁজে-খাঁজে। অনেক বৃষ্টির জল, আর আগুনের স্রোত ওর বুকের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে। একটা হাত ভাঙা। প্রশস্ত বুকের ঠিক মাঝখানটিতে চিড় খেয়েছে। মাথায়, গালে, কাঁধে, বুকে পাখিদের অজস্র বিষ্ঠার দাগ। সবই গিয়েছে, কেবল চোখ দুটি ছাড়া। ও-দুটি বড় তীক্ষ্ণ। বড় সতেজ। এত রোদ, জল, ঝড়, শীত, গ্রীষ্মের কশাঘাত নীরবে সহ্য করেও এই সীমাহীন অন্ধকারকে নিতান্ত অবজ্ঞাভরেই চেয়ে দেখছে যেন।

টর্চের আলো নিবিয়ে দিয়ে অনেক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল রবীন। তারপর ধীরে ধীরে বেদির ওপর বসে পড়ল। মূর্তিটি কার তা সে জানে না। কেউ বলে মুসলমানের, কেউ বলে হিন্দুর। কেউ বা ওর সঙ্গে সিপাহীযুদ্ধের কিছুটা আখ্যান জুড়ে দেয়। নাম জেনে এখন আর লাভ নেই কারুর। মূর্তিটি যে ঐতিহাসিক কোন বীরের সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না তার।

ইতিহাস তার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে এইখানে, এই অল্পপরিসর মূর্তিটির শিরায় শিরায়। সেই স্বাক্ষর হয়ত একদিন হাজার হাজার মানুষের তাজা রক্তে লেখা ছিল; আজ তার শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত মহাকাল নিঃশেষে পান করে নিয়েছে।

ধীরে ধীরে, অত্যন্ত ধীরে সেই মহাকালের মধ্যে সাড়া জাগল। মনে হল, সেই আকাশজোড়া অন্ধকারের সমুদ্রে উজান কাটিয়ে ইতিহাসের দীর্ঘপথের একেবারে ও-প্রান্তে যেন একটি সূক্ষ্ম চিন্তার মত কোন অস্ফুট ধ্বনির সৃষ্টি হয়েছে। গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল রবীন—হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল।

সে যেন শুনতে পাচ্ছিল, একটি নয়, অনেক অনেকগুলি অশ্বখুরের প্রতিধ্বনি। বহুদূরের বহু বন্ধুর পথ অতিক্রম করে তারা যেন বিদ্যুতের গতিতে এগিয়ে আসছে। মিরাট, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, ঝাঁসি, আরা। ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, জর্জরিত, ক্ষতবিক্ষত, ছিন্নবাস কয়েকশ অশ্বারোহী। তাদের সেই শুকনো চোখে-মুখে একটি দারুণ উত্তেজনা, মনের মনিকোঠায় অকুণ্ঠ সাহস, আর ভবিষ্যতের দুরাশার স্বপ্নে মাতোয়ারা তাদের হৃদয়-স্পন্দন।

রবীনের মনে হল সেই অশ্বখুরধ্বনি হঠাৎ এই মূর্তিটির কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। এক সঙ্গে ঝঙ্কৃত হল অসংখ্য তরোয়ালের ঝনঝনা। গর্জে উঠল এক সঙ্গে আল্লাহ্ আকবর, আর ব্যোম ব্যোম মহাদেও। সেই গর্জন বায়ুতরঙ্গে মিশে দিগদিগন্তে প্রতিধ্বনি তুলে হারিয়ে গেল তারায় তারায়।

চমকে উঠল রবীন। বহুদূর অতীতের একটি তীক্ষ্ণ শিহরণ বাঁকা তরোয়ালের মত তার চেখের সামনে ঝলসে উঠল।

ওরা কে রবীন তা জানে না। হয়ত ওরা একদল দেশপ্রেমিক। দেশকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসত। আর সেইজন্তেই মৃত্যুকে ভয় পায় নি ওরা। ভয় পেয়েছিল বনিকের মানদণ্ডকে। বিজাতীয় দাসত্বের শৃঙ্খলকে। দীর্ঘ দিন আর রাত্রির চেতনায় তাদের জড়িয়ে রেখেছিল স্বাধীনতাব স্বপ্ন, দেশের মাটি, জল, আর হাওয়ার ওপর দেশের মানুষের অবিসংবাদিত অধিকার।

হয়ত ওরা কিছুই বাঁচাতে পারে নি। না নিজেদের, না দেশের। তবু ওরা লড়েছে ; তবু ওরা বুকের তাজা রক্ত মাটিতে ঢেলে দিতে এতটুকু দ্বিধা, এতটুকু কার্পন্য করে নি।

কিন্তু আজ ওরা কোথায় ? ওদের রক্ত আজ মাটিতে ধুয়ে মুছে লোপাট হয়ে গিয়েছে। ওদের আত্মত্যাগের কাহিনী আজ পাহাড়ের অনাবিষ্কৃত ভূগোলের পাতায়, আর চিড়ধরা, দুমড়ে-পড়া, অসংস্কৃত প্রাচীরস্তম্ভের ফাটলে-ফাটলে।

ধীরে ধীরে কখন যে অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে রবীন তা বুঝতে পারে নি। আকাশের কোথাও হয়ত চাঁদ উঠেছে। কিন্তু এখানে বসে তাকে দেখা যাচ্ছে না। কেবল দিকচক্রবালের পারে শাদায় কালোতে মেশান ধূসর রঙের মেঘগুলি এধার-ওধার ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর সেই ঝাপসা আলোতে পাহাড়ের চূড়াগুলি তার দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে রয়েছে। সদ্যোজাত শিশুর মত অন্ধকার ভেদ করে বর্তমান জেগে উঠল যেন।

ঝরাপাতার উপর দিয়ে কারা যেন এগিয়ে আসছে। হঠাৎ চমক ভাঙল

রবীনের। একটা শেয়াল তার দিকে সন্দিগ্ধভাবে চেয়ে ছুটে পালাল। সেই তন্দ্রাভাঙা চেতনায় চেয়ে দেখল রবীন। একটা আবছাওয়াতে ছেয়ে গিয়েছে চারপাশ। দিঘীর জল, মাঠের চেহারা, গাছের অস্তিত্ব, স্ট্যাচুর ইতিহাস, আর সে নিজে, সব মিলিয়ে-মিশিয়ে একাকার। কাউকেই ঠিক স্পষ্ট করে চেনা যাচ্ছে না আর।

হঠাৎ কার চাপা কণ্ঠস্বর কানে এল : রবীন বাবু? ডঃ দত্ত?

সঙ্গে সঙ্গে একটা টর্চ জ্বলে উঠল।

আপনার আক্কেলকে বলিহারি। এই অন্ধকারে ভূতের রাজ্যে চুপটি করে বসে রয়েছেন? আর আমি গোটা আশ্রম খুঁজে বেড়াচ্ছি।

বলতে বলতে এগিয়ে এল শীলা। চুপ করে বসেছিল রবীন। কোন উত্তর দিল না।

শীলা আরও এগিয়ে এল, একেবারে বেদির কাছে। বলল : বেয়াড়া হওয়ারও একটা সীমা রয়েছে। দেখছি, আপনি তাও ছাড়িয়ে গেছেন। করছেন কী এখানে?

দেখছি।

দেখছেন? কী দেখছেন—এই অন্ধকারে?

জগতে এত জিনিষ থাকতে শ্রীকান্তের চোখে হঠাৎ অন্ধকারের রূপটা ধরা পড়ল কেমন করে?

শীলার স্বরে বিস্ময় : ওমা, শ্রীকান্তের ভূত মাথায় চেপেছে বুঝি? কিন্তু শ্রীকান্তের পক্ষে যা সম্ভব ছিল সেটি যে আপনার পক্ষেও সম্ভব হবে এরকম অদ্ভুত ধারণা আপনার কেমন করে হল? সবাই কি সব কাজ পারে, না, পারা উচিত?

রবীন বলল : সে প্রশ্নের উত্তর আপাতত আমি দিতে পারব না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে আপনাদের আশ্রমের বিদগ্ধ আলোচনার চেয়ে এই অন্ধকারের ভাষা বোঝা আমার পক্ষে অনেক বেশী সহজ।

শীলার স্বরে আতংকের আভাষ : রক্ষে করুন। কিছু অঘটন ঘটলে আমাদের আর লজ্জার সীমা থাকবে না। দয়া করে উঠুন, না হলে আবার তারাদাস ব্রহ্মচারিকে ডাকতে হবে।

দুটি হাত জোড় করে রবীন বলল : দোহাই আপনার। বর্তমানে আমি অন্ধকারের মোহে মাতোয়ারা। এখন আর আপনাদের ঐ সভ্যজগতের নিয়ন-

লাইট এনে ছন্দপতন ঘটাবেন না। তার চেয়ে বরং আমার পাশে এসে একটু বসুন।

কবিত্ব করার সময় নেই আমার।

রবীনের স্বরে তন্ময়তা: আপনি একে কবিত্ব বলছেন? কিন্তু আমি বলছি, এই সত্য। আর সব মিথ্যা। বিশ্বাস না হয়, একবার আমার চোখ দিয়ে চারপাশে চেয়ে দেখুন, আমার মন দিয়ে অনুভব করুন। ঠকবেন না।

শীলা এবার হেসে ফেলে: আর আপনি একবার আমার চোখ দিয়ে দেখুন, আমার মন দিয়ে অনুভব করুন কিচেনের অবস্থাটা। একেবারে অভিভূত হয়ে পড়বেন। দুপুরে ছিলেন পঞ্চাশজন গেষ্ট, এখন প্রায় একশ'র কাছাকাছি। আমরা তো সারা হওয়ার যোগাড়। এখন কি আপনার পাশে বসে অন্ধকারের অভিনব রূপ দেখার সময় আছে আমাদের? না, না, রবীন বাবু, ওসব জিনিষ কেতাবে পড়তেই ভাল লাগে। আসলে ও-টি ভয়ানক। তা ছাড়া, আমাদের জীবনে অনেক অন্ধকার নেমে এসেছে। অন্ধকারের কথা দয়া করে আর আমাকে বলবেন না। অন্ধকার দেখলেই আমি আঁৎকে উঠি।

এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলি কথা বলে শীলা চুপ করল। কিন্তু নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের দ্রুত উত্থান-পতন তখনও শোনা যাচ্ছিল যেন।

রবীন বলল: বিলাস জিনিষটা চিরকালই মানুষকে কষ্ট দিয়ে এসেছে। সে ভোগের বিলাসই হক, আর কল্পনার বিলাসই হক। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আজকের এই মোহ আমার চিন্তার রাজ্যে একটি বিপর্যয় ঘটিয়েছে। যদিও ক্ষণিক, তবুও এই বিশেষ মুহূর্তে একে অস্বীকার করার মত ক্ষমতা আমার নেই। আমার কাছে অতীত আজ মৃত; বর্তমানও মুছে গিয়েছে: কেবল এক ভবিষ্যৎ ঐ দূরের পাহাড়ের স্তিলোটের মত অন্ধকারের সমুদ্র পেরিয়ে আমার সামনে এগিয়ে আসছে। আমি ওকে ছেড়ে যাই কেমন করে?

শীলা একেবারে রবীনের কাছে এসে তার জামার কলারে একটা মৃদু টান দিয়ে বলল: আসুন। আর দেরি নয়।

রবীন বিনা বাধায় উঠে পড়ে বলল: চলুন। অন্ধকার ছেড়ে আপনাদের আলোর রাজত্বেই ফিরে যাওয়া যাক। তাহলেই খুশী তো?

তাহলেই আমি কৃতার্থ।

৯

অতিথিভবনের কাছাকাছি এসে রবীন দেখল সমস্ত জায়গাটা লোকে গিজগিজ করছে। অজস্র মানুষের কোলাহল। হিমালয়ের পাদদেশ থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত প্রায় সব দেশ থেকেই অতিথিবর্গ-এসে হাজির হয়েছেন। নূতন নূতন মুখ, নূতন ভাষা, নানা রঙের পরিচ্ছদ। যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধা; কিছু কাটপিস বালখিল্যের দলও যে নেই তা নয়। ধুতি-চাদর, সার্ট-সর্ট, কোট-প্যাণ্ট। বাঙালী, ম্যাড্রাসী, উড়িয়া, বম্বে-ওয়ালা, আর মাড়োয়ার অধিবাসী। জন দুই য়্যামেরিকান ছোকরাও জুটেছে কোথা থেকে। তারা এই রাত্রিবেলা বিপুল উদ্দীপনায় ফ্ল্যাস বাল্ব নিয়ে এনতার ছবি তুলে বেড়াচ্ছে।

গলবস্ত্র হয়ে তারাদাস ব্রহ্মচারি সমবেত সুধীজনকে আশ্রমের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন : আমাদের আশ্রমে আপনাদের যে পায়ের ধুলো পড়েছে এতেই আমরা কৃতার্থ। আমাদের শক্তি আর সামর্থ্য অল্প, আয়োজন তার চেয়েও কম। পাছে আপনাদের সেবায় কোন ত্রুটী হয় সেই ভয়েই আমরা সঙ্কুচিত।

সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে মিঃ ব্যানার্জিকে দেখা গেল। তিনি বললেন : ও কিছু নয়। এসেছি গুরু দর্শনে। সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তাই করি নে আমরা। আর যদি একটু অসুবিধা হয়ই সে আমরা ম্যানেজ করে নেব। এতো আমাদের নিজেদেরই কাজ।

তারাদাস একটু হেসে উত্তর দিলেন : খাঁটি কথা, মিঃ ব্যানার্জি। তা হলে এবার অনুমতি করুন, আমি আপনাদের সেবার আয়োজন করি।

একেবারে হাঁ হাঁ করে উঠলেন মিঃ ব্যানার্জি : ক্ষুদ্র সাংসারিক জীব আমরা। সেবার কথা বলে আমাদের আর পাপের মাত্রা বাড়াচ্ছেন কেন, ব্রহ্মচারি ?

রবীন লক্ষ্য করল, দুজনেই সমান বিনয়ী। কে যে কখন কাকে টেক্কা দিয়ে বেরিয়ে যাবে সেই ভয়ে দুজনেই সন্ত্রস্ত।

ওদিক থেকে সরে এল রবীন। সুকন্যা বসে রয়েছে ডাঃ তালুকদারের পাশে। সুকন্যাকে এখন আর চেনা যাচ্ছে না। এই ফাগুনের শেষেও সে একটি লম্বা ওভারকোট চাপিয়েছে। গলায় গরম মাফলারের ফেট্টি। প্রচণ্ড হট্টগোলের মধ্যেও সে বেশ একাগ্রতার সঙ্গে সোয়েটার বুনে চলেছে। রবীনের

সঙ্গে তার একবার মাত্র চোখোচোখী হল। ব্যস, ঐ পর্যন্তই। সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিলে সে।

অতিথিভবনের সীমানা ছাড়িয়ে হাসপাতালের দিকে ঘুরে গেল রবীন। এখন হাসপাতালে কোন কাজ নেই তার। সমস্ত দিনেও বেশী কাজ থাকে না এখন। রোগী আজকাল যে কিছু আসে না, তা নয়, কিন্তু ওষুধ নেই, চিকিৎসার সাজ-সরঞ্জাম নেই। রবীন চেষ্টা করেও বিশেষ কিছু সুবিধা করতে পারে নি।

অনেকবারই তারাদাসকে সে এসব বিষয়ে বলেছে। তারাদাসও শান্তভাবে তার কথা শুনেছেন। রবীনের মতের সঙ্গে তাঁরও যে কোন বিরোধ নেই একথাটাও তাকে বহুবার বলেছেন। রবীনের সদিচ্ছাকে তিনিও পরিপূর্ণ ভাবে সমর্থন করেন। তবুও তিনি কিছুই করতে পারছেন না।

রবীন জিজ্ঞাসা করেছে : কেন ?

তারাদাস হেসে বলেছেন : অর্থ। অর্থের বড় অভাব আমাদের।

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছে রবীন : সে কি ?

ঠিক কথাই বলছি, ডঃ দত্ত। আপনার মত শিক্ষিত একজন ডাক্তারকেই বা ক-টা টাকা দিচ্ছি ? কিছু নয়। আমাদের দৈন্যে আমরাই মর্মাহত।

রবীন একটু হেসে বলেছিল : কিন্তু আমাকে যে ক-টা টাকাই দিন, সেই ক-টা টাকাই তো নষ্ট হচ্ছে, ব্রহ্মচারি।

কেন কেন ?

ডাক্তারের যদি কাজ না থাকে, যদি প্রতিদিনই তাকে রোগীর সঙ্গে ধাপ্পা দিতে হয়, যাকে সে বাঁচাতে পারত, তাকে যদি নিতান্ত অসহায়ভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে হয়, তাহলে কি বলব না যে মাসে-মাসে এই আড়াইশ টাকাটাই জলে যাচ্ছে আপনাদের ?

তারাদাস ব্রহ্মচারী একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন : কিছু মনে করবেন না, ডঃ দত্ত, ঠিক আপনার মত একজন আদর্শবাদী মানুষই আমরা খুঁজেছিলাম— যিনি যত বড় ডাক্তার, মানুষ হিসাবে তার চেয়েও মহৎ। এবং এ কথা স্বীকার করতেও আমরা দ্বিধা করব না যে আপনাকে পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কী জানেন ? আমাদের এ-টি আশ্রম। হাসপাতাল নয়। হাসপাতাল হচ্ছে এর একটি অঙ্গ। আশ্রমের ট্রাষ্টিবোর্ড মনে করেন, আশ্রমের সামগ্রিক উন্নতিবিধান করাই তাঁদের কাজ।

তারপর ?

অবশ্য হাসপাতালেরও উন্নতি চাই। আপনি বোধ হয় জানেন, শীঘ্রই আনুষ্ঠানিক ভাবে হাসপাতালের মেটারনিটি ওয়ার্ডের উদ্বোধন হবে। সেই উদ্বোধনে বহু মান্যগণ্য ব্যক্তি আসবেন, এবং তারই জন্যে একমাত্র হাসপাতালের খাতেই বিশ হাজার টাকা খরচ হবে।

বিশ হাজার ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তা ছাড়া রয়েছে হাতের কাছে উৎসবের খরচ। সেও প্রায় হাজার চল্লিশেক। তার ওপর হাসপাতালের বাড়ী তৈরি হয়েছে এক লাখ টাকা দিয়ে। এখনও ডাক্তারের কোয়ার্টার, নার্সদের কোয়ার্টার তৈরি হয় নি। সেও কম করে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজারের কম নয়। ঠিক এখনই আপনার হিসাব মত ওষুধ আর, ল্যাবরেটারীর জিনিষপত্র আনতে গেলে কমপক্ষে দুলাখ টাকার দরকার। অত টাকা এখনই দেওয়ার মত অবস্থা আমাদের নেই। আর একটু অপেক্ষা করতেই হবে আপনাকে।

এর পরে আর বলারই বা কী রয়েছে ? চুপ করে থাকে রবীন।

তারাদাস সান্ত্বনা দিয়ে বলেন: ক্ষুণ্ণ হবেন না, ডঃ দত্ত। আপনার পরিকল্পনা যে মহৎ সে বিষয়ে আমাদের তিলমাত্র সন্দেহ নেই। এবং আপনার এস্টিমেটও আচার্যদেব অনুমোদন করে ট্রাস্টিবোর্ডের কাছে পাঠিয়েছেন। আশা করি দু এক মাসের মধ্যেই তাঁদের একটা কিছু করতে হবে।

রবীন বলে : কিন্তু এই যে মেলা বসছে সে সম্বন্ধে কী করছেন ?

তারাদাস বললেন : নিশ্চয়, নিশ্চয়। এ-কদিন আপনাদের একটু সাবধানে থাকতেই হবে। অবশ্য আশা করা যায়, সরকারের পক্ষ থেকেও কিছু সাহায্য আসবে। তবে আমাদের লক্ষ্য হবে অতিথিদের ওপর সবার আগে, এবং তার জন্যে ইমারজেন্সি ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

ঐ পর্যন্তই। সেও আজ প্রায় মাস খানেকের কথা। অবশ্য, তার মধ্যে যে কাজ চলিয়ে নেওয়ার মত কিছু ওষুধ-পত্র আসে নি তা নয়। এসেছে, এবং আশা করা যায় আরও কিছু এসে পড়বে। তবে তাদের মধ্যেও বেশী দামি ওষুধ বিশেষ ক্ষেত্র আর বিশেষ সময় ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না। এই বিশেষ ক্ষেত্র আর বিশেষ সময়টি সে কী, আর কখন দেখা দিবে, তা রবীনেরও জানার কথা নয়। সব সময়েই তারাদাসের মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকতে হয় তাকে। ডাক্তার হয়ে ডাক্তার-নয় এমন একজনের হাতের মুঠোর মধ্যে থাকার তিক্ততা যে কী তা এরই মধ্যে রবীন হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পেরেছে।

মাঝে-মাঝে সে বিদ্রোহও যে করে না তা নয়। কিন্তু তারাদাস সে-বিদ্রোহকে দমন করার এতটুকু চেষ্টা তো করেনই না, বরং তাকে পূর্ণ সহানুভূতি দেখিয়ে নিজের অসহায় অবস্থার কথা বিনীতভাবে জানিয়ে দেন। ফলে, আবার আলস্যের মধ্যে ফিরে আসে রবীন।

রবীনের মাঝে মাঝে মনে পড়ে ভিয়েনার একটি সার্জেনের কথা। ষাট বছরের ওপর বয়স। দীর্ঘ চেহারার ওপর তীক্ষ্ণ চোখ, আর নাসিকার স্ফুরণ মানুষের মনে একটি শ্রদ্ধার আবেশ মাখিয়ে দেয়। তিনি এসেছিলেন এদেশে কিছুদিন ব্রেন সার্জারির মূল তথ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে। বক্তৃতা তিনি দেন নি ; দিয়েছিলেন প্র্যাকটিক্যাল ডিমন্‌স্ট্রেশন। সকাল আটটার সময় তিনি হাসপাতালে ঢুকতেন। কোন কোন দিন বেলা তিনটে চারটে পর্যন্ত অপারেশন করতেন। তাদের চোখের সামনে তিনি একটির পর একটি মাথা ফাটিয়ে ষ্টীচ করে দিতেন। তারা বিপুল আতংকে চেয়ে থাকত মানুষটির আঙুলগুলির দিকে। কী তড়িৎ গতিতে তারা কাজ করে চলেছে! কী অভ্যস্ত, অনায়াস-স্বচ্ছন্দ তাদের গতি ; যেন প্রতিটি নাড়ি, শিরা-উপশিরা, গলি-ঘুঁজি তাহাদের মুখস্ত। তাদের সঙ্গে এতটুকু জোচ্চুরি চলবে না। আর কী আত্মবিশ্বাস। রবীন তো একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ত।

আর সেই সময় তারা কি করেছে? সার্জেনের সঙ্গে ঘুরেছে, আর হাততালি দিয়েছে। কিন্তু তিনি মাঝে-মাঝে ওদের দিকে চেয়ে একটু হাসতেন। কিছু বলতেন না ; হাজার হ'ক, ভারত স্বাধীন দেশ। সে-দেশের ডাক্তাররা যদি শ্রেফ হাততালি আর পাবলিসিটি দিয়েই রোগ সারাতে পারেন তাতে বিদেশীর বলার কিছু থাকতে পারে না।

সমস্ত শরীর জুড়েই একটা ক্লান্তির অবসাদ নেমে এসেছিল. তার। কেবল দেহ নয়, মনটাও তার আজ বড ক্লান্ত। যেন সে অনেক পরিশ্রম করেছে, এখনও অনেক পথ হাঁটতে হবে তাকে, অনেক বন্ধুর পথ।

দু চারবার এদিক-ওদিক করে রবীন শেষ পর্যন্ত নিজের ঘরটির মধ্যে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিল।

কতক্ষণ সে যে অমনিভাবে শুয়েছিল জানি নে ; হঠাৎ একটা লঘু পায়ের শব্দ তার কানে এল। শীলা এসে দাঁড়িয়েছে তার বিছানার পাশে।

কি ব্যাপার? শুয়ে যে?

দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে বলে।

কিন্তু ওদিকে কিচেন যে ফাঁকা হয়ে গেল।

রবীনের স্বরে নিরাশক্তি : যাক গে।

একটু চুপ করে থেকে শীলা জিজ্ঞাসা করল : মন খারাপ হয়েছে বুঝি ?

হ্যাঁ।

আর একটু চুপ।

ঐ গাছটার উপর যে লাল পিঁপড়ের বাসা ছিল তা জানতেন না ?

রবীন মুখ ঘুরিয়ে চেয়ে দেখল শীলার দিকে। সেখানে একটি নির্বিকার, নিটোল গাম্ভীর্য। রবীনের চোখের ওপর আলো পড়েছিল। তা না হলে সে দেখতে পেত যে শীলার চোখের ভিতর একটা চাপা কৌতুক মনের আনন্দে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ চটে উঠল রবীন : কী করে জানব ? ও-গাছে কি আর কখনও চড়েছি ?

শীলার স্বরে গভীর সহানুভূতি : তা বটে। তবে গাছে চড়ার আগে উপর দিকে একটু চেয়ে দেখলেও তো পারতেন। আমরা তো তাই দেখি। বড্ড কামড়েছে বুঝি ?

আবার ঐ গাছে চড়ার প্রসঙ্গ! যে-জিনিষটা সে বারবার ভুলতে চায়, সেই জিনিষটাই বারবার তার মনে প'ড়ে বিরাট একটি লজ্জার জ্বলন্ত কটাহে তাকে দগ্ধ করে মারছে। হঠাৎ কী করে যে কী হয়ে গেল তা সে নিজেই বুঝতে পারে নি। অপরকে কৈফিয়ৎ দেবে কেমন করে ?

তাই শীলার এই ব্যঙ্গে সে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠল : আপনার কি ধারনা আমি ইচ্ছে করে গাছে উঠেছি ? না, মিঃ তালুকদারকে আমি ভয় করি ? না, আমি কিছু অন্যায় করেছি ?

এ তো প্রশ্ন নয়, প্রশ্নের উত্তরও নয়। কেবল কথার কথা। তাই হয়ত শীলার কাছ থেকে কোন প্রতিবাদ এল না!

রবীন একটা ঢোক গিলে বলল : আর মিস তালুকদারেরই বা অমন কাপুরুষ সাজার প্রয়োজনটা কী ছিল ? আমার সঙ্গে না হয় গল্পই করেছিলেন ; তাতে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় নি।

শীলা সায় দেয় : ঠিক কথা।

কিছুটা সাহস আর সেই সঙ্গে উৎসাহ পায় রবীন : আর বিশ্বাস করুন, একমাত্র তাঁকে শেভ করতেই গাছে উঠতে বাধ্য হয়েছিলাম আমি।

সে তো বটেই।

অথচ এতটুকু কৃতজ্ঞতাবোধ নেই ভদ্রমহিলার। বাপ ডাকতেই কেমন সুড় সুড় করে চলে গেলেন! প্যাণ্ডেলে দেখা হল। চোখ নামিয়ে নিলেন। যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানেন না। অথচ নাকি বিদেশের কালচার্ড সোসাইটিতে মানুষ, স্ত্রী-স্বাধীনতার ধারক আর বাহক এই মহিলা!

শীলার কাছ থেকে সমর্থনে কোন জবাব না পেয়ে অনুপস্থিত সুকন্যার ওপরেই কিছুটা ঝাল ঝেড়ে নিল রবীন ঃ স্ক্যানডালাস্!

গম্ভীরভাবে বলল শীলা ঃ পিতৃভক্ত মেয়ে কি না।

আবার উত্তেজিত হল রবীন ঃ পিতৃভক্তি? একে আপনি সৎ গুন বলেন? ব্যক্তিস্বাধীনতার কাছে পিতৃভক্তি?

সবাই তো আর আপনার মত আধুনিক নয়, ডঃ দত্ত, স্বাধীনও নয়। বাবার পয়সার উপরেই তার বিলাসব্যসন চলেছে; স্বামীর পয়সার উপর নির্ভর করছে তার ভবিষ্যৎ। সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে গেলে ওঁদের অগ্রাহ্য করা চলে না। আর পয়সা যাদের খরচ করতে হয়, এই আনুগত্যটুকুও তাদের অবশ্য প্রাপ্য। আমাদের কথাই ধরুন না। আমরা তো এখানে চাকরি করি। কিন্তু এই আশ্রমের কর্তৃপক্ষ যা পছন্দ করেন না তা কি আমরা করতে পারি?

অর্থাৎ?

অর্থাৎ বর্তমান অবস্থায় আমার এখানে থাকার কথা নয়। এর জন্যে আশ্রমের কর্তৃপক্ষ আমার কাছে কৈফিয়ৎ দাবি করতে পারেন। কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক না হলে আমার চাকরি যাওয়ার ভয় রয়েছে। সমাজই বলুন আর সংসারই বলুন, প্রত্যেকেরই একটি নীতি রয়েছে; আর মানুষকে তা মানতেও হয়।

আপনি এখানে চাকরি করেন বুঝি?

শীলা একটু হেসে বলে ঃ আপনার কি ধারনা আমরা এখানে এমনি থাই?

না, তা কেন?

তবে বুঝি আমরা বৈষ্ণবী? বৈষ্ণবী-প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে সংসারধর্ম পরিত্যাগ করেছি?

না, না; তাই বা কেন?

তা হলে!

রবীন ধীরে ধীরে বলে : আপনাদের কথা ঠিক এমনভাবে চিন্তা করি নি এত দিন।

এবার হেসে ফেলে শীলা : তাহলে এবার দয়া করে একটু করুন। নিন, উঠে পড়ুন দেখি, খেতে যান।

১০

বেলা তখন দশটার কাছাকাছি; প্যাণ্ডেলে লোক গিজগিজ করছে।

একটা জায়গায় জনকতক লোক চেয়ার ঘুরিয়ে মুখোমুখী বসে জটলা করছে। জটলা করছে বলার চেয়ে বক্তৃতা শুনছে বলাই ভাল। কারন, এখানে কথা বলছেন একজন। আমাদের পূর্বপরিচিত মিঃ ব্যানার্জি। রবীনের মনে হল, এই বিশাল মহাভারতের প্রতি লোমকূপের সঙ্গে তাঁর নিগূঢ় ঘনিষ্ঠতা রয়েছে।

তাঁর পাশে মিঃ তালুকদার। বেশ ভারি একটি ওভারকোট গায়ে দিয়ে, গলায় মোটা একটি কম্ফটার জড়িয়ে, মাথার ওপর গরম টুপি চাপিয়ে বসে রয়েছেন। তাঁর পাশে সুকন্যা। তার গায়েও শাল জড়ানো। বসে বসে একটি ইংরাজি পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছে।

রবীনকে দেখেই একটু হেসে মিঃ ব্যানার্জি বললেন : হ্যালো, ডঃ দত্ত; সুপ্রভাত। এই স্বাস্থ্যরক্ষার মোটা কয়েকটা কথাই মিঃ তালুকদারকে বলছিলাম। স্বাস্থ্যরক্ষার সবচেয়ে বড় কথা হল ভোরে ওঠা। ভোরে উঠে যদি মাইল আসটেক ঘুরে আসতে পারেন তা হলেই এদেশের ডাক্তাররা বেকার হয়ে যাবেন।

মিঃ তালুকদার একটু বিব্রত বোধ করে বললেন : আমার তো যাওয়ারই ইচ্ছে ছিল; কিন্তু ঐ সুকুর জন্যেই। বেচারীর যা ডেলিকেট হেলথ, হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে বিপদে না পড়ে।

সুকন্যা একটু নরম প্রতিবাদ করে : দেখছেন, মিঃ ব্যানার্জি, কবে একবার আমার টনশিল হয়েছিল, সেই ছোট্টবেলায়। সেই থেকে বাবার ধারণা আমার ঠাণ্ডা লাগবেই।

মিঃ তালুকদারও এবার হেসে বললেন : ধারণা নয়, কনভিকশন। তোমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমার মত পরিবর্তন করার কোন সুযোগ আসেনি এখনও।

মিঃ ব্যানার্জি সমর্থন করলেন মিঃ তালুকদারকে : ঠিক কথা। ছেলে-মেয়েরা সব সময়েই বাবা-মাদের রাইট অফ করে দেয়। কিন্তু আসল কথাটা

কী জানেন, মিস তালুকদার ? আপনার বাবার যে দূরদৃষ্টি রয়েছে তা অনেকেরই নেই। আপনার বাবা সত্যিকারের মানুষ করে তুলতে চাচ্ছেন আপনাকে।

মিঃ তালুকদার বললেন : সেই জন্যেই তো ওকে নিয়ে বেরিয়েছি। কেবল বই পড়ে পড়ে চোখদুটোকে নষ্ট করে লাভ কী ? ভগবান যে চোখ দিয়েছেন সে কি লাইব্রেরীর অন্ধকারে বসে অপচয় করার জন্যে ?

মিঃ ব্যানার্জি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন : হোয়াটস লাইক এ ফাদার। আপনার কথা শুনে কী যে আনন্দ পেলাম তা আর আপনাকে কি বলব, মিঃ তালুকদার ? হোয়াটস এ রিয়েল এডুকেশন। আর তার জন্যে যে জায়গায় উপস্থিত হয়েছেন তার তুল্য জায়গা তামাম ভারতে আর নেই। ঐ যে দূরে পাহাড় দেখছেন, ও-গুলি নির্জীব নয়, ও-গুলি ভারতের ইতিহাসের সজীব কাহিনী। ওদের গুহায়-গুহায় কত তীর্থঙ্করের পাকদণ্ডী রয়েছে, কত রাজারাজড়ার অশ্বখুরধ্বনির ক্লান্ত প্রতিধ্বনি আজও শুনতে পাওয়া যায়।

মিঃ তালুকদারের চোখে মুখে উত্তেজনা : বলেন কী ?

মিঃ ব্যানার্জির মুখে সবজান্তার হাসি : আর কী বলব, মিঃ তালুকদার ? দুঃখের কথা, ভারতের কোন ইতিহাস নেই। থাকলে, আমাদের এই দুর্দশা হত না।

মিঃ তালুকদার বললেন : আমাকে, মোশায়, বিদেশীই বলতে পারেন। এ দেশের ঐতিহ্য সম্বন্ধে কিছুই প্রায় জানা নেই আমার। জানেন নাকি কিছু ?

জানি নে আবার ? এখানকার নাড়ি-নক্ষত্র আমার পকেটে।

বলুন না কিছু।

মিঃ ব্যানার্জি একটু জাঁকিয়ে বসে বললেন : শুনুন তবে। এই যে জায়গায় আমরা বসে রয়েছি সেটি হচ্ছে মহাভারতের বহু প্রাচীন কাহিনীর লীলাক্ষেত্র ; ঘটনা এবং দুর্ঘটনা। পুরাণের দেবতা আর অসুরের মল্লভূমি। দ্বাপরের বীর যোদ্ধা জরাসন্ধের কীর্তি ; আজ সে-সব অবশ্য জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। যাঁর ভয়ে তখনকার দিনের অত বড বীর আর কূটবিদ্যায় মহাচার্য শ্রীকৃষ্ণকেও মগধের রাজত্ব পরিত্যাগ করে পশ্চিম ভারতের সমুদ্রমেখলা দ্বারকাবতীতে পালাতে হয়েছিল ; যাঁর হুংকারের দাপটে হস্তিনাপুরের রাজারাও রাত্রে নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমোতে পারতেন না। এখন আর অবশ্য কিছু নেই। সিংহগড়ের সিংহ গিয়েছে, পড়ে আছে শুধু গড়। তাও ভেঙেচুরে একাকার। শেয়াল, কুকুর, নেকড়ে আর হায়েনার রাজত্ব।

তারপর এলেন বিন্দুসার। মগধের রাজা বিন্দুসার। যাঁর রাজত্বে তথাগত বুদ্ধের অহিংসার বাণী প্রথম মূর্তিমতী হয়ে দেখা দিলে। এই বিন্দুসারেরই দানব পুত্র অজাতশত্রু প্রচার করলেন যে দেবতা, দ্বিজ, আর রাজা ছাড় পৃথিবীতে পূজা করার আর কিছু নেই। অতএব অহিংসাকে হত্যা করে হিংসার উল্লাসে পৃথিবী ভরিয়ে দাও।

তারপর, আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ বীর কুনোয়ার সিংহ। আশী বছরের বৃদ্ধ কুনোয়ার। বুক ফুলিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে মরণপণ করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেশের স্বাধীনতার জন্যে। বৃদ্ধ সুপ্ত সিংহের গর্জনে জগদীশপুরের মানুষ তো ছার, মাটি-পাথর পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল, কেঁপে উঠেছিল আরা আর উত্তরপূর্ব বিহার। আর তাঁরই হাজার-হাজার অনুচর বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিল ঐ সব পাহাড়ের ফাটলে-ফাটলে। তারপর কত বছরের বিরতি।

মিঃ তালুকদার মুগ্ধ, বাক্যহীন। কেবল মিঃ তালুকদারই বা কেন? রবীনও। সেই সঙ্গে উপস্থিত শ্রোতারাও।

রবীন প্রশ্ন করল: আচ্ছা মিঃ ব্যানার্জি, ঐ যে আশ্রমের পাশে বিরাট দিঘী—ওটি কবেকার জানেন?

জানি নে আবার? খুব জানি। এই দিঘীর কিছু ইতিহাস রয়েছে। ইতিহাস না বলে প্রবাদ বলাই ভাল। কারণ, এদেশের পুরাণ-ই যে কেবল পুরানো তা নয়, ইতিহাসও পুরানো, ইতিহাসও প্রবাদ। কোন্‌টা জানতে চান বলুন।

দুটোই।

পুরানের কথাটা তবে আগেই বলে নি।

মিঃ ব্যানার্জি একটু চুপ করলেন; একটা সিগারেট ধরালেন। শ্রোতাদের দিকে খোলা সিগারেটের টিনটা একবার ঘুরিযে নিলেন। তারপর সুরু করলেন: অসুররাজ বৃত্রের দাপটে দেবতারা তটস্থ। অসুরসৈন্য স্বর্গ আক্রমন করেছে। ইন্দ্র রাজ্যভ্রষ্ট। পাটরাণী শচীদেবী বন্দিনী। দেবতাদের মধ্যে যে যেখানে পারলেন চোঁ চাঁ দৌড় দিলেন। যাঁরা পারলেন না তাঁরা আটক পড়লেন। বৃত্রাসুর হুকুম দিলেন, সব দ-রো-জা বন্ধ করো।

ঝপাঝপ করে সব দরজাই প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। খোলা রইল মাত্র একটা; কড়া পাহারা বসল তার পাশে।

স্বর্গ অকুপেশন করল অসুরেরা। মিলিটারি অকুপেশনের জ্বালা অনেক। একালে বুঝেছিল ফ্রান্স; আর সেকালে প্রায় বুঝতে হত দেবতাদের। স্বর্গের রাজপথ দিয়ে দানবসৈন্যেরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াত। দেবতাদের দেখলেই চাবুক নিয়ে দৌড়ে যেত। স্বর্গরাজ্যে হাহাকার পড়ে গেল। দেবতাদের সে এক দুর্দিন।

একমাত্র দেবরাজ ইন্দ্রই কোন রকমে ছিটকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন স্বর্গ থেকে। সঙ্গে পুত্র জয়ন্ত। কিছুদিন গোপন বেশ ধরে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ালেন। আর কেউ স্বর্গ থেকে বেরিয়ে আসছে কিনা লক্ষ্য করলেন। না, কেউ আসতে পারছে না। মাঝে-মাঝে এক একবার স্বর্গের এখানে-ওখানে ভয়ার্ত স্বর্গবাসীদের কান্নার রোল উঠছে। তারপর আবার সব চুপচাপ।

কয়েকটা দিন অপেক্ষা করার পর মর্ত্যে নেমে এলেন সপুত্র ইন্দ্র। মর্ত্যলোকের রাজারা চিরকালই দেবতাদের বিপদে-আপদে সাহায্য করে এসেছেন। এবারেও সেই আর্জি নিয়ে দেবরাজ ঘুরে বেড়ালেন মর্ত্যের রাজ দরবারে। কিন্তু কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন না। তখন আর্যাবর্তে অসুরদেরই প্রাধান্য। অ-অসুর রাজারাও দেবতাদের বয়কট করেছেন।

ইন্দ্রের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন। রাজা নেই, রাজ অমাত্য নেই, সৈন্য নেই, অর্থ নেই, অস্ত্র নেই। চড়ে বেড়াবার বাহনগুলি পর্যন্ত দানবদের পিঠে নিয়ে বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুতরাং আর্যাবর্ত ছেড়ে দাক্ষিণাত্যের দিকে হাঁটা দিলেন।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ফকিরের বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দেবরাজ। অনেক সাবধানে, অতি সন্তর্পণে চলাফিরা করতে হচ্ছে তাঁদের। বৃত্রাসুরের চর চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুস্থ অথবা অসুস্থ ইন্দ্রকে চাই।

হাঁটতে-হাঁটতে একটি জায়গায় হাজির হলেন তাঁরা। চারপাশে পাহাড়; শাল, পিয়াল, দেওদার, আর বনপলাশের মর্মর ধ্বনিতে একটি সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়েছে। গাছে গাছে অফুরন্ত ফল আর ফুলের ছড়াছড়ি। বন্য শূকর, হরিণ, আর বন্য কুক্কুটে একেবারে বোঝাই জায়গাটি। আর সেই সঙ্গে রয়েছে শত শত গুহা।

একটি আরামের নিঃশ্বাস ফেললেন ইন্দ্রদেব। শত্রুর দৃষ্টি বাঁচিয়ে কিছুদিন একটু বিশ্রাম নেওয়া যাবে।

একদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ একটি অলৌকিক দৃশ্য নজরে পড়ল দেবরাজের।

একটু দূরে পাহাড়ের গায়ে ভীষণ আগুন জ্বলছে। সেই আগুনের ঝলকা এসে পড়ছে চারপাশে। অথচ পাশাপাশি একটি গাছেরও পাতা ঝলসাচ্ছে না। বন্য শূকরেরা তার মধ্যে নির্বিবাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বৃক্ষচূড়ায় পাখিদের আর্তনাদ নেই।

ব্যাপারটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার জন্যেই ইন্দ্রদেব বেরিয়ে এলেন। জ্বলছে সবই ; আলোতে উদ্‌ভাসিত হয়েছে চারদিক। অথচ এ আগুনের দাহিকা শক্তি নেই। এমন পরমাশ্চর্য ঘটনা কেউ কোথাও দেখেছে ?

ইন্দ্র চিনতে পারলেন অগ্নিদেবকে। বললেন ঃ এ কী দুর্ঘটনা বৈশ্বানর ? আপনার শক্তি নষ্ট হল কেমন করে ?

বৈশ্বানর বললেন ঃ যেদিন থেকে দেবতারা ভোগের কালি মেখেছে নিজেদের মুখে। কিন্তু আপনার এ অবস্থা কেন দেবরাজ ?

দেবরাজ স্বর্গরাজ্যের দুর্দিনের কথা আনুপূর্বিক বর্ণনা করলেন।

বৈশ্বানর একটু হেসে বললেন ঃ আপনি যেদিন থেকে আমাকে স্বর্গরাজ্য থেকে নির্বাসিত করেছেন সেইদিন থেকেই দেবতারা ক্লিব হয়ে পড়েছে।

লজ্জায় আর মনস্তাপে মাথা নিচু করলেন দেবরাজ। বললেন ঃ নির্বাসন-দণ্ড আমি তুলে নিলাম, বৈশ্বানর। আবার আপনি দেবলোকে ফিরে যান।

কিন্তু আপনি মুক্তি দিলেই তো মুক্তি হল না আমার। আমি আজ বন্দী।

কে আপনাকে বন্দী করেছে ?

মানুষ।

মানুষ !!

ভ্রূকুটি করলেন দেবরাজ ঃ মানুষ আপনাকে বন্দী করেছে ?

বৈশ্বানর একটু হেসে বললেন ঃ মানুষের অসাধ্য কিছু নেই, দেবরাজ। এরা আত্মজ্ঞানে বিশ্বাসী। যারা অগ্নির দাহিকা শক্তি নষ্ট করতে পারে, তারা যে একদিন ব্রহ্মাণ্ডের উপর আধিপত্য বিস্তার করার যোগ্যতা রাখে, সে কথা বিশ্বাস করার মত সুযোগ আমার হয়েছে। বিশ্বাস না হয় নিজের চোখেই তা দেখবেন আসুন।

ইন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে বৈশ্বানর পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন। ইন্দ্র দেখলেন, অনতিদূরে জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের আকারে দুটি চোখ জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। আর কিছু নেই।

বৈশ্বানর বললেন ঃ এঁর নাম দধীচি। বুদ্ধি আর আত্মজ্ঞানের উৎকর্ষতায়

এঁর দেহের স্থূলতা হ্রাস পেয়েছে। ইনি মানুষকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দেওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেছেন। আপনি এই ঋষিকে প্রণাম করুণ।

দেবরাজ যথেষ্ট কুপিত হলেন, কারন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করার একচেটিয়া অধিকার দেবতাদের। তাকে হস্তান্তরিত করার চেষ্টা করে যে সে দেবতাদের শত্রু ছাড়া আর কিছু নয়।

বললেন: দেবরাজ কোনদিন মানুষের কাছে মাথা নোয়ায় না, বৈশ্বানর। স্বর্গ থেকে বিচ্যুত হয়ে আপনার দেবত্ব লোপ পেয়েছে।

এবারেও একটু হাসলেন বৈশ্বানর; বললেন: দধীচি দেবরাজের চেয়েও বলশালী। যিনি মনুষ্যজাতির জন্য বিশ্বের সমস্ত অগ্নিকে নিজের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করেছেন তিনি অসামান্য। ঐ দেখুন।

হঠাৎ দেবরাজ লক্ষ্য করলেন, সমস্ত বনভূমি অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছে; আর সমস্ত আলো কেন্দ্রীভূত হয়েছে দুটি চোখের তারায়। সেই দুটি তারার ভিতর থেকে দুটি তীব্র জ্যোতি একদৃষ্টে দেবরাজের দিকে চেয়ে রয়েছে মাত্র।

প্রশ্ন হল: কে তুমি?

সেই স্বরে আকাশ বাতাস কম্পিত হ'ল: কম্পিত হলেন দেবরাজ। মনে হল যেন সহস্র পাশুপত অস্ত্র একসঙ্গে গর্জন করে উঠেছে।

আমি রাজ্যভ্রষ্ট দেবরাজ ইন্দ্র।

রাজ্য নেই, অথচ রাজা তুমি?

দেবরাজ এইবার কিছুটা সাহস সংগ্রহ করে বললেন: বর্তমানে রাজ্যভ্রষ্ট, সন্দেহ নেই; কিন্তু শতক্রতু আমি। দেবরাজ্যে আমার অধিকার শাশ্বত।

এবং অমৃতেও তোমার অধিকার অবিসংবাদিত, কেমন?

হ্যাঁ।

তুমি দস্যু, দেবরাজ। সমুদ্রমন্থনে যে অমৃত উঠেছিল তার সমস্তটুকু তুমি নিঃশেষে অপহরণ করেছ। সেই পাপেই তুমি আজ হৃতসর্বস্ব। তোমার আত্মজ্ঞান হয় নি, ইন্দ্র।

কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানে আমি সিদ্ধিলাভ করেছি।

একটি অপার ব্যঙ্গের থির বিজুরী ঋষির মুখের ওপর প্রতিভাত হ'ল। তিনি ইন্দ্রের ঔদ্ধত্যকে নস্যাৎ করে বললেন: যার আত্মজ্ঞান নেই, তার ব্রহ্মজ্ঞানও নেই। আত্মজ্ঞান না জন্মালে কোনদিনই তুমি হৃতরাজ্য পুনুরুদ্ধার করতে পারবে না।

হঠাৎ বনভূমি নিদারুণ কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন হ'ল। আকাশে গুরু গুরু মেঘের গর্জন শোনা গেল। পাহাড় টলতে লাগল। মনে হল বিরাট ভূমিকম্পে পৃথিবী বিধ্বস্ত হবে, আকাশ লুটিয়ে পড়বে মাটিতে।

বৈশ্বানর দেবরাজের কানে কানে কী যেন বললেন।

দেবরাজের কণ্ঠ শোনা গেল : মহাত্মন্।

বল।

আমাকে দানব বধ করার অস্ত্র দিন।

আগে আত্মজ্ঞান। তারপর অস্ত্র। দুর্বল আর নির্বোধের হাতে অস্ত্র সমাজের বিঘ্নস্বরূপ, দেবরাজ।

তাহলে আমাকে আত্মজ্ঞান দান করুন।

কৃচ্ছ্র সাধনাই আত্মজ্ঞান লাভের সোপান। তুমি প্রস্তুত ?

হঁ্যা, মহাত্মন।

তাহলে ষাট হাজার বছর আত্মানুশীলন কর ব্রহ্মচারির বেশে। তারপর তোমার অস্ত্রলাভ হবে।

ষাট হাজার বছর কৃচ্ছ্র সাধনা করলেন দেবরাজ। সেই কটা বছরে অনেক চোখের জল ঝরেছিল তাঁর। অহমিকার যে তুষার স্তূপ যুগ যুগ ধরে তাঁর মধ্যে জমেছিল, কৃচ্ছ্রতার তাপে তা গলতে সুরু হল। তবেই না আত্মশুদ্ধি। সেই চোখের জলেই এই দিঘী।

একটানা এতক্ষণ বকে মিঃ ব্যানার্জি চুপ করে গেলেন। অতিথিদের দ্বিতীয়বার চা পরিবেশন হচ্ছে। মিঃ ব্যানার্জি এক কাপ ধূমায়িত চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, এবার ইতিহাসের প্রবাদ শুনুন।

মিঃ তালুকদার বাধা দিয়ে বললেন, ইতিহাসকে প্রবাদ বলছেন কেন ?

মিঃ ব্যানার্জি বললেন, ঐ হল, মিঃ তালুকদার, ঐ হল। এদেশে ইতিহাস আর প্রবাদের মধ্যে কোন ফারাক নেই। কিছু বিকৃতি, কিছু প্রবাদ, এই নিয়েই এদেশের ইতিহাস। ডঃ দত্ত, কী বলেন ?

আপনার সঙ্গে আমি একমত।

পাটনার কালেকটর তখন টেইলর সাহেব। আসলি সাহেবকা বাচ্চা। কোন রকম ফক্কিবাজিকে তিনি বরদাস্ত করতেন না। এদেশের নীগারদের সঙ্গে মেলামেশা তো দূরস্থান, তাদের ছায়া দেখলেও তিনি মাটিতে ঘোড়ার মত বুটের ঠোক্কর মারতেন।

মাত্র নাম ; টেইলর সাহেবের নাম শুনেই অনেক বাঘা ওল চিনির পানা হয়ে যেত, এদেশের লোকেরা ঘুমের ঘোরে আঁৎকে উঠত। সব দেশের মত এদেশেও নানান ধরনের ঘুম-পাড়ানি গানের মহরৎ হত ; তাদের মধ্যে সব চেয়ে কর্মক্ষম আর জাঁদরেল ছড়াটির বিষয়বস্তু আপনারা নিশ্চয়ই সবাই জানেন ঃ

খোকা ঘুমাল, পাড়া জুড়াল, বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে॥

ভয় দেখিয়ে শিশুদের ঘুম পাডানোর রেওয়াজ এক এদেশ ছাড়া তামাম বিশ্বে বোধ হয় আর কোথাও দেখতে পাবেন না আপনারা। বিহার-বাংলার এই অঞ্চলেও টেইলর সাহেবের নামে ছডা কেটে খোকাখুকুদের ঘুম পাড়ানো হত। এসব ছডা কোন পুঁথিপত্র অথবা দলিলে নেই। নেই আমাদের ইতিহাসের অল্পপরিসর জায়গায়। এসব রয়েছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, এ-অঞ্চলের দেহাতিদের মুখে-মুখে, চলনে-বলনে। তাদের অনেকে জানেও না, কোথা থেকে এসব গানের উৎপত্তি। বংশপরম্পরায় যা তারা শুনে আসছে তাই সেঝে-ঢেলে ওরা গেয়ে চলেছে ঃ—

টাট্টু ঘোডা আসছে ছুটে টেইলর নিয়ে কাঁধে,
এক হাতে তার মদের বোতল, চাবুক আর এক হাতে।
ডাকাবুকা এল রে ঐ, লাগল বিষম ধোঁকা,
এই বেলা তুই ঘুমিয়ে পড, ওরে আমার খোকা।

ভুলে যাবেন না, এমন চোস্ত, ছন্দ মিলানো বাংলা ১৮৫৭ সালে এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছিল না। কিন্তু ভয় ছিল, ছিল দুর্ভাবনা, আর ছিল অত্যাচারীর বুট আর শ্যামচাঁদের গুঁতোর নিচে অসহায় মানুষের মর্মন্তুদ আর্তনাদ।

ইতিহাসে লিখেছে, বাবু কুনোয়ার সিং-এর বন্ধু ছিল টেইলর সাহেব। কথাটি সর্বৈব মিথ্যা। আপনারা জানেন, মিথ্যা ঋনের দায়ে কুনোয়ার সিং-এর জমিদারি কোম্পানীর হেপাজতে চলে যায়। হেপাজতের চেয়ে হেঁপা বলাই ভাল। নীলবাঁদর আর কোম্পানীর চেলাদের লক্ষ্যই ছিল দেশেব সমস্ত রস শুষে কেবল ছোপডগুলো ছড়িয়ে দেওয়া।

বিষফোঁড়ার ওপর গোদ দেখা দিলে। পর পর দুবছর খরা। ড্যালহৌসীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তখন চাষীদের গলায় ফাঁস হয়ে পড়েছে। ধান নেই, চাষ নেই ; চাষ যেটুকু রয়েছে তা ঐ নীলের। সেখানে নাক গলাবার উপায় নেই কারও।

ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের কাছাকাছি। সবাই দৌড়োল কুনোয়ার সিংএর কাছে।

কুনোয়ার সিং ভাবলেন। রাজা তিনি, অথচ রাজ্য নেই তাঁর। প্রজাদের রক্ষা করার ক্ষমতা তাঁর নেই, অথচ তাদের দায়-দায়িত্ব, আক্ষেপ-অভিযোগ সব পড়ছে তাঁর মাথার ওপর। প্রজারা কোম্পানীকে চেনে না, চেনে তাঁকে।

বললেন : সবুর কর। দেখছি।

টেইলর সাহেবের কাছে আর্জি গেল, পিটিশন গেল। নিজে গেলেন কুনোয়ার সিং।

আবেদন জানালেন : খাজনা মুকুব কর। জনসাধারণের জন্য সেচের ব্যবস্থা কর, নীল চাষ তুলে দাও।

কিন্তু কে কার কড়ি ধারে? টেইলর সাহেব অটুট। মরদ কা বাৎ। এক চুল এদিক-ওদিক হওয়ার উপায় নেই। আর তা ছাড়া, কোম্পানী কোন বেআইনী কাজ করেন নি। কর্জ করলে তা শোধ করতেই হবে। তুমি পারলে না বলেই তো আমরা এগিয়ে এসেছি। যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর?

কুনোয়ার সিং বলে পাঠালেন : ভাল কাজই করেছ। কিন্তু রাজস্ব যখন নিচ্ছ তখন ওদের দিকটাও একটু দেখ। সোনার হাঁসকে তোয়াজ না করলে ডিম দেবে কেন?

টেইলর সাহেব বললেন : হাঁস বাঁচবে, কি মরবে, তা দেখা আমার এক্তিয়ারের বাইরে। কোম্পানীকে ডিম জোগান দেওয়াই আমার কাজ।

কুনোয়ার সিং সকলকে ডেকে বললেন : বাপু হে, নিজেদের না বাঁচাতে পারলে কেউ তোমাদের বাঁচতে পারবে না। অতএব কাজে এগোও। আমি তোমাদের সামনে রয়েছি।

দুটি দিনের মধ্যে বিশ হাজার লোক পুকুর কেটে ফেলল। পাহাড় থেকে চারটি ঝর্ণার প্রবল স্রোতকে ঘুরিয়ে দিল সেই দিঘীর মুখে। একটি সপ্তাহে দিঘী টৈটম্বুর। কোম্পানীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কুনোয়ার সিং-এর সেই প্রথম সংগ্রাম। এই বিশ হাজার মেয়েপুরুষই তাঁর পরবর্তী অভিযানের প্রথম সেনাবাহিনী।

মিঃ ব্যানার্জি থামলেন। চারপাশে চেয়ে দেখলেন একবার। তাঁর চারপাশ ভিড় করে জমায়েৎ হয়েছে শ্রোতাদের দল।

মিঃ তালুকদারই কথা বললেন প্রথম : আপনার ঐ শেষের মন্তব্যের প্রতিবাদ করি আমি। এ অঞ্চলের দুর্ভাগ্যের জন্য টেইলর সাহেব দায়ী ছিলেন

না। দায়ী ছিলেন কুনোয়ার সিংএর মত ক্ষুদে শোষক শ্রেণীর জমিদার। আর সিপাহীবিদ্রোহ গণবিদ্রোহ নয়; সেই যুদ্ধে জিততে পারলেও এদেশের মানুষের কোন লাভ হত না।

মিঃ ব্যানার্জি কিছু বলার আগেই রবীন বলল: আপনার মতবাদ মানতে রাজি নয় আমি।

মিঃ তালুকদার উত্তেজিত হয়ে বললেন: মানতে আপনি বাধ্য। আমি একজন ইতিহাসের ছাত্র এবং অধ্যাপক।

রবীন একটু হেসে বলল: আপনিও ঠিক ইংরাজ শাসকদের মতই কথা বলছেন, মিঃ তালুকদার। তারাও জোর করে আমাদের মাথায় যা চাপিয়ে দিত, আমাদের তাই মেনে নিতে হ'ত।

একটি অভূতপূর্ব উত্তেজনায় মিঃ তালুকদারের তালুতে কুঞ্চণ দেখা দিল। প্রচণ্ড রাগে তাঁর বাক্য রুদ্ধ হ'ল। চোখ দুটি বিস্ফারিত হল।

সুকন্যাও যে যথেষ্ট বিব্রত হয়েছে তা তার মুখ দেখেই বেশ বোঝা গেল। সে বলল: তুমি ঠিকই বলেছ বাবা; ইতিহাসে তুমি পি. এইচ, ডি। তোমাব সঙ্গে তুলনা কার?

এই রকম একটি অপ্রিয় পরিস্থিতির জন্যে তৈরি ছিল না রবীন। নিছক তর্ক করার খাতিরেও সে ঐ মন্তব্যটি করে নি; কিন্তু সুকন্যার কথায় তার আত্মসম্মান আহত হল। তবু সে নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করে উঠে পড়ল। তারপর একটু হেসে বলল: ইতিহাসকে নতুন করে ঢেলে সাজাবার সময় এসেছে, মিস তালুকদার।

কথাটি বলেই রবীন সেখান থেকে ধীর পায়ে বেরিয়ে এল।

মিঃ তালুকদার তখনও ক্ষেপে ছিলেন বোধ হয়। বললেন, মহা ডেঁপো ছোকরা দেখছি।

রবীন শুনেও শুনল না কথাটা। প্যাণ্ডেলের বাইরে চলে গেল।

ঠিক এমনি সময়ে মাইক চেঁচিয়ে উঠল। প্রথমটায় রবীন ঠিক বুঝতে পারে নি; একটু পরেই বুঝতে পারল। এই আশ্রমে যাঁরা এককালীন কিছু দান করেছেন তাঁদেরই নাম ঘোষণা করা হচ্ছে।

"আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে এই আশ্রমের সর্বাঙ্গীক উন্নতির জন্য বহু মহানুভব ব্যক্তি এককালীন কিছু দান করেছেন। তাঁদের সেই দান আমরা সব সময়েই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করব; এবং আশ্রমের

সভ্যসংসদের তালিকায় তাঁদের বদান্যতার কথা চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এবার দাতাদের নাম বলছি। এইটিই হল আমাদের প্রথম তালিকা। প্রয়োজন বোধে পরবর্তী তালিকা প্রকাশিত অথবা সংশোধিত হবে।"

এর পরেই প্রায় দশজনের নাম। নামগুলির আগে শ্রী (নারীপুরুষ নির্বিশেষে), পরে পদবী। একজন পাঁচহাজারী, তিনজন তিনহাজারী, দুজন একহাজারী, বাকিগুলির দান পাঁচশ এক করে।

মাইক নিস্তব্ধ হওয়ার পরেই প্যাণ্ডেলের মধ্যে গুঞ্জন সুরু হল। প্রথমে চাপা, একটু পরেই সেটি হট্টগোলে রূপান্তরিত হল। এবারের আলোচনা ব্যক্তিবিশেষ অথবা গোষ্ঠিবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ; জনতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

মিঃ গাঙ্গুলি কোথাকার একজন জাজ। মাথায় পাকা চুলের ঝাঁপি। চোখের ভ্রূভঙ্গী মানুষের সহজাত এবং অন্তর্নিহিত অপরাধ প্রবণতার চরম বিশ্বাসে কিঞ্চিৎ কুটিল। তীক্ষ্ণ নাসাটি সব সময়েই সঙ্কুচিত আর বিস্ফারিত হচ্ছে; যেন দুর্গন্ধ আহরণ করার দেবদত্ত অধিকার তাঁর রয়েছে। কথা বলেন কম; দেখেন বেশী, শোনেন আরও বেশী। তাঁর এখানে আসার কথা নয়। আসার কথা মিসেস গাঙ্গুলির। সদানন্দদেবের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন তিনি।

মিসেস মুখে রাজ্যের কালিমা লেপটে বললেন: সে কি কথা। তুমি দিলে মাত্র পাঁচশ এক; আর তোমার কোর্টের উকিলবাবু দিলেন তিন হাজার!

মিস্টার চোখ পাকিয়ে বললেন: দিক।

মিসেস ছাড়ার পাত্রী নন। তিনি বললেন: আমার গুরুদেব তোমার ঐ পাঁচশকে থোড়াই কেয়ার করেন। কিন্তু তোমাদের কোর্টের উকিল তোমার এজলাসে হেরে আজ এই এত লোকের মাঝখানে তোমাকে টেক্কা দিয়ে বেরিয়ে যাবে, সেই কথাটা ফলোয়া করে কাগজে ছাপা হবে, আর তাই নিয়ে তোমার এজলাসে মুহুরীর দল কানাঘুষা করবে, এর পরেও তোমার প্রেস্টিজ থাকবে?

একেই বলে স্ত্রীবুদ্ধি! কথাটা বিবেচনার ব্যাপারই। মিস্টার গাঙ্গুলি মুখে অনন্ত বেজার ফুটিয়ে একবার মাত্র চেয়ে দেখলেন মহিষির দিকে। মিসেস সেই সুযোগে চেক বইটা এগিয়ে দিয়েছেন। মিস্টার একটু ভেবে কলমটা বার করে ডগাটি দাঁতের মধ্যে একবার চিপে ধরলেন।

মিসেস স্বামীর ভাবান্তর লক্ষ্য করে বললেন: ঐ পাঁচহাজার করে দাও মোট।

খস খস করে চেকটা লিখে মিসেসের হাতে দিয়ে মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন মিস্টার গাঙ্গুলি।

কেবল মিস্টার নয়। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যেত তখন চারপাশেই বেশ কিছু খসখস ধ্বনি চলেছে।

এক জায়গায় মিস্টার তালুকদার, মিস তালুকদার, আর মিঃ ব্যানার্জিকে দেখা গেল।

মিস্টার ব্যানার্জি বললেন: মেয়ে যখন ধরেছে তখন কিছু দিয়েই দিন। তবে হ্যাঁ, আপনি যে ট্রাসটির কথা বলেছেন, ভাটস দি আইডিয়া। চলেন, এ বিষয়ে একটা পাকাপাকি কিছু করে ফেলা যাক।

দ্বিতীয় বার মাইক বেজে উঠল। মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ত্রিশহাজার টাকার দ্বিতীয় তালিকা।

১১

পায়ে-পায়ে উৎসরের দিন এগিয়ে আসছে। ভিড় বাড়ছে অতিথি-অভ্যাগতদের। সমস্ত আশ্রম জুড়েই বিরাট একটি কর্মব্যস্ততা বিপুল উদ্দীপনায় নেমে এসেছে। চরখীর মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন তারাদাস; এবং সেই সঙ্গে আশ্রমের প্রতিটি কর্মচারী।

বিকেলের দিকে রবীন এই সবই দেখছিল। দেখতে দেখতে আশ্রম ছেড়ে, আশ্রমের জনতা কাটিয়ে এগিয়ে চলল দিঘীর পাশ ধরে। বৃষ্টি নেই। মাঝে মাঝে দক্ষিণা বাতাসের বয়ঃসন্ধির অভিনয়। বসন্তের সেই চটুল সন্ধ্যায় দীর্ঘ বিলম্বিত পথরেখা ধূলির আবর্তে মাতোয়ারা। এপথে চলার আনন্দ রয়েছে। পথশ্রমের ক্লান্তি এখানে মানসিক অবসাদে পর্যবসিত হওয়ার সুযোগ পায় না। একটির পর একটি দৃশ্য; পাহাড়, মাঠ, অরণ্য। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর।

এপথে ঘোড়া চলে না। গরু চরে, ভঁইসা চরে, ছাগল চরে, আর ওদেরই স্বগোত্র মানুষ হাঁটে।

এই পথ দিয়েই এগিয়ে চলেছিল রবীন। দুটো পাথরের টিলার মাঝখান দিয়ে পথ। পাহাড়-সমাজে এরা নাবালক শ্রেণীর। এদের কোন নাম নেই, নেই কোন অভিজাত্য। পর্বত-আরোহণের দিগ্বিজয়ী আকাঙ্খা নিয়ে কোন অভিযাত্রীর দল এদের বুকে হানা দেয় না। এদের হৃৎপিণ্ডের ওপর নিমুনিয়ার চাপের মত বরফ জমে থাকে না। দিগ্বলয় আচ্ছন্ন করে কোন তুষারঝড় কাঁপায় না এদের।

এ-পাহাড়ে দিনের বেলায় মানুষ হাঁটে, গরু ছাগল ভঁইষা চরে বেড়ায় মানুষের হেপাজতে। রাতের বেলায় ঘুরে বেড়ায় জানোয়ারের দল। দু চারটে বাঘেরও উৎপাত দেখা যায় মাঝে-মাঝে। কখনও বা মহুয়ার গন্ধে মাতাল হয়ে ভালুকও নেচে-কুঁদে একসা করে। হরিণশিশু ছিটকে বেরিয়ে আসে গাছ-গাছালির ভিতর দিয়ে। হায়নার দল মাঝে-মাঝে নিজেদের রসিকতায় পাহাড়ের বুকে প্রতিধ্বনি তোলে।

বিকেলের দিকে রবীন একটা উঁচু পাথরের টিলার ওপর গিয়ে বসল। কিছুটা নিচে দিয়েই পথ; চওড়া হাত দশেকের বেশী নয়। এখান থেকে বেশ কিছুটা দূর পর্যন্ত দুপাশে পাহাড়ের চাপে কায়ক্লেশে এগিয়ে চলেছে পথটি।

অপরাহ্ণের এই পথটিতে কোন গোধূলি নেই আজ। মাঝে-মধ্যে একক কোন রাখাল তার নিঃসঙ্গ মহিষের পিঠে চড়ে যাওয়া-আসা করছে।

এই পাহাড়ের বুকে বসার বিপদ রয়েছে। চারপাশের সীমাহীন শূন্যতা আর প্রাচীনের ইঙ্গিত মানুষকে বর্তমানের কথা ভুলিয়ে দেয়, মানুষের বুকে পাষাণের মত ভারি হয়ে বসে। একটা ভাষাহীন শব্দতরঙ্গ বারবার কানের কাছে আছাড় খেয়ে ঘুরে ঘুরে অবিরত পাক খেয়ে যায়।

রবীন শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সামনের সর্পিল পথরেখার দিকে। কত ক্যারাভ্যান এসেছে এই পথে, আর এসেছে আক্রমণকারী দস্যুর দল। তারা এসেছে ধুলো উড়িয়ে, লুণ্ঠন করেছে জনপদ। কেউ ফিরে গিয়েছে এই পথ ধরে; কেউ কায়েমী হয়ে বসেছে। যারা ফিরেছে তারা পিছনে রেখে গিয়েছে অনাহারের জ্বালা, আর অপমৃত্যুর হাহাকার। যারা যায় নি তারা এদেশের মানুষদের নির্বিবাদে বছরের পর বছর ধরে শোষন করেছে। দস্যুতার বিরুদ্ধে এদেশের মানুষ কোন দিনই রুখে দাঁড়ায় নি; লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে জানায় নি বিশেষ কোন প্রতিবাদ।

হ্যালো, ডঃ দত্ত যে?

রবীন ঘুরে দেখল, দূরে গাছের ছায়ার ভিতর থেকে সরসর করে নেমে আসছে সুকন্যা। পরনে তার নীল শাড়ি; গায়ে একখানা শ্যামলা রঙের বেনিয়ান। কপালে কুঙ্কুমের টিপ্।

কোন সাড়া এল না রবীনের কাছ থেকে।

সুকন্যা হেলতে দুলতে তার পাশে এসে দাঁড়াল; তারপর সামনে একটা পাথরের ওপর ঝপ করে বসে পড়ল।

কী করছেন ?

ঘাস কাটছি।

প্রথমে একটু ঘাবড়িয়েই গেল সুকন্যা। তারপর সামলে নিয়ে চোখ দুটি ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলল : ঘাস !! মানে·······

বিশদভাবে ব্যাখ্যা করল রবীন : ইংরাজেরা যাকে গ্র্যাস বলে।

ওঃ !

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ।

সুকন্যা জিজ্ঞাসা করে : অমন করে চারপাশে কি দেখছেন ?

গাছ।

গাছ !!

হ্যাঁ। চেয়ে দেখুন চারপাশে, লুকিয়ে পড়ার মত কাছাকাছি একটা গাছও নেই।

এবার খিলখিল করে হেসে উঠল সুকন্যা। হাসি থামলে বলল : আই য়্যাম রিয়েলি সরি। আমিও প্রথমে আপনাকে দেখতে না পেয়ে আশ্চর্য হয়েছিলাম। কিন্তু তার পরেই বুঝলাম আপনি গাছের ওপরে।

রবীন সুকন্যার কথা শুনল, কি শুনল না, বোঝা গেল না। সে নিজের মনেই দূরান্তের দিকে চেয়ে রইল।

সুকন্যার স্বরে এবার কৌতুক : কিন্তু কী ভয়ানক লোক আপনি ? গাছের ডালগুলো তো লাল পিঁপড়েতে থিকথিক করছে। ওর ওপর উঠলেন কেমন করে ? আমি তো বাবা মরে গেলেও পারতাম না।

সবাই কি সব কাজ পারে ?

রবীনের কথায়-বার্তায় প্রাজ্ঞ নির্লিপ্ততা।

নখ দিয়ে লম্বা একটা ঘাসের ডগা ছিঁড়তে-ছিঁড়তে সুকন্যা বলল : ছেলেবেলা থেকেই বুঝি গাছে ওঠার অভ্যাস রয়েছে আপনার ?

সুকন্যার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল রবীন। সে-দিনের জন্যে এতটুকু অনুতাপ তো নেই-ই ; আবার উলটো গাইতে সুরু করেছে। ঘেন্না আর পিত্তি বলতে সত্যিই কি মেয়েটার কিছু নেই ?

কিন্তু মুখ দেখা গেল না তার। আর দেখা গেল না বলেই, বোঝা গেল না, ভিতরে কী রয়েছে, আর কী নেই।

রবীনও অন্য দিকে মুখ করে কতকটা আত্মগত হলেই বলল : তা রয়েছে।

কিন্তু তার পরেই সুকন্যার পিঠে একটা ঝাঁকানি দিলে রবীন : আপনি এখানে এসেছেন কেন ?

প্রথমটায় একটু ভ্যাকাচ্যাকা খেয়ে যায় সুকন্যা। দুটো বড-বড চোখ মেলে তার দিকে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে থাকে। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ডান হাত দিয়ে সামনের বন, জঙ্গল, পাহাড়, আর তাদের সংলগ্ন ভূখণ্ডকে বৃত্তাকারে নির্দেশ করে বলল : এই স-ব স-ব-ই আপনার জায়গা বুঝি ?

কী প্রশ্নের কী উত্তর ! রবীন ভাবতে সুরু করে, সুকন্যার মাথায় ঘণ্টায় কত মাইল বেগে রক্ত চলাচল করছে। মেয়েটা পাগল নাকি ? চারপাশে চেয়ে দেখল একবার। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। পাহাড়ের ওপর থেকে দীর্ঘ ছায়া দীর্ঘতর হয়ে গুটি-গুটি এগিয়ে আসছে পাহাডতলীর দিকে।

আপনার বাবাকে দেখছি না যে ?

আমিও তো দেখছি না।

কিন্তু তিনি গেলেন কোথায় ?

সেইটারই তো হদিস পাচ্ছি নে।

শোন কথা। রবীন কী জানতে চায় সবই বোঝে সুকন্যা। কিন্তু সোজা কথাটার উত্তর দেবে না কিছুতেই। বাঁকা হাসির মত বাঁকা কথা বলাটাও বুঝি মেয়েদের স্বভাবজাত। কষ্ট করে পয়সা দিয়ে শিখতে হয় না।

রবীনের পক্ষে একটু দুশ্চিন্তার কথাই। সাঙ্কেতিক ভাষা, নেতিভাষণ, অথবা ঘোরান প্রশ্ন ও ইচ্ছা করেই এড়িয়ে যাবে। অথচ উত্তরটি তার ঝটিতি পাওয়া আবশ্যক। কারণ, তারই ওপর তার পরবর্তী কর্মসূচী নির্ভর করছে। সেদিনের সেই হাস্যকর ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর সে হতে দেবে না। সুতরাং সময় থাকতে সাবধান হওয়া উচিত।

আপনি আপনার বাবার সঙ্গে নিশ্চয়ই বেডাতে গেছলেন ?

নিশ্চয়। সঙ্গে ছিলেন মিষ্টার ব্যানার্জি।

গেছলেন কোথায় ?

ঐতিহাসিক গবেষনায়। আনন্দের বাণী, জৈন অবতার পরেশনাথের গুহা, অশোকের লিপি, জরাসন্ধের গদা, দশ লাখ বছর আগে যে প্রথম তুষারযুগ এসেছিল সে সময়ে মনুষ্য নামক জন্তুর জীবনযাত্রার প্রণালী কী ছিল—এই সব নানা ব্যাপার এবং অব্যাপা। সে সব বোঝা আপনার কর্ম নয়। আপনি ডাক্তার, কেবল নাড়ী টিপতেই জানেন।

দিনান্তের শেষ আলো তখনও ঝিকিমিকি করছে পাহাড়ের ওপর। সেই আলোতে সুকন্যার চোখের তারাতেও কৌতুকের নাচন দেখতে পেল রবীন। এতক্ষণ তার মনে সংশয়ের যে কালো মেঘ জমাট বেঁধে ছিল তা ধীরে ধীরে কেটে গেল।

তাই অকারনে চোখ বিস্ফারিত করতে হল রবীনকে।

বলেন কী।

সুকন্যা ঘাড় নাড়েঃ বলার আর কী রেখেছেন, ডঃ দত্ত? বাবা বলেন, আপনি এক তর্ক ছাড়া আর কিছু জানেন না। আর কোন কথা রয়েছে?

হাল ছেড়ে দিলে রবীনঃ না, নেই। তারপর বলুন।

তারপর আর কি? মিস্টার ব্যানার্জি আমাদের সব দেখালেন। বৃত্রাসুরের ভয়ে ইন্দ্রদেব কোথায় সপুত্র আস্তানা নিয়েছিলেন, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের অক্সিজেন জেনারেটিং প্ল্যাণ্ট কোথায় ছিল, কোন্ জায়গায় দেবযানিকে বিষাদসমুদ্রে ডুবিয়ে মনোপ্লেনে কচ স্বর্গে ফিরে গেলেন........

থামুন, থামুন। মিস্টার ব্যানার্জি একটা হোপলেশ....মানে....

হোপলেশ! জানেন, মিস্টার ব্যানার্জি এই তিন দিনে প্রায় দশলাখ টাকার ইনসিয়োরেন্স পলিশি জোগাড় করেছেন। দিনে গড়পড়তা কত করে হ'ল হিসাব করুন।

বলেন কী। ভদ্রলোক যে গুরুদর্শনে এসেছেন?

সকলেই তো গুরুদর্শনে এসেছেন। কিন্তু আপনি ছাড়া বেহিসেবী কে রয়েছেন?

অর্থাৎ?

ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে গণতে সুরু করে সুকন্যাঃ এক নম্বর হ'ল, মিঃ গড়গড়ি। তিনি বিশ লাখ টাকার কনট্রাক্ট বাগিয়েছেন; দু নম্বর, ডঃ হরেকৃষ্ণ পাল এম, বি। তিনি অন্তত দশটি বড় ঘরের হাউস ফিজিশিয়ন হয়েছেন। তিন নম্বর, মিঃ চকরবর্টি, বি, এস, সি; বি, এল। কলকাতার কোন একটি স্মল কসেস কোর্টে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি বেশ সাঁসালো মক্কেল জোগাড় করেছেন আটটি। আর বলব?....

না থাক। আর বলতে হবে না। কিন্তু আমি ভাবছি....

কেমন করে আমার বাবাকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করা যায়, এই তো? কিন্তু এ

আপনার অন্যায় জুলুম। বাবা নিরপরাধ। ইতিহাস নিয়েই মেতে রয়েছেন। ঠিক হক, আর বেঠিক হক, তিনি কাউকেই ব্ল্যাকমেইল করেন না। তাঁকে চটিয়ে আমাকে বেকায়দায় ফেলে আপনার লাভ কী বলুন তো?

কিন্তু তাঁর মতটা যে ভুল···

এবার ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে সুকন্যা: হক ভুল। তাতে আপনার কী? য়্যামেরিকা হিরোসীমায় যখন য়্যাটম বোমা ফেলে লাখ লাখ নিরপরাধ মানুষকে মেরে প্রচার করল যে মনুষ্যজাতিকে বাঁচাবার মহৎ উদ্দেশ্যেই তাদের ঐ রকম একটি কাজ করতে হ'ল. তখন তো আপনারা কেউ চেঁচিয়ে কুরুক্ষেত্র বাঁধান নি! আর বাবার ইতিহাস-বিশ্লেষনে কতটা জল রয়েছে তাই বার করতে আপনি চতুর্থ পানিপথের সৃষ্টি করেছেন।

সুকন্যার ভাষার মধ্যে ক্লান্তি আর অবসাদ মিশিযে ছিল। রবীন এমন কিছু সংঘর্ষের বিপদসঙ্কেত জানায় নি। তর্ক অবশ্য একটু সে করেছিল, ওরকম তর্ক সকলেই করে; কিন্তু মিস্টার তালুকদারের মনটি এতই স্পর্শকাতর যে সেই সামান্য মাত্র বিরোধী মতবাদই তাঁকে উত্তেজিত করার পক্ষে যথেষ্ট। রবীন মনে মনে হাসে, আর বলে, মিস্টার তালুকদার এখনও সেই ফিউডাল যুগে বাস করছেন, যাঁরা প্রয়োজন হলে সরাসরি ভেঙেই পড়বেন, মাঝখানে মচকিয়ে অপরের করুণাভাজন হবেন না।

কিন্তু ব্যাপারটা যাই হক, তা নিয়ে সুকন্যার সঙ্গে বর্তমানে আলোচনা করাই বৃথা। তাই সে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার চেষ্টা করল।

যাক গে ও-সব কথা। আপনার সমীরণ বাবুর খবর বলুন।

এক মুহূর্তে সোজা হয়ে বসল সুকন্যা। বলল: এই এতক্ষণে একটা কথার মত কথা বলেছেন। সমীরণ একখানা মানুষ। রিয়েলি এ ওয়ানডারফুল বয় অফ চার্মিং ডিসপোশিশন। যেমন স্পীডে মোটর চালায়, তেমনি স্পীডে টেনিস র‍্যাকেট ঘোরায়। বাপের অজস্র পয়সা। সঙ্গে মিশেছে দাদুর ব্যাঙ্ক। অথচ নারীজাতির প্রতি কী অগাধ সম্ভ্রম!

তাই বুঝি?

সুকন্যা ঘাড় নাড়ে: হ্যাঁ। তার উপর রয়েছে বুদ্ধি। যেখানে যতটুকু বুদ্ধি খরচ করা দরকার তা সে করতে জানে। আর জানে বলেই সে সব জায়গাতেই জিতে বেরিয়ে আসে।

আপনি তাঁকে ভালবাসেন নিশ্চয়।

সুকন্যা কয়েক সেকেণ্ড হতভম্ব হয়ে চেয়ে থাকে রবীনের দিকে : মাই গড্। আমরা যে এনগেজড।

ও:। তিনি এখানে এলেন না ?

এখানে এলেই তো বাবার সঙ্গে বনে-বনে ঘুরতে হবে। বনে-বনে ঘুরতে অবশ্য আপত্তি ছিল না, কিন্তু বাবার সঙ্গে ঘোরার একটু বিপদ রয়েছে। যে কোন মুহূর্তে গোলমাল বেঁধে যেতে পারে। সমীরণ তা চায় না, কারণ তাহলে নাকি আমাকে হারাতে হবে।

অর্থাৎ তিনি আপনাকে যথেষ্ট ভালবাসেন।

ও:, স্থিয়োর !

তারপর মুখ ঘুরিয়ে চাপা গলায় বলে : তাইতো বলে।

এর পরে দুজনের মধ্যে আর কোন কথা হল না। ধীরে ধীরে মেটে রঙ-এ ছেয়ে গেল চারপাশ। তারপর নেমে এল কালো একটা যবনিকা।

রবীন উঠে পড়ে বলল : চলুন।

সুকন্যাও উঠে পড়ল : হ্যাঁ, চলুন।

উঁচু-নিচু পাহাড়ের উপর দিয়ে হাঁটা যথেষ্ট কষ্টকর। কয়েক পা হাঁটার পরেই হোঁচট খেল সুকন্যা। রবীন তখন একটু এগিয়ে গিয়েছে।

সুকন্যা পিছন থেকে বলল : আচ্ছা মানুষ তো আপনি! একটু দাঁড়িয়ে যেতে পারেন না ?

রবীন ফিরে চেয়ে দেখল শাড়ির আঁচল ঝাড়ছে সুকন্যা। ফিরে এসে বলল : পাহাড়ের ওপর কেউ ঐ রকম হাই হীল পরে ?

কী করব বলুন ? সমীরণ যে লো হীল একদম সহ্য করতে পারে না। বলে, মেয়েদের বিষয়ে লো হীল আর লো মেণ্টালিটি একই কথা।

রবীন এবার হেসে ফেলে : সবগুলিই তো সমীরণবাবুর শেখানো মনে হচ্ছে। আপনার নিজস্ব বলতে কিছু নেই বুঝি ?

তারপর সুকন্যার একটা হাত ধরে বলল : আসুন; কিন্তু খুব সাবধানে। পা টিপে টিপে; এই খাড়াই থেকে পড়লে সোজা জরাসন্ধের হারেমে গিয়ে পড়তে হবে কিন্তু।

কিছুটা চলার পর সুকন্যা বলল : জরাসন্ধ আপনার চেয়ে অনেক ভাল, বুঝেছেন ? জারাসন্ধ ভীমের সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধে নেমেছিল, দ্রৌপদীর মাথা লক্ষ্য করে গদা ছোঁড়ে নি; আর আপনি বাবার কাছে হেরে আমার হাতে মোচড় দিচ্ছেন। বলিহারি আপনার শিভ্যালরিকে!

চট করে হাতে ছেড়ে দিলে রবীন ; বলল : তা হলে আমার জামার আস্তিন ধরেই অবতরণ করুন।

তাই করল সুকন্যা। সমস্ত পথটা, এবং সে-পথের দৈর্ঘ্য এমন একটা মারাত্মক নয়, রবীনের জামার আস্তিন ধরেই নেমে এল। একবারও পদস্খলন হয় নি তার। কেবল শেষ ধাপটা সে সামলাতে পারে নি। রবীনের পিঠে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। সুকন্যার ধারণা, রবীন হঠাৎ তার হাতটা সরিয়ে নেয়। রবীনের ধারনা সুকন্যা তার পিছনে হঠাৎ ঠেলা দেয়। কারণ যাই হক, দুজনেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আগে রবীন, তার পিঠ ঘেঁষে সুকন্যা। তার সমস্ত দেহটাই প্রায় অঙ্কের হিসাবের মত রবীনের দেহের ওপর পড়ল। অথচ মাটির ওপর কিছুক্ষণ ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে রইল সুকন্যা।

রবীন তাড়াতাড়ি উঠে সুকন্যাকে তুলে বসিয়ে দিলে : ননীর পুতুল! অথচ পাহাড়ে ওঠা চাই।

কোন উত্তর দিল না সুকন্যা ; কেবল মুখ তুলে একটা শব্দ করল : উঃ!

কি হ'ল ?

উঃ!

পা ভেঙ্গেছে, হাত ভেঙ্গেছে ?

উঃ !!

মাথা ?

উঃ !!!

টেনে দাঁড় করালো রবীন। টর্চ ফেলে দেখল সুকন্যাকে। বুঝতে পারল না কিছুই। হাতের পেশীগুলো ম্যাসেজ করল ; পায়ের গাঁটগুলির ওপর আঙুল দিয়ে ঠোক্কর দিল। তারপর দিল ধমক : চলুন! এখানে য়্যাম্বুলেন্সও নেই, মোটরও নেই। রয়েছে ডুলি। তাও ডেকে আনতে গেলে বাঘে তুলে নিয়ে যাবে আপনাকে।

বাঘ!

এক মুহূর্তে সচেতন হয়ে উঠল সুকন্যা : চলুন, চলুন।

আধ ঘণ্টাটাক হাঁটার পর আশ্রমের কাছাকাছি হাজির হল দুজনে। তারপর সেই স্ট্যাচুর কাছে দাঁড়িয়ে রবীন বলল : আপনি এবার সোজা পথে হাঁটুন, আমি বাঁকা পথে।

রবীনের জামার আস্তিনটা ঝপ করে ধরে ফেলে সুকন্যা : ক্ষেপেছেন? এই ভূতের রাজ্যে একলা যাব আমি ?

কিন্তু আমার সঙ্গে আপনাকে দেখলে আপনার বাবাকে সামলাবে কে ?

সে ভাবনা আপনার নেই। আমি সব ম্যানেজ করে নেব।

এবার টানার পালা সুকন্যার। আস্তিন ছেড়ে সে বেশ শক্ত করে এবার রবীনের হাত ধরেছে। ছাড়ল একেবারে আশ্রমের এলাকার মধ্যে।

তাদের সামনেই কয়েকজনকে দেখা গেল। জন আসটেক প্রায়। সকলের হাতেই একটা করে লণ্ঠন, লাঠি ; কযেক জনের হাতে সড়কীও রয়েছে।

আর একটু এগোতেই দলটিকে চেনা গেল বেশ। প্রথমেই তারাদাস, পিছনে মিস্টার ব্যানার্জি আর মিস্টার তালুকদার।

ওদের দেখেই তারাদাস একটু হেসে বললেন : যাক, আর যেতে হল না। আপনার মেযে হাজির। আমি জানতাম মিস তালুকদার নিরাপদেই ফিরে আসবেন।

মিস্টার তালুকদার তখন ঠকঠক করে কাঁপছেন ; রাগে, না শীতে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কথা বেরোচ্ছে না মুখ দিয়ে। উত্তেজনার প্রাচুর্যে কিছুটা শব্দ তালগোল পাকিয়ে বেরিয়ে এল মাত্র।

সু-কু-কু !

চট করে দৌড়ে গেল সুকন্যা ; একেবারে মিস্টার তালুকদারের কাছে। যেন বহুক্ষণের একটা অস্বস্তির নিরসন হল, এরই কাছাকাছি একটা ভাব চোখে-মুখে-স্বরে ফুটিযে তুলে বলল : বাবা, তুমি ফিরেছ ? আমি তো তোমার জন্যে সারা পাহাড়-পর্বত ঘুরে অস্থির। কী মানুষ বলত তুমি ?

উপস্থিত সকলেই থ। মিস্টার তালুকদারের নযনদ্বয বিস্ফারিত। এতক্ষণ তবু যে একটু গোঙানি বেরোচ্ছিল, এখন তাও বন্ধ হয়ে গেল বুঝি। তিনি একবার চারপাশে চেয়ে দেখলেন।

সুকন্যা বলল : ও, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ? জিজ্ঞাসা করুন ডঃ দত্তকে। পথ তো হারিযেই ফেলেছিলাম। হঠাৎ ডঃ দত্তের সঙ্গে দেখা। উনি গেছলেন কুনোয়ার সিংহের গড় দেখতে। ভাগ্যে দেখা হল !

মিস্টার ব্যানার্জি বললেন : দ্যাটস রাইট। আমি তো আপনাকে আগেই বলেছিলাম, মিস তালুকদার হয়ত আপনার জন্যে পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

এতক্ষণে কথা বেরোলো মিস্টার তালুকদারের মুখ থেকে : সে কী কথা মিস্টার ব্যানার্জি ? আমরা তো ঢুকলাম জরাসন্ধের অস্ত্রশালা দেখতে। আমার

বেশ মনে রয়েছে, সুকু তখন আমার পিছনে ছিল। মিনিট পনের পরে যখন ফিরে এলাম তখন তো সুকুকে দেখতে পাই নি। তারপর আমরাই তো ওকে খুঁজে বেড়িয়েছি। না পেয়ে তারাদাস ব্রহ্মচারির শরনাপন্ন হয়েছি।

সুকন্যা বলে: তোমার আজকাল কিছু মনে থাকে না বাবা। যেখানে রাজকন্যা শর্মিষ্ঠা দেবযানিকে কুয়োর মধ্যে ফেলে চলে গেল সেই দেবকূপ না অন্ধকূপ—সেইখানেই তো আমরা দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। কী রকম অন্ধকার দেখেছ? আমি তো তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তোমাকে কী বলব বাবা! আমার তখন মনে হচ্ছিল সেই অন্ধতমসাচ্ছন্ন প্রাচীনযুগের আস্তরণ ভেদ করে যেন একটা বোবা কান্না গুমরে-গুমরে উঠছে চারপাশে।

কেবল্ মিস্টার তালুকদারই নয়, উপস্থিত সকলেই অবাক হয়ে শুনছিল সুকন্যার কথা।

মিস্টার ব্যানার্জি শেষ পর্যন্ত মাথা নেড়ে সমর্থন করলেন: দ্যাটস রাইট, দ্যাটস রাইট।

সুকন্যা বলল: আর তুমি বলছ কিনা জরাসন্ধের অস্ত্রশালা দেখতে যাওয়ার সময় আমাকে তুমি দেখেছ?

আবার ঘাড় নাডলেন মিস্টার ব্যানার্জি: দ্যাটস রাইট, দ্যাটস রাইট।

ভাববিহ্বল চোখে মিস্টার তালুকদার আর একবার চারপাশে চেয়ে দেখলেন। কিন্তু বেশ বোঝা গেল, এই দুজনের জোরাল সাক্ষের সামনে তিনি যথেষ্ট কাবু হয়ে পড়েছেন।

১২

রাত্রি আটটায় সমবেত শিষ্য-শিষ্যা ভদ্রমহোদয়-মহোদয়া, আর দর্শনপ্রার্থী-প্রার্থিনীদের দর্শন দেবেন আচার্যদেব। যাঁরা দর্শন পেতে চান তাঁদের সকলকে আচার্যদেবের নিজস্ব কুটিরে যেতে হবে। দর্শন দেওযার সময় আধ ঘণ্টা। আটটা বাজতে মিনিট পনের আগে একটি ঘণ্টা পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে চারপাশে সাঝ-সাঝ রব পড়ে গেল। কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে দর্শনপ্রার্থীদের সংখ্যা প্রায় শতাবধি। জিজ্ঞাসু তাদের অনেক। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আদিদৈবিক। সমস্যাসঙ্কুল, সংশয়াকুল ভক্তবৃন্দ। বিভিন্ন মানুষের সমস্যা বিভিন্ন; ব্যক্তিকেন্দ্রিক, আত্মকেন্দ্রিক। অথচ আচার্যদেব ব্যষ্টিকে কিছুতেই আমল দেবেন না; সমষ্টিকে উদ্দেশ্য করেই তাঁর বাণী।

কিন্তু এমন সুযোগ ছাড়াও তো চলে না। তাই সেই বহুমুখী সমস্যার মধ্যে একটি সমতা রক্ষা করে সর্বদলীয় সাধারণ সমস্যার কোন খসড়া রচনা করা চলে কি না, উপস্থিত জনতার মধ্যে সে-বিষয়েও একটি তাড়াতাড়ি গবেষণা হয়ে গেল। এবং সর্বসাধারণের হয়ে গুরুদেবের সমীপে বক্তব্যগুলি পেশ করার জন্যে একজন মুখপত্রও নির্বাচিত হলেন। বয়স আর প্রতিপত্তির দিক থেকে কলকাতার বিখ্যাত আলুর ব্যবসায়ী প্রেমচাঁদ আগরওয়ালাই সর্বাপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি বলে বিবেচিত হলেন। তাঁর একমাত্র অসুবিধে, তিনি ভাল বাংলা বলতে পারেন না। না পারুন, হিন্দী-জানা কিছু বাঙালী ভক্তও সেখানে ছিলেন। যদিও হিন্দীভাষীদের সংখ্যা নগণ্য, তবু গরিষ্ঠভাষাভাষীর দল এই সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থসংরক্ষণ করে যথেষ্ট উদারতারই পরিচয় দিলেন।

আচার্য সদানন্দদেবের নিজস্ব কুটির। দেওয়াল পাথর ইঁটের। ছাউনী গোলপাতার। দেওয়ালেও তিনি ইঁট দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না; কারণ ইঁটের মধ্যে নাকি একটা রাজসিক ভাব রয়েছে। কিন্তু বিহারের এই পার্বত্য অঞ্চলে মাটির দাম পাথরের ইঁটের চেয়ে অনেক বেশী। তাই ইঁট বসেছে দেওয়ালে।

ভক্তরা আচার্যদেবের ঘরে ঢুকলেন। ঘরটি প্রশস্ত এবং জাঁকাল। শোফা-সেট থেকে অন্যান্য আসবাবপত্রে বোঝাই। মহাত্মা গান্ধী থেকে সুরু করে অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামের পদস্থ সৈনিকদের পোর্ট্রেট দেওয়ালে ঝুলছে।

সেখান থেকে একটু দূরে ওপ্রান্তে দেওয়ালের গা ঘেঁষে একটি চৌকি পাতা। তার ওপর নরম, মোটা, পুরু ভেলভেটের গদী। সেই গদীর ওপর অজিন আসন।

ভক্তদের কাছ থেকে প্রায় একশ হাত দূরে আচার্যদেবের আসন। তারই সামনে একটি পাতলা কালো সিল্কের যবনিকা ঈষৎ হাওয়ায় আন্দোলিত।

হঠাৎ ঘরের আলোগুলি সব একসঙ্গে নিবে গেল। দরজা-জানালাগুলি আগেই বন্ধ করা হয়েছে। ফলে, জমাট অন্ধকার দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরের ভিতর। একটা স্তব্ধতা, থমথমে ভাব চারপাশে। কেবল আকুল আগ্রহের ভীরু স্পন্দন শোনা যাচ্ছে জনতার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের উত্থান-পতনে।

অন্ধকারের ভিতরে কালো পর্দার ওপাশ থেকে নারীর মিহি কণ্ঠে একটি অস্পষ্ট সুর জেগে উঠল। তারপর সমবেত নারী ও পুরুষ কণ্ঠে বেদস্তোত্র : তমসো মা জ্যোতির্গময়। ধীরে-ধীরে, গমকে-গমকে অন্ধকারের ভিতর থেকে সৃষ্টির

প্রথম আকুতি মূর্তিমতী হয়ে উঠল। নিশীথ রজনীর তিমির অমানিশা ভেদ করে সৃষ্টির বেদনা বিচ্ছুরিত হল চারপাশে। গোটা বিশ্ব যেন বিশ্বাতীত কোন শক্তির কাছে প্রার্থনা করছে, আমাকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাও; অন্ধকারের বিভীষিকা আর আমি সহ্য করতে পারি নে।

ধীরে-ধীরে সেই সুর আকাশে মিলিয়ে গেল। পড়ে রইল কেবল রেশটুকু। যেমন হৃৎস্পন্দন থেমে যাওয়ার পরেও পড়ে থাকে দেহের উষ্ণতা। তারপর সেই পাতলা আস্তরণ ভেদ করে আবির্ভাব হল একটি জ্যোতির। যবনিকা উঠল। দেখা গেল একজন দিব্যকান্ত পুরুষকে।

ছড়িয়ে পড়ল আচার্যদেবের বাণী। সমাজ, মানুষ, ধর্ম; ধর্মের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক, শ্রীকৃষ্ণ, রাধা, বৃন্দাবনের অলৌকিক ব্যাখ্যা। একটানা জলদগম্ভীর স্বরে ভাষণ চলেছে। স্পষ্ট অথচ মৃদাম্নায চড়ানো সে-স্বর। দক্ষ বক্তার ভাষা-বিন্যাস, অলঙ্কার আর শব্দচয়নের তীক্ষ্ণ চাতুর্য। শারীরীক প্রক্রিয়ার অভাব। যেন দেহ নেই, স্থূলতা নেই; একটি মহাভাবের দিব্য জ্যোতি অগ্নির দ্যুতিতে ভাস্বর।

একটু বিরতি। তারপর ভারতে আনন্দধামের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা করলেন আচার্যদেব। পৃথিবী আজ মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িযে। যদিও এ-বিষয়ে সবাই সন্দেহাতীত নন, তবু আচার্যদেবের বাণী একটি নিষ্ঠুর চরমতম সত্যের তীক্ষ্ণ শায়কের মত সকলের চিন্তার রাজ্যে একটি বিপর্যয় ঘটিয়ে গেল। মানুষকে, মানুষের সভ্যতা আর সংস্কৃতিকে বিজ্ঞান আজ ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিযেছে। দুঃখ-দুর্দশা, বঞ্চনা আর অনিশ্চয়তায় ভারাক্রান্ত মানুষের কাছে আনন্দ আজ বড় দুর্মূল্য। গুরুদেব চরম আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে কৃপনের ধনসঞ্চয়ে যে কেবল আনন্দ নেই তা নয়, বিপদও রয়েছে যথেষ্ট। আনন্দ যদি পেতে চাও, চাও যদি বিপদ থেকে মুক্তি পেতে, তাহলে সৎপাত্রে দান কর। দেশের জন্য, দশের জন্য, ধর্মের জন্য, কর্মের জন্য, মহামানবের অভ্যর্থনার জন্য প্রতিটি সক্ষম মানুষের দান অবশ্য করণীয়। যাঁরা অর্থ পারেন অর্থ, যাঁরা জ্ঞান পারেন জ্ঞান, যাঁরা সেবায় পারেন সেবা। ভুলে যাবেন না, প্রতিটি ভবিষ্যৎ, তরঙ্গের মত, বর্তমানের বেলাভূমি অতিক্রম করে অতীতের মধ্যে নিঃশেষিত হচ্ছে। সময়সমুদ্র মহাসময়ের মুখে নিত্যধাবমান। আনন্দধাম সেই দুর্দমনীয় মহাকালসমুদ্রের তটরেখা। অতএব হে মানুষ, ধ্যান, অধ্যয়ন, আর দানের দ্বারা আপনাকে সার্থক কর, নিজের বিরাট

ফাঁকটিকে পূর্ণ কর, নিজের আত্মিক জগতে নিত্যনতুন আনন্দধামের সৃষ্টি কর। ইত্যাদি।

অভিভাষণ শেষ হল। ধীরে ধীরে বিদ্যাপতির প্রার্থনা সুরু হল ঃ মাধব, হম্ পরিনাম নিরাশা।

তারপর যথাসময়ে আবার নেমে এল যবনিকা। চারপাশে জ্বলে উঠল আলো। ঘরের মধ্যে ভক্তের দল চুপ করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। সামনের দিকে চোখ মেলে তাকালেন। কেউ কোথাও নেই। অথবা অন্ধকার আর নৈরাশ্যের পাষানভার মুহ্যমান করে রেখেছিল তাঁদের।

ধীরে ধীরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকলাপ সুরু হল। সকলেই নিঃশব্দে মাথা নিচু করে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন। সকলেরই মুখের ওপর পরিতৃপ্তির একটি প্রশান্তি। ঠিক যেমনটি ঘটা উচিৎ ছিল, তাই যেন ঘটেছে। একমাত্র প্রেমচাঁদ আগরওয়ালা ছাড়া। তাঁর মুখের ওপরেই কেবল আশাভঙ্গের ছাপ। মুখপত্র হলেও, তাঁকে মুখে খোলার অবসর দিলেন না আচার্যদেব।

বাইরে বেরিয়ে একটা চাপা আলোচনায় ব্যস্ত হলেন অনেকে। রবীনই কেবল পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল সেখান থেকে। এই আধ ঘণ্টার মধ্যেই তার মাথাটা দপদপ করতে সুরু করেছে। ফাঁকা হাওয়ার ছোঁয়াছ পেযে একটু আরাম পেল। তারপর এদিক-ওদিক ঘুরতে-ঘুরতে একটা বাগানে গিযে বেঞ্চের ওপর বসে পডল।

মাথার অস্বস্তিভাব কাটার পর একটা কথাই বারবার তার মনের আনাচে-কানাচে ঘোরাঘুরি করল। সেটি হল আচার্যদেবের কথা।

এলাহাবাদের ছকু মিত্রী। সেই দুর্দমনীয়, খামখেয়ালি, রহস্যময় ছকুদার কাহিনী একেবারে ভুলে যাওয়ার কথা নয়। কৈশোরের প্রথম উন্মেষের সঙ্গে তাঁর স্মৃতি জড়িত। যৌবনের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি আর বাস্তবের ক্ষররৌদ্রে প্রভাতের সেই স্নিগ্ধ আমেজটি শুকিয়ে গেলেও, রবীনের কল্পনার আকাশ থেকে তা একেবারে নিঃশেষ মিলিয়ে যায় নি! জীবনের প্রথম স্ফুরণের আবেগে স্পন্দিত সেই দিনগুলির কথাই আজ ঠিক এইক্ষণে তার মনের দরজায় প্রথম কড়া নাড়ল।

গনিতশাস্ত্রের সঙ্গে জীবনবোধের মিলটা নগণ্য; গরমিলটাই আসল। আর গরমিল রয়েছে বলেই বোধ হয় জীবনে বৈচিত্র্য এত বেশী। গনিতের হিসেবী মনোবৃত্তি আর তথাকথিত বিজ্ঞ পদক্ষেপ চিরদিনই মানুষকে তার মনুষ্যত্ব হারাতে বাধ্য করেছে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, এ কথাটি অচল।

কারণ সে চিরদিনই বেপরোয়া, কোনদিনই বাঁধা সড়কের যাত্রী সে নয়; আপনার খেয়াল খুশিতেই সে ঘুরে বেড়ায়। সেই ইতিহাসও মানুষের নাগাল পেতে নাজেহাল হয়ে গেল যুগে-যুগে।

অনেক বংশের মত মিত্রীদের বংশটিও একদিন অঙ্কুর থেকে মহীরুহ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তারপর যথারীতি সেই মহীরুহে ভাঙন ধরেছে; পড়ে রয়েছে কেবল স্মৃতিটুকু।

মাত্র চারটি পুরুষ। তারই মধ্যে মিত্রী বংশ লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে সরে প্রত্নতাত্ত্বিকের খোরাক হয়ে উঠল। প্রপিতামহের একটি টাকাও পায় নি ছকু মিত্রী। পেয়েছিল তার দুঃসাহ; আর পেয়েছিল বহুশরিকে বিভক্ত, বৃক্ষলতায় জর্জরিত, একটি ধ্বংসপ্রায় প্রাচীন প্রাসাদের এক আনা অংশ। বাক্যালঙ্কারে বলতে গেলে সেই এক আনার পরিমান করতে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রযোজন হ'ত। তার বাবার সাকুল্যে সন্তান ছিল ষোলটি। এবং ছকু মিত্রী সেই তালিকায় এমন একটি স্থান দখল করেছিল যেখানে অতি স্বাভাবিকভাবেই স্নেহমমতা যত কম পড়ে, ততটা বেশী আসে ঊদাসীনতা আর নির্যাতন। ঘরের মধ্যে স্থান সঙ্কুচিত বলেই তাকে বাইরে বেরিযে আসতে হযেছিল।

ওদের অর্বাচীন সংঘের একমাত্র প্রাচীন ব্যক্তি ছিল ঐ ছকু মিত্রী। বয়স আর জ্ঞান দুটিতেই। ফলে, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দলের নেতা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিল ও। এ ছাড়া, মাঝে মাঝে হঠাৎ নিখোঁজ হওয়ার বিশেষ একটি ন্যাক ছিল ছকু মিত্রীর। ফিরে এসেই সাঙ্গপাঙ্গদের একেবারে তাজ্যব বানিয়ে ছাড়ত। সত্যিমিথ্যায মিশিয়ে গল্প বলত, অস্বাভাবিক জীবজন্তুর বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী দিত, সাধুসন্ন্যাসীদের অলৌকিক কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করত। অর্বাচীন সংঘের সদস্যরা একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ত।

এ হেন ছকু মিত্রী সকলকে স্তম্ভিত করে এবং অগাধ সলিলে ভাসিয়ে একদিন ঘোষণা করল: সব দেখে শুনে নে তোরা। আমি এবার চলত্তি। জীবনে আর হয়ত এদিকে নাও ফিরতে পারি।

এই ধরণের মনোবৃত্তি যদিও ছকু মিত্রী এর আগেও অনেকবার হাবেভাবে প্রকাশ করেছে, তবু এমন ভাবে স্পষ্ট ভাষায় আর কোনদিনই সে তার ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ঘোষনা করে নি। মুষড়ে পড়ল সবাই।

সে কি দাদা? কোথায়? কতদুর?

দেবাঃ ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ।

তা বটে। তবু?

সাকরেদরা ছাড়ার পাত্র নয়। মিনতি করে ঃ বলনা দাদা, কদ্দূর চলেছ?

বিলেত?

রাশিয়া?

শেষ পর্যন্ত তিতিবিরক্ত হয়ে ছকু মিত্রী বলে ঃ আপাতত বম্বে।

কেন? কেন?

চার্লি চ্যাপলীনের সঙ্গে দেখা করতে।

সকলেরই চোখ ছানাবড়া এবার। একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর। এক ফিল্ম্ স্টার বললেই চোখ কপালে ওঠার কথা; তার ওপর যে-সে ফিল্ম্ স্টার নয়, একেবারে চার্লি চ্যাপলীন। গায়ে কাঁটা দেওয়ার মত অবস্থা।

বাব্বা। চার্লি!! চ্যাপলীন!!! সে যে পেল্লয় লোক গো দাদা।

ছকু মিত্রীর ধৈর্য বজায় রাখা কষ্টকর হয়ে ওঠে; ঝাঁকানি দিয়ে বলে ঃ পেল্লয় নয়তো কি হেঁজিপেঁজি লোকের সঙ্গে দেখা করতে ছকু মিত্রী ছোটে? কোথাকার আহম্মক তোরা রে?

সকলেই এ তিরস্কার হজম করে বলে ঃ তা বটে, তা বটে। কিন্তু তারপর?

একদম হলিউড। তোদের এই পচাদেশে ভদ্রলোক থাকে?

এদেশটি যে পচা ডিমের তুল্য, এবং এখানে যে ভদ্রলোকে বসবাস করতে পারে না, এবিষয়ে ওদেরও কোন দ্বিমত ছিল না; কিন্তু তাই বলে হলিউড! বাপরে বাপরে! যাকে বলে একেবারে শ্যকিং। তারও বাড়া বুঝিবা। একদম ওপার।

কী করবে সেখানে গিয়ে?

ফাইন আর্টের চর্চা করে বাকি দিনকটা কাটিয়ে দেব।

শেষ জীবনের দৈর্ঘ্যটি যে কতখানি তার হিসাব ছকু মিত্রীর জানা ছিল না; তথাপি নেতার এই আকস্মিক বৈরাগ্যে সকলেই মর্মাহত হল। এবং শেষ যাত্রার দিনে এলাহাবাদের অর্বাচীন সংঘ ফুলের মালা গলায় পরিয়ে তাকে যে বিদায় জানাল তা একটি ছোটখাট দেশনেতার কপালেই জোটে।

ছকু মিত্রীর সঙ্গে রবীনের সেই শেষ দেখা।

তারপর প্রায় এক যুগ কেটে গিয়েছে। সেদিনের কিশোর ভাবাতুর রবীন আজ পূর্ণ যৌবনের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় মার্জিত। জগতে পরিবর্তন ঘটেছে।

সেই সঙ্গে ছকু মিত্রীরও পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক। ঘটেছেও। যৌবনের সেই চাপল্য নেই, সেই অস্থিরচিত্ত মানুষটি এখন ধীর, স্থির, গম্ভীর। একটি আশ্রমের কর্ণধার। অজস্র শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত নরনারীর মনে তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ পরিস্ফুট। সেদিনের ছন্নছাড়া বেওয়ারিশ ছকু মিত্রী আজ দায়িত্বশীল আচার্যদেব। পরিবর্তন মানুষের আর জগতের অবশ্যম্ভাবী পরিনতি একথাটি মেনে নিলেও, ছকু মিত্রীর ঠিক এই রকম একটি পরিবর্তনের কথা হয়ত সে কল্পনাও করতে পারে নি। সেই রুক্ষ পাহাড়ী স্টেশনে শ্লথগতি ট্রেনের কামরায় যখন একটি অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে আচার্যদেব আর তাঁর অজস্র গুনমুগ্ধ ভক্তদের সঙ্গে পরিচয় হল, তখন তার মন উৎসাহ আর আনন্দে ভরে উঠেছিল এই ভেবে যে বহুদিন আগেকার একটি নিতান্ত আপনার মানুষের কাছেই সে কর্মজীবন সুরু করতে যাচ্ছে। কিন্তু এই তিনটি মাসের অভিজ্ঞতা যেমন তিক্ত তেমনি রিক্ত। চারপাশে প্রকৃতির এই স্বাভাবিকতার মধ্যে একটি যন্ত্রনাদায়ক বিষফোঁড়ার মতই যেন এই আশ্রমটি কৃত্রিমতার মুখোসে ঢাকা এক অনন্যসাধারণ ব্যতিক্রম। বিশেষ করে এই কিছুক্ষণ আগে যে ভণ্ডামির অভিনয় হ'ল, তার সঙ্গে পারিপার্শ্বিকতার কোথায় যেন একটা গরমিল রয়েছে। সহ্য করতে পারে নি বলেই সে এখানে পালিয়ে এসেছে।

একি। আপনি এখানে ?

রবীনের চমক ভাঙে। চেয়ে দেখে শীলা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আপনি এখানে ?

শীল বলে: আমি এখানে এলে তো কারও কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। আমি এলে ?

একটু চুপ করে থেকে শীলা বলে: কৈফিয়তের কথা নয়। কিন্তু এত রাত্রে বাগানে একা-একা ঘুরে বেড়ানোর অর্থ কী ?

রবীন এবার একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই জবাব দেয়: সব কাজের পিছনেই কি সব সময় কোন মহৎ উদ্দেশ্য থাকে ? অর্থাৎ সত্যিকারের মহৎ উদ্দেশ্য বলতে আমরা যা বুঝি ?

শীলা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। হয়ত রবীনের এই অকারণ ঝাঁঝের কারণটাই খুঁজে বেড়াচ্ছিল। দুটো পা এগিয়েও এল। জিজ্ঞাসা করল: অর্থাৎ ?

এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না রবীন। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল।

একটু হেসে শীলা বলল : ম্লেচ্ছ আর নাস্তিকদের আমরা কিন্তু সযত্নে পরিহার করি।

বেশ কিছুটা উত্তেজিত হয়েই রবীন বলল : সে আপনাদের মহত্ত্ব। কিন্তু তাই বলে ভণ্ডামিকে সত্য বলে মেনে নেব এত বড় উদারতাও আমার নেই।

যেন একটু চমকে উঠল শীলা। মহুয়াগাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ফিকে চাঁদের আলো ঝরে পড়েছে। সেই আলো-আঁধারের মধ্যে শীলার চোখ আর মুখের চেহারাটা ধরা পড়ল না। কেবল স্বর শোনা গেল : বাপ্‌রে, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও এত দাম্ভিক ছিলেন বলে আমার জানা নেই।

আপনার কিছু জানা না থাকলেই যে সবাইকে অজ্ঞ হতে হবে এমন কোন কথা রয়েছে কি?

অত্যন্ত শান্ত স্বরে শীলার জবাব এল এবার : অবশ্য নেই।

তাহলে ?

এবারেও শীলা সহজভাবে বলল : আমার ওপর অকারণ চটছেন আপনি। প্রথমত, আমি দূত, অবধ্য। দ্বিতীয়ত, ভুলে যাবেন না, পেশায় আমি বাবুর্চী। আমার কাজে কোন ভণ্ডামি নেই।

হঠাৎ হোঁচট খেল রবীন। এতক্ষণ তার চিন্তার জগতে যে বিপর্যয় ঘটেছিল, তারই প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনায় সে মনে-মনে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ শীলাকে পেয়ে তারই উপর কিছুটা ঝাল মিটিয়ে নিয়েছিল; কিন্তু শীলার শান্ত সংযত স্বরে সে বুঝতে পারল যে তার উত্তেজনার ধাক্কাটি ভুল জায়গায় গিয়ে আঘাত করেছে। আর বুঝতে পারার সঙ্গে-সঙ্গেই সে লজ্জিত হল।

সরি, ঠিক আপনাকে আঘাত করার জন্যে ওকথা বলিনি আমি।

একটা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল শীলা : বাঁচলাম। কিন্তু রাত হয়েছে সে-খেয়াল রয়েছে কি? না, তাও আমাকে বলে দিতে হবে?

রবীন একবার অবাক হয়ে চেয়ে রইল শীলার দিকে। পাশেই কৃষ্ণচূড়ার লাল ফুল কাকজ্যোৎস্নার বুকে রক্তের চাপের মত দেখাচ্ছে। মহুয়া ফুলের মিঠে গন্ধে বাতাস ভরে উঠেছে। এপাশে কোন কোলাহল নেই।

নিস্তব্ধ সময় মাঝে-মাঝে পাতার মর্মর ধ্বনিতে চকিত হয়ে উঠছে।

শীলা বলল : এখনও যদি না খেয়ে নেন তাহলে শরীর খারাপ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকবে।

কে বলেছে? আমি ডাক্তার, সে-কথাটা ভুলে যাবেন না।

শীলা একটু হেসে বলে : ডাক্তার না হলেই বোধ হয় আপনার ভাল হত।

কি করে জানলেন ?

সবাইকে কি সব কথা বলে দিতে হয় ?

এবার হেসে ফেলল রবীন ; বলল : মাষ্টারি করলেই বোধ হয় আপনাকে মানাত ভাল।

ঠিক কথা।

আপনি এখানে কেন ?

সে জেনে আপনার লাভ ?

কিছু না।

শীলা আর একটু এগিয়ে এসে বলল : আপনি বাড়ি থেকে বেরোলেন কেন ? আর বেরোলেনই যদি, তাহলে ব্রহ্মাণ্ডের এত জায়গা থাকতে আনন্দধামেই বা হাজির হলেন কেন ? আপনি যে দেবদ্বিজে ভক্তিমান আপনাকে দেখে তো তা মনে হয় না।

আপনি বোধ হয় জানেন না, চাকরির খাতিরেই আমাকে আসতে হয়েছে এখানে।

শীলা একটু হেসে বলল : কিন্তু আসলে আপনি চাকরি ছাড়া বাকি সব কাজই করছেন ।

অর্থাৎ ?

চাকরি করতে গেলে যেটুকু দূরদর্শিতার দরকার তা তো চোখে পড়ছে না ; আপনার চাকরি কতদিন টিকবে বুঝতে পাচ্ছি নে।

রবীন হেসে বলল : আমার চাকরি না হয় টিকবে না। কিন্তু আপনার ?

যে-কটা দিন থাকে।

মনের এই দুর্বলতা নিয়ে এখানে পড়ে রয়েছেন কেন ?

হঠাৎ ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে শীলা : সকলের সব কথাই আপনাকে জানতে হবে এমন কোন প্রতিজ্ঞা করে নিশ্চয়ই আপনি ঘর থেকে বেরোন নি ?

না।

তাহলে আপনার খেতে যাওয়ার আপত্তি কী ?

হঠাৎ এই প্রশ্নে রবীন একটু আশ্চর্যই হল। মেয়েটি ঘুরে-ঘুরে কেবল নিত্য প্রয়োজনের নিষ্ঠুর গণ্ডীতে ফিরে আসছে বারবার।

বলল : তাতেই বা আপনার লাভ কী ?

রয়েছে একটু।

বলুন না শুনি।

শীলা ঘাড় নেড়ে বলল: সময় হলেই শুনবেন। আপাতত আচার্যদেব আপনাকে স্মরণ করেছেন। আপনার অসুবিধে না হলে এখনই একবার দেখা করতে পারলে ভাল হয়।

কেন জানেন?

না। আমি দূত মাত্র।

এখনই যেতে হবে?

যদি অসুবিধে না হয়।

হলে?

এর বেশী কিছু বলার অধিকার আমার নেই।

হঠাৎ চটে উঠল রবীন: একটা কথাও কি আপনারা স্পষ্ট করে বলতে পারেন না?

যেটুকু বলা দরকার তার বেশী কি করে বলব বলুন?

রবীন কোন উত্তর দিল না। শীলার দিকে চেয়ে রইল মাত্র।

শীলা হেসে বলল: আর কিছু প্রশ্ন করলেই কিন্তু মিথ্যা শুনতে হবে।

তারপর অত্যন্ত মিনতি করে বলল: বিশেষ দরকার রয়েছে। এখনই না গেলে হয়ত তারাদাস ব্রহ্মচারি নিজেই দৌড়ে আসবেন।

রবীন দুষ্ট ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকিয়ে বলে: আসুন। আমি এখন নড়ছি নে।

শীলা একটু চুপ করে রইল; তারপর তার অত্যন্ত কাছে এসে বলল: বেশ, আমি অনুরোধ করছি, উঠুন।

আপনার অনুরোধই যে রাখতে হবে এমন কোন কথা রয়েছে?

এবার হেসে ফেলল শীলা: বাবা, কী রাগ।

তারপর রবীনের পিঠে ডান হাতের চাপ দিয়ে বলল: আজকের দিনের মত আমার অনুরোধটা রাখুন, তা হলেই আমি আপনার কেনা হয়ে থাকব।

রবীন হেসে ফেলল: দেখছি, আচার্যদেব বা তারাদাসের চেয়ে আপনার জুলুমটাই বেশী। বেশ, আমি চললাম। কিন্তু আপনি আমাকে ফাঁকি দিলেন।

কেন?

আমার কাছে আপনার নিজের সমস্ত কথা গোপন রেখে।

শীলা হঠাৎ যেন একটু থতমত খেয়ে যায়; তারপর বলে : আমার কোন কথা নেই রবীনবাবু; যেটুকু আছে, সময় আর সুযোগ পেলে আপনাকেই বলব। কিন্তু শোনার পর আমার ওপর ঘৃনা হবে না তো?

না।

১৩

আচার্যভবনের দিকে যাওয়ার পথে নাটমন্দিরের কাছে তারাদাস ব্রহ্মচারির সঙ্গে রবীনের দেখা হল। ব্রহ্মচারি রবীনের খোঁজেই বেরিয়েছিলেন।

এই যে, ডঃ দত্ত। আপনাকেই খুঁজছিলাম।

কি ব্যাপার?

আপনাকে এক্ষুনি একবার বেরোতে হবে।

কোথায়?

বক্তিয়ারপুরের দিকে। স্টেশন থেকে মাইল দশেক।

কেন বলুল তো?

সেখানে আমাদের আশ্রমের একটি পেট্রোন থাকেন। নাম রামশরণ চোবে; বড় ধর্মভীরু লোক। পয়সাও যেমন অগাধ, দিলও তেমনি বড়। এই আশ্রমে তাঁর অনেক টাকার দান রয়েছে।

কিন্তু আমাকে সেখানে যেতে বলছেন কেন?

তারাদাস বললেন : তাঁর স্ত্রীর অসুখ। পাশাপাশি কোন ভাল ডাক্তার নেই। তাই আমাদের এখানে সংবাদ পাঠিয়েছেন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। আপনার কোন অসুবিধে হবে না। জিপ পাঠিয়েছেন তিনি। একটু ঘুরে যেতে হবে। তাহলেও ভোরের আগেই পৌঁছে যাবেন।

কিন্তু আচার্যদেব আমাকে স্মরণ করেছিলেন কেন?

এই জন্যেই। ব্যাপারটি খুব জরুরী কি না।

রবীন একটু ভাবল : তাহলে তাঁকে বলে দেবেন যে আমি চললাম।

নিশ্চয়, নিশ্চয়। আপনি তৈরি হয়ে নিন। আমি এদিকে সব ব্যবস্থা করে রাখছি।

আধ ঘণ্টার মধ্যে রবীনকে নিয়ে জিপের কাছে হাজির হলেন ব্রহ্মচারি।

যেতে যেতে বললেন : আপনাকে একটা কথা বলে দিই, ডঃ দত্ত। মিঃ চৌবে আমাদের একজন সত্যিকারের শুভার্থী। তাঁকে আপনি আমাদেরই একজন মনে করলে অনুগৃহীত হব। অর্থাৎ তাঁর যদি কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয়....

রবীন হেসে বলল : ওকথা বলছেন কেন ? আমি ডাক্তার। আমার কাছে সব রোগীই সমান। আপনি নিশ্চন্ত থাকুন ; আমার কাজে কোন অবহেলা হবে না।

ব্রহ্মচারি হেসে বললেন : খুব খুশি হলাম আপনার কথা শুনে। এইত চাই। মানুষ যদি তার কর্তব্যে অবহেলা না করে তাহলেই সে মানুষ। বাঁচা না বাঁচাটা ভগবানের হাতে। আর একটা কথা।

বলুন।

ব্রহ্মচারি গলার স্বর নিচু করে বললেন : আপনি আমাদের আশ্রমের ডাক্তার। প্রাইভেট প্রাকটিসের নিয়ম নেই এখানে। তবু, মিস্টার চৌবে আপনাকে যদি কিছু দেন আপনি নেবেন। এবং সে-টাকা আপনার নিজস্ব।

রবীন হেসে বলল : আশ্রমের নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ভার আপনার ওপর। আপনিই আমাকে নিয়ম ভাঙতে উপদেশ দিচ্ছেন ?

ব্রহ্মচারি একটু হেসে জিব কেটে বললেন : না, না ; সে কথা নয়। কিন্তু আপনার দিকটাও তো আমাদের দেখতে হবে। আপনাকে আমরা কিছুই দিতে পারি নে। আশ্রমের কাজে ব্যাঘাত না করে আপনি যদি কিছু বাড়তি রোজগার করেন তাতে তো আমাদের বাধা দেওয়া উচিত নয়। আচ্ছা, এবার আসুন। কাল দুপুরের মধ্যে নিশ্চই আপনি ফিরে পড়তে পাবেন। শুভমস্তু।

কাঁচা-পাকা রাস্তার ওপর দিয়ে, ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল পেরিয়ে, ময়ানদীর চর ডিঙ্গিয়ে তীব্র বেগে গাড়ি ছুটে চলেছে। চারপাশে জ্যোৎস্নার বান। বেশ ভালই লাগছে। প্রাক-বসন্তের হাওয়ায় তখনও শৈত্যের আধিক্য রয়েছে, তাই জানালার সব কটা শার্সি বন্ধ করে চওড়া কুশনের ওপর পা ছড়িয়ে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় পড়ে রইল রবীন।

সামনের একজন বলল : ডাক্তার সাহেব, অনেক দূর যেতে হবে। আরাম করে একটু ঘুমিয়ে নিন।

কতদূর ?

ষাট মাইল তো বটে। সকালের আগে পৌঁছানো যাবে না।

ওঃ! অসুখটা কী বলতে পারেন ?

লোকটি একটু চুপ করে থেকে বলল ঃ গেলেই দেখতে পাবেন।

আবার সব চুপচাপ। রবীন সেই কুশনের ওপরেই মাথা নুইয়ে দিল। চোখ যখন মেললো তখন ভোর হয়ে এসেছে; আর তাদের জিপ একটি বড বাড়ির পোর্টিকোর দিকে এগিয়ে চলেছে। চারপাশে চেয়ে দেখল। কাছাকাছি আর এত বড বাড়ি নেই। জায়গাটাও তার পরিচিত নয়। ঘুমিয়েছিল বলেই বুঝতে পারে নি কতদূরে আর কোথায় এসেছে।

গাড়ি ভিতরে ঢুকে গেল। সামনেই বিরাট বাগান; ছোট বড় লোহার খাঁচার মধ্যে নানা রকমের পাখি, খরগোস, গিনিপিগ: দু'চারটে ময়ূরও চরে বেড়াচ্ছে লনের কুঁচো ঘাসের ওপর। মাঝখানে ছবির মত একখানি একতলা বাড়ি।

কিন্তু লোকজন বিশেষ নেই, অর্থাৎ যতটা থাকা উচিত ছিল ততটা নয়। খান দুই য়্যামব্যাসাডার, একখানা ট্রাক; আর দু'চারজন চাকর ড্রাইভার শ্রেণীর লোক ঘুরে বেডাচ্ছে।

গাড়ি থামতেই ড্রাইভার তাকে ড্রয়িংরুমে নিয়ে এল। সুন্দর ঝকঝক করছে ড্রয়িংরুম। অর্থের অপব্যবহার যারা করতে পারে তাদের ঘরেই আসবাবপত্রের এই ধরণের অনাবশ্যক বাহুল্য দেখা যায়।

ড্রয়িংরুমে বসিয়ে চলে যাওয়ার জোগাড করল লোকটি।

রবীন জিজ্ঞাসা করল ঃ মিঃ চৌবে কোথায়?

তাঁকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

লোকটি চলে গেল। রবীন বসে রইল কয়েক মিনিট। কারও দেখা নেই। ব্যাপারটা বড ভাল লাগল না তার। যে মানুষ রোগীর চিকিৎসার জন্যে ষাট মাইল দূরে রাত্রে গাড়ি পাঠায় ডাক্তারকে ছুটিয়ে আনতে, সেই মানুষের দেখা নেই এখনও। বাড়িতে সাড়াও তো নেই কারও। সামনের রাস্তা দিয়ে অবশ্য লোক চলাচলের শব্দ আসছে। কিন্তু সে সামান্য। কোথায় যে এসেছে তাও সে বুঝতে পারল না।

দশ মিনিট কেটে গেল। রবীন দাঁড়িয়ে উঠল। অস্থিরভাবে পায়চারি করল। তারপর ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। হাত ঢুকোতেই একটা জিনিষ খড়খড় করে উঠল। একখানা ভাঁজ করা কাগজ। হাত দিয়ে তুলে নিলে কাগজখানা। অন্যমনস্কভাবে ভাঁজটা খুলল। চোখ পড়ল কয়েকছত্র মেয়েলি হাতের লেখার ওপর।

"শেষ কটা কথা বলার সুযোগ হয় নি। যেখানে যাচ্ছেন সেখান থেকে সোজা দক্ষিনে মাইল কুড়ি গেলে তবে বক্তিয়ারপুর স্টেশন। পথ ভাল নয়। ওখান থেকে টানা আসতে ঘণ্টা চারেক তো লাগারই কথা। সন্ধ্যে পাঁচটাতে বক্তিয়ারপুরের শেষ ট্রেন। আশা করি শুভ সংবাদ নিয়ে আসবেন।"

লেখাটার তলায় নাম নেই কোন। কিন্তু কার লেখা বুঝতে কষ্ট হল না তার। আশ্চর্য হল রবীন। তারাদাস ব্রহ্মচারি তাকে রোগী দেখতে পাঠালেন আচার্যদেবের অনুরোধে। তার সব দায় আর দায়িত্বই তাঁদের। তা যদি সত্যি হয় তাহলে শীলার এই সতর্কতার অর্থ কী? সবই গুলিয়ে যাচ্ছে যেন।

একটু পরে একজন বাবুর্চী হাজির হল। তার হাতে ব্রেকফাস্টের সরঞ্জাম।

বাবু কোথায়?

আসছেন।

ডেকে দাও তাড়াতাড়ি।

সঙ্গে সঙ্গে একজন প্রৌঢ় ঘরে ঢুকলেন। মাথার চুলগুলিতে পাক ধরেছে সত্যি, কিন্তু চেহারায় লালিত্য রয়েছে। মনে হল এইমাত্র যেন প্রসাধন সেরে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। ফিনফিনে ধুতি, আর পাঞ্জাবির ওপর একটি পরিষ্কার ঝরঝরে এপ্রোন। পায়ে স্লিপার।

মর্নিং, ডঃ দত্ত। রাস্তায় অসুবিধে হয় নি?

মিঃ চৌবের বাংলা বড ঝরঝরে। তিনি একটি চেয়ারে বসে বললেন: সমস্ত রাত্রি জার্নি করেছেন, এখনও হাত মুখ ধোন নি? বেয়ারা?

একজন দৌড়ে আসতেই চৌবেজি তাঁকে গালাগালি দিলেন। তারপর রবীনকে লক্ষ্য করে বললেন: আজকাল চাকর-বাকরগুলো যে কী হয়েছে কী বলব আপনাকে! আসুন।

পাশেই বাথরুম। ঠাণ্ডা আর গরম জলের কল। সাবান, তোয়ালে, প্রসাধনের সামগ্রী।

দয়া করে হাত মুখ ধুয়ে নিন।

সময় নষ্ট না করে হাত মুখ ধুয়ে এল রবীন। তারপর চেয়ারে এসে বসতেই মিঃ চৌবে চা, বিস্কিট, স্যানডুইচ কাপ আর প্লেট সাজালেন, বললেন: আসুন।

রবীনের বিরক্তি লাগল; সে যেন নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছে পার্টিতে; রোগী দেখতে নয়। ভদ্রলোকের মনেও তো কোন দুশ্চিন্তা নেই। তাহলে?

বলল: তারাদাস ব্রহ্মচারি....

মিঃ চৌবে একটা বিস্কিট কামড়ে চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে বললেন : হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচার্যদেব আর তারাদাস ব্রহ্মচারি, টু গ্রেট ফ্রেনডস অফ মাইন। আপনি বুঝি নতুন এসেছেন, ডঃ দত্ত?

হ্যাঁ।

আপনার আগে যিনি ছিলেন, বড় স্যাড ব্যাপার। সাপে কামড়ে মারা গেলেন। ওখানে ভীষন সাপ মশাই। এই গরমের দিনে চারপাশে কিলবিল করে ঘুরে বেড়ায়।

কিন্তু আপনার পেসেণ্ট...

কিছুটা সুস্থ এখন। আপনি ইয়ংম্যান। সাবধানে থাকবেন। আর তাছাড়া আসবেন এখানে ?

এখানে ?

হ্যাঁ। ওখানে আর কত মাইনে পান। আমি একজন ট্রাষ্টী কিনা! সব জানি। আমি আপনাকে পাঁচশ দেব মাসে। চাকর, খাওয়া-দাওয়া, কোয়ার্টার সব ফ্রি। এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে আমার একটি কোলিয়ারি রয়েছে। সেখানেই থাকবেন আপনি।

ব্রেকফাস্টের সঙ্গে নানা গল্প চলল। শেষ হলে রবীন বলল : এবার তাহলে........

নিশ্চয়, নিশ্চয়। চলুন। এসেছেন যখন দেখেই যান।

দুজনেই উঠে পড়ল। চলতে চলতে মিঃ চৌবে বললেন : ভীষণ বাড়াবাড়ি হয়েছিল। আপনাকে আনতে লোক পাঠানোর পরেই আমার কোলিয়ারির ডাক্তার হাজির হয়। সেই সব করে গিয়েছে। এখন রোগী অনেকটা ভাল। তবু যখন এতটা পথ এসেছেন....

মিঃ চৌবে আর কোন কথা না বলে ঘরের দরজাটা খুলে দিলেন। ঘরের মধ্যে একটা মৃদু আলো জ্বলছে। মেঝের ওপর একটি নারী শুয়ে রয়েছে। তার গায়ের ওপর একটি চাপা। তার পাশে কিছু ওষুধ-পত্রের সামনে দাঁড়িয়ে আর একটি বয়স্থা মহিলা। হয়ত নার্সই হবে। রোগীকে দেখে মনে হল সে ঘুমোচ্ছে।

আপনি দেখুন; আমি ড্রয়িং রুমে অপেক্ষা করছি।

ঠিক পাঁচটি মিনিট পরে ফিরে এল রবীন। মুখ তার গম্ভীর। চোখ দিয়ে তার আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে।

এ কী করেছেন, মিঃ চৌবে? কে এরকম কাজ করল ?

মিঃ চৌবে একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কেন ? কী হয়েছে ?

কী হয়েছে আপনি জানেন না ? মেয়েটাকে একেবারে শেষ করে ফেলেছেন যে। জানেন না নীতির দিক থেকে ভ্রূনহত্যা পাপ, আর আইনের দিক থেকে দণ্ডনীয় ?

মিঃ চৌবে শান্তভাবে বললেন ঃ বসেন, বসেন।

আর বসার সময় নেই মিঃ চৌবে। এখানে কাছাকাছি কোথায় হাসপাতাল রয়েছে বলুন। এক্ষুনি রোগীকে সেখানে পাঠাতে হবে। তারপর অন্য কথা।

এবার একটু নিরুপায়ের মত চোখ করলেন মিঃ চৌবে ঃ সত্যিই এতটা সিরিয়াস ? এখানে কিছু করার উপায় নেই ?

না।

এই বলে সে তাড়াতাড়ি তার ওষুধের ব্যাগটা হাতড়াতে লাগল। তারপর সিরিঞ্জের ছুঁচটা পরিষ্কার করতে করতে বলল ঃ যান, উঠুন।

দ্বিতীয় কোন কথা না বলে রবীন দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তার হাতে একটা কোরামিন।

একটু পরে রবীন ফিরে এল। দেখল, মিঃ চৌবে ড্রয়িং রুমে নেই। চেয়ারে গিয়ে বসল সে।

এতক্ষণে বুঝতে পারল যে সত্যিকারের একটি অপরিচ্ছন্ন পরিস্থিতির মধ্যে এসে পড়েছে সে ; এবং না এলেই হয়ত সব চেয়ে ভাল ছিল তার পক্ষে। মিঃ চৌবে যে একজন সাঁচ্চা ব্যক্তি সেই কথাটাই সে শুনেছে তারাদাসের কাছে। আনন্দধাম আশ্রমের একটি প্রধান স্তম্ভ। বহু টাকার দান খয়রাতি. তাঁকে নাকি একটি মহাপুরুষের স্থান দিয়েছে। কিন্তু তাঁর ঘরে একী কাণ্ড। মেয়েটি কে ? ওঁর স্ত্রী ! অমন নরম মোমের মত তরুনী। হয়ত এই তাঁর প্রথম সন্তান। তাকে নষ্ট করার জন্যে যে পথটি অনুসরন করা হয়েছে রুচির দিক থেকে তা যেমন গর্হিত, স্বাস্থ্য আর মনের দিক থেকেও তেমনি বিপজ্জনক। তার ধারনা, ভ্রূনটিকে কাল রাত্রির প্রথম দিকেই হত্যা করা হয়েছে ; আর তার জন্যে যার সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে সে য়্যানাটমিতে অনভিজ্ঞ কোন হাতুড়ে ছাড়া অন্য কিছু নয়। রোগীর অবস্থা যখন খারাপের দিকে এগিয়ে চলেছে তখনই তাকে ডেকে আনবার জন্যে গাড়ি গিয়েছে। হয় তারাদাস একথা জানতেন না ; আর না হয়, জেনে তাকে এই অপ্রিয় পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছেন ইচ্ছে করে।

আধ ঘণ্টা সময় সে এইভাবে কাটিয়েছে। ওষুধ নেই তার কাছে। যেটুকু ছিল

তা শেষ হয়েছে। ওখানেই যতটুকু সম্ভব, ততটুকু আরামই দিবার চেষ্টা করল রোগীকে ; কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। রোগীর নাড়ি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসতে লাগল। রবীন দেখল, রোগীর চোখ দুটি ম্লান, ফ্যাকাসে। মৃত্যুর যবনিকা নেমে এসেছে ধীরে ধীরে। রবীন ফিরে এল ড্রয়িং রুমে। আর কিছু করার নেই তার।

মিঃ চৌবে গাড়ি থেকে নামলেন। ব্যস্ত হয়ে এসে বললেন : এখানে হাসপাতাল তো নেই। তবু একটা ব্যবস্থা করে এসেছি।

রবীন তার কীটব্যাগ গুছিয়ে নিযে বলল : আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন, মিঃ চৌবে। এখানে আমার করার কিছু নেই। আপনার স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার ব্যবস্থা করুন।

ডেড ?

ষ্টোন ডেড।

রবীন কীটব্যাগ কাঁধে তুলে ঘরের বাইরে যাওয়ার জন্তে পা বাড়াল।

ডক্‌টর !

ফিরে চাইল রবীন। মিঃ চৌবে পকেট থেকে এক তাড়া নোট বার করে টেবিলে রেখে বললেন : আপনার ফি, আর মেহনদের পারিশ্রমিক। কিন্তু একটা ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে যান।

রবীন উত্তেজিত হয়ে বলল : ডেথ সার্টিফিকেট ? নরহত্যার সার্টিফিকেট দিতে গেলে এ-জগতে প্রকৃতির নিযমে আর কেউ মরবে না। আপনাকে পুলিশে দেওয়া উচিত।

হঠাৎ রবীনের চোখ দুটি মিস্টার চৌবের চোখের দিকে আকৃষ্ট হল। স্থির ধীর সে দুটি চোখ। ঠাণ্ডা কনকনে ; দ্যুতির চেয়ে প্রখরতা বেশী। তীক্ষ্ণ অজগর-নেত্রের চুম্বকের চেয়ে কম শক্তিমান নয় তারা।

মিঃ চৌবে একটু হাসলেন ; বললেন : আমাকে পুলিশে দিতে গেলে, আপনাদের আশ্রমের অনেককেই জেলে যেতে হবে। আপনিও হযত বাদ যাবেন না। কিন্তু ওসব চিন্তাই বা আপনার মনে আসছে কেন ? অন্তায় করব না বলে মনস্থির করলেও অনেক সময় মানুষ অন্তায় করে ; কেউ না বুঝে করে, কেউ অবস্থার চাপে পড়ে করে।

একটা ঠাণ্ডা হাওয়া যেন বয়ে গেল রবীনের মুখের ওপর, সারা দেহ ভেদ করে তার চিন্তার জগতে। বর্তমান পরিস্থিতির বিপদটি সে ঠিক এইভাবে চিন্তা করার

সময় পায়নি এতক্ষণ। এখন ঠিক এই মুহূর্তে চিন্তা করতে গিয়েই সে যেন অতলে তলিয়ে যেতে লাগল।

মিঃ চৌবে বললেন : তাহলে আপনাকে আসল ঘটনাটাই বলি।

তার কি প্রয়োজন রয়েছে কিছু?

নিশ্চয় রয়েছে। আমার দিক থেকে না থাকতে পারে, আপনার দিক থেকে থাকা উচিত। বসুন।

নিরুপায়ের মত গভীর একটা অস্বস্তিকে চেপে রবীন বসল।

ঐ যে মেয়েটিকে দেখছেন, ও আমার স্ত্রী নয়; আমারই একজন পরিচিত ব্যবসায়ীর স্ত্রী। আজ এক বছর হল সে ভারতের বাইরে গিয়েছে। যাওয়ার সময় আমার কাছেই ওকে রেখে যায়। কলকাতাতেই ও থাকত; যথেষ্ট ফ্যাশনেবল কোয়ার্টারে মিশত। আর সেই সব জায়গার কোন একটি স্থানেই ওর জীবনে এই বিপদ ঘনিয়ে আসে। ব্যাপারটা জানতে পেরেই ও ভয়ে একেবারে শাদা হয়ে যায়।

আমার কাছে যখন ও সব কথা বলল তখন তিনমাসের গর্ভবতী ও; ব্যবস্থা একটা আমাকে করতে হবে; আর ঠিক ঐ জন্যেই ওকে নিয়ে এলাম এখানে। বিশেষ তাড়াও ছিল না। ছেলেটাকে একটা অনাথআশ্রমে রাখলেই ঝামেলা মিটে যেত।

কিন্তু হঠাৎ খবর পেলাম আমার সেই বন্ধুটি আগামী কাল কলকাতায় এসে পৌছবে। আমি কিছুটা বিপদগ্রস্তই হয়েছিলাম, তবে ও যা করেছে সেটি ওর নিজেরই দায়িত্বে। আমি জানতে পেরেই আপনাকে আনতে লোক পাঠাই।

রবীন কথা না বাড়িয়ে খসখস করে একটা ডেট সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে বলল: আপনার কাহিনীর আগাগোড়া যে বানানো নয় সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই; তবু মৃতা মহিলাটির দিকে চেয়েই আমি এই সার্টিফিকেট দিয়ে গেলাম। এবার দয়া করে আমাকে পাঠাবার একটু ব্যবস্থা করে দিন।

মি: চৌবে টাকাগুলি তার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন: ও: ইয়েস।

রবীন হাত জোড় করে বলল: ওঁর যদি কোন কাজে লাগতে পারতাম, তাহলেও না হয় একটা কথা ছিল। কিন্তু কিছু না করে, আর বিবেকের বিরুদ্ধে একটি মিথ্যে ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে এটাকা নিতে আমার রুচিতে বাধবে, মিস্টার চৌবে।

মিস্টার চৌবে একটু হেসে বললেন: থ্যাংক্স্। কোলিয়ারিতে যদি কোন

দিন আসতে চান আমাকে জানাতে দ্বিধা করবেন না। আপনার মত একজন সচ্চরিত্র যুবকই আমার দরকার, ডঃ দত্ত। আপনার জন্যে আমার অফার খোলা রইল।

জিপে তুলে দিয়ে মিস্টার চৌবে রবীনকে বললেন: আচার্যদেব আর ব্রহ্মচারিকে আমার নমস্কার জানাতে ভুলবেন না।

১৪

পা টিপে-টিপে হাজির হল সুকন্যা। রবীন তখন বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে।

মাই গড! জামা-জুতা-মোজা সব পরে শুয়ে রয়েছেন যে!

ঘুরল রবীন। এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সুকন্যার দিকে।

চিনতে কষ্ট হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে যেন।

রবীন একটু হেসে বলল: না, না; তা কেন? এখনও যদি আপনাকে চিনতে কষ্ট হয় তাহলে আর চিনব কবে?

সুকন্যা আরও কিছুটা কাছে সরে এসে বলল: থ্যাংকস। বসতে পারি একটু?

নিশ্চয়, নিশ্চয়। কিন্তু বাবাকে কী বলবেন ঠিক করে রেখেছেন তো?

চোখে দুটো বড়-বড় করে সুকন্যা বলল: অর্থাৎ

কিন্তু তারপরেই খিলখিল করে হেসে উঠল: ও, সেই কথা বলছেন?

রবীন কোন উত্তর দিল না। সুকন্যা বিছানার ওপর এসে বসে যেন অনেকটা নিজের মনে-মনেই বলল: সে তো কেবল আপনাকে বাঁচাবার জন্যেই।

এবার হাঁ করে থাকার পালা রবীনের।

বলেন কী?

হ্যাঁ।

কেবল আমাকে বাঁচাবার জন্যেই এত গুলি মিথ্যে কথা বললেন?

তা ছাড়া আর কী? জীবনে আমি আর কোনদিন মিথ্যে বলি নি।

আর কখনও না? মনে করে বলুন।

কষ্ট করে আর মনে করতে হল না সুকন্যাকে। কথাটিকে স্বতঃসিদ্ধ মনে করে চটে উঠে সুকন্যা বলল: আচ্ছা ভদ্রলোক তো আপনি? আমার কথা আপনার বিশ্বাস হল না?

রবীন বিছানা থেকে উঠে পড়ল। ঘরের মধ্যে এগিয়ে গেল। কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে ঘটঘট করে খেয়ে নিল; তারপর মুখটা তোয়ালে দিয়ে মুছে বলল: না।

না !!!

চমকে উঠল সুকন্যা। মুখের ওপর এমন স্পষ্ট ভাষায় রবীন যে তাকে মিথ্যাবাদী বলতে পারে সুকন্যা যেন তা বিশ্বাসই করতে পারছে না। তাব চোখ দুটি বিস্ফারিত হল, নাকটি কেঁপে-কেঁপে উঠল। শরীরে কুঞ্চন দেখা গেল।

কী বললেন?

না, না, না।

অতি স্পষ্ট, আর প্রাঞ্জল ভাষায় রবীনের উত্তর ভেসে এল।

সুকন্যা চুপ করে শুনল; তারপর হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠে দুহাতের চেটোতে মুখ ঢেকে বিছানায় মাথা গুঁজে দিলে।

কথাটা রবীন বলেছিল নিছক উত্তেজনার মুহূর্তে; সুকন্যার রুদ্র মূর্তির আক্রমনকে সবলে প্রতিরোধ করার জন্যেই সে তার নিজের বক্তব্যটিকে স্পষ্ট ভাষায় সমর্থন করেছিল। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া যে সুকন্যার ওপর এইভাবে দেখা দেবে তা সে কল্পনাও করতে পারে নি। সুকন্যাকে সোজাসুজি আঘাত করার ইচ্ছে তার ছিল না। কিন্তু গত চব্বিশটি ঘণ্টার উত্তেজনা আর তারই অনিবার্য পরিনতি হিসাবে ক্লান্তি তার সমস্ত দেহের ওপর পাষানের মত ভারি হয়ে চেপেছিল। নিজের সঙ্গেই সে নিজে তখনও পর্যন্ত মোকাবিলা করে উঠতে পারে নি। মিস্টার চৌবের ড্রাইভারের কাছে আশ্রমের ভিতরকার কাহিনী যেটুকু শুনেছে তাতেই সে সংশযাকুল হয়ে পড়েছে। কেবল এই আশ্রমের সম্বন্ধেই নয়; এই আশ্রমটিকে ঘিরে যারা আজ মাতামাতি করছে, তাদের সকলের ওপরেই তার একটা বিদ্বেষ দেখা দিয়েছে। সুকন্যাকেও সে এদের কাছ থেকে পৃথক ভাবে দেখেনি। তাই অতর্কিতে সুকন্যার এখানে আগমন তাকে কিছুটা সতর্ক হতে বাধ্য করেছে। সুকন্যার সম্বন্ধে সে যতটুকু জানে, তার ওপর তার এই মিথ্যা দম্ভকে সে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে নি। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি সে সত্যিই আশা করেনি; এবং করে নি বলেই তার ভদ্রমনটি একটু ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল।

তাড়াতাড়ি বলল: ও কি? কাঁদছেন কেন?

সুকন্যা কিছু বলার জন্যেই বোধ হয় মুখ তুলে চাইল; কিন্তু কিছু বলার

আগেই দুজনকে সচকিত করে দরজার ঠিক বাইরে মিঃ তালুকদারের গলা পাওয়া গেল।

সুকু?

সুকন্যা মুখ তুলে চাইল রবীনের দিকে। একটু হাসল; তারপর ডাকল: বাবা?

রবীন বলল: আসুন, মিঃ তালুকদার।

মিঃ তালুকদার আজ একা। তিনি রবীনের দিকে একটু চেয়ে রইলেন; তারপর ঢুকে এলেন ঘরে।

সুকন্যা উঠে পড়ে বলল: মাথাটা বড্ড টনটন করছিল বাবা।

মিঃ তালুকদার এগিয়ে এলেন; তারপর আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: তোর চোখে জল কেন?

সুকন্যা হেসে বলে: কী রকম একিউট পেন, বাবা। ডঃ দত্তর কাছে তাই এলাম। উনি একটা কী বড়ি দিলেন। তাই খেয়েই না কমে!

মিঃ তালুকদার রবীনের দিকে চেয়ে বললেন: মেয়েটার স্বাস্থ্য নিয়ে বড়ই ঝামেলায় পড়লাম, ডঃ দত্ত। আপনি ওর একটু চিকিৎসা করুন তো দয়া করে?

রবীন বলল: এখানকার উগ্র পরিবেশই এর জন্যে দায়ি। এখন আপনি বিশ্রাম করুন, মিস তালুকদার। আশা করি, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আপনি রিলিফ পাবেন। কোন ভয় নেই, আমি তো রয়েছি।

মিঃ তালুকদারের স্বরে আজ আর রুক্ষতা নেই; বললেন: ভরসা তো সেইটুকুই। দুএকদিনেই সমীরণ আসছে। তারই সঙ্গে ওকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেব।

সুকন্যা চোখ দুটি বড় বড় করে জিজ্ঞাসা করে: আর তুমি?

মিঃ তালুকদার হাসেন: আমার এখনও কিছু দেখার বাকি রয়েছে। আমি পরেই ফিরব।

সাফ কথা বলে দিলে সুকন্যা: তাহলে আমিও রইলাম।

রবীন ঘাড় নেড়ে বলল: আপনার বাবা এখানে থাকবেন কাজে। আপনার তো কোন কাজ নেই। সুতরাং আপনার কলকাতায় ফিরে যাওয়াই ভাল।

সুকন্যা ঘাড় বাঁকিয়ে প্রশ্ন করে: বাবাকে দেখবে কে শুনি? আপনি? আপানার তাতে কোন আপত্তি রয়েছে?

সুকন্যা মিঃ তালুকদারের দিকে চেয়ে বলে: বাবা, কথা শোন। নিজেকেই দেখে কে তার ঠিকানা নেই, উনি আবার তোমাকে দেখবেন? তুমি চেন না বাবা, ডঃ দত্তকে।

মিঃ তালুকদার আমতা আমতা করে বলেন: তা চিনি, নিশ্চয়ই চিনি।

সুকন্যা তর্জনী তুলে বলে: কক্ষনো চেন না। সে কথা আমি বাজি রেখে বলতে পারি। এতক্ষণ ডঃ দত্ত কী করছিলেন জান?

কি, কি?

ঐ প্যাণ্ট, কোট, জুতো, মোজা সব পরে ঘুমিয়েছিলেন। আমি যে মাথার যন্ত্রনায় ছটপট করছি সে দিকে লক্ষ্য ছিল এতক্ষণ?

তাই নাকি, তাই নাকি?

রবীন একটু হাসল: কাল অনেকটা দূরে রোগী দেখতে যেতে হয়েছিল। ফিরলাম; এই একটু আগে। তাই একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু তাই বলে আপনারা আমাদের অতিথি। আপনাদের কি অবহেলা করতে পারি?

মিঃ তালুকদার বললেন: নিশ্চয়, নিশ্চয়।

রবীন বলল: এবং যেহেতু আপনাদের স্বাস্থ্য রক্ষার চেষ্টা করাই আমার কাজ, সেই হেতু আমার সঙ্গে সহযোগীতা করাও আপনাদের কর্তব্য।

একশ বার।

আর সেইদিক থেকে বিবেচনা করে বলতে হচ্ছে যে মিস্ তালুকদারের এখানকার জলহাওয়াটা মোটেই সহ্য হচ্চে না। ওঁকে কলকাতাতে পাঠানোই ভাল; অবশ্য সম্ভব হলে।

সুকন্যা চোখ দুটা বড় বড় করে প্রতিবাদ করতে গেল: কক্কনো নয়; একদম বোগাস। ডাক্তার না........

বাধা দিলেন মিঃ তালুকদার: ডঃ দত্ত ঠিক কথাই বলেছেন। সমীরণ এলেই........

সুকন্যা মিঃ তালুকদারের একটা হাত ধরে দরজার দিকে টানতে টানতে বলল: চল বাবা....এইখানে বেশীক্ষণ দাঁড়ালেই তোমার ঠাণ্ডা লাগবে।

দুজনেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে; যাওয়ার সময় হঠাৎ পিছন ফিরে সুকন্যা রবীনের দিকে লক্ষ্য করে কী যেন বলতে গেল; কিন্তু বলতে না পেরে জিবটা বার করে একটু বেঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

মিঃ ব্যানার্জি এইদিকেই আসছিলেন হন্তদন্ত হয়ে। হঠাৎ সুকন্যাকে জিব ভ্যাঙাতে দেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে গেলেন। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলেন না তিনি।

সুকন্যা তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলল: এই যে মিঃ ব্যানার্জি। এতক্ষণ কোথায় ছিলেন ?

মিঃ ব্যানার্জি বললেন: দ্যাটস ইট। আমিও সেই কথাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। মিঃ তালুকদারকে খুঁজে হায়রান। চলুন, ওদিকে ফায়ারওয়ার্কস সুরু হয়েছে যে।

চলুন।

তিনজনেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

রজনী কমপাউণ্ডার হাজির হল।

কাল রাত থেকে আপনাকে দেখি নি স্যার।

একটু কাজে বেরিয়েছিলাম।

কোথায় স্যার ?

বলার কিছু বাধা ছিল না; তবু কমপাউণ্ডারের অনাবশ্যক কৌতূহল তাকেও আজ কিছুটা কৌতূহলী করল। লোকটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর স্ফুরিত নাসা অপ্রয়োজনীয় সংবাদ সরবরাহ করার চেষ্টায় উদ্‌গ্রীব। তার অভিজ্ঞতা থেকে সে বুঝেছে যে এদের কোন কৌতূহলকেই সহজে চরিতার্থ করার উপায় নেই। করতে গেলে অজস্র প্রশ্নবানে মানুষকে জর্জরিত হতে হবে।

একটু এদিক-ওদিক আরকি ?

তবে যে শুনলাম রোগী দেখতে।

কার কাছে শুনলেন ?

রজনী কমপাউণ্ডার একটু ঢোক গিলে বলল: ঠিক কার কাছে শুনেছি মনে নেই; তবে জেরি গুজব, আপনি বক্তিয়ারপুরের দিকে গেছলেন মিঃ চৌবের বাড়ি।

রবীন এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কমপাউণ্ডারের দিকে। তার চোখ দুটি চকচক করছে। একটা অস্বাভাবিক আলোর ঝলকানি বেরুচ্ছে সেখান থেকে।

মিঃ চৌবেকে আপনি জানেন ?

জানি নে আবার ? খুব জানি। তারাদাস ব্রহ্মচারির বন্ধু। আশ্রমের একজন বড় মুরুব্বি।—

ভদ্রলোক কেমন বলুন তো ?

রজনী কমপাউণ্ডার ডাইনে-বাঁয়ে হেলে বলল : ভালই স্যার। পয়সাওয়ালা, দিলদরিয়া, মিষ্টভাষী, ধর্মপ্রান।

আর কিছু ?

আর ঠিক কোন্ জিনিষটা জানতে চাচ্চেন বুঝতে পারলে বলতে পারি স্যার।

গভীর জলের মাছ রজনী কমপাউণ্ডার। রবীনকে একটু বাজিয়ে নিতে চায়।

না, এমনি জিজ্ঞাসা করছি।

রবীন পিছন ফিরে এগিয়ে গেল টেবিলের দিকে।

রজনী কমপাউণ্ডার একটু চুপ করে থেকে মুখ খুলল ; স্বর চাপা, অনেকটা ফিস-ফিস করার মত।

মেয়েটির খবর কী ? বেঁচে রয়েছে তো ?

রবীন পিছন থেকেই ঘাড নাড়ল : না।

মারা গেল !! আমি আগেই জানতাম।

এবার ঘুরে দাঁড়াল রবীন। একটু হাসল, তারপর বলল : আপনি তো অনেক খবরই রাখেন দেখছি।

রজনী কমপাউণ্ডার ঘাড নেড়ে বলল : তা রাখতে হয় বই কি। বিদেশ-বিভূঁই-এ রয়েছি, কিছু খবর না রাখলে চলবে কেন ? সমুদ্রের পার রয়েছে স্যার, কিন্তু এই আশ্রমের মহিমা অপার।

বলেন কী !

রজনী কমপাউণ্ডার একটু মুচকি হেসে বলে : এ-বান্দা মিথ্যে বলে না, স্যার। খাঁটি কথা বলে। আমি জানিনে কী ?

আর বেশীদূর এগোতে দেওয়া সুবিধের হবে না ভেবেই রবীন বলল : জানার কথাই।

কিন্তু এতেই খুশি হওয়ার লোক রজনী কমপাউণ্ডার নয়। সে বলল : ঐ যে সদানন্দদেব, তারাদাস ব্রহ্মচারি, নিতাই ব্রহ্মচারি—সকলের নাড়ি-নক্ষত্র জানি, বিশেষ করে আচার্যদেব আর তারাদাস ব্রহ্মচারি, এঁরা তো মিঃ চৌবের প্রানের বন্ধু স্যার।

তাই বুঝি ?

বাবা বলতেন, রজনী, লেখাপড়া শিখলে তুই একটা কেষ্টবিষ্টু হতে

পারতিস। কিন্তু লেখাপড়া না শিখলেও হাতের কাজ শিখেছি। এর আর মার নেই। তারাদাস ব্রহ্মচারি বলে কি না, চাকরি নট করে দেব। দিক না; কত বড় বুকের পাটা দেখি একবার। আমি কাউকে কেয়ার করি নাকি?

রবীন অবাক হয়ে চেয়ে রইল রজনী কমপাউণ্ডারের দিকে। সেখানে প্রাক্তন কৌতূহলের বদলে একটা জ্বালা প্রতিহিংসার আগুনে ধকধক করছে।

আপনাকে ব্রহ্মচারি ভয় দেখিয়েছেন?

দেখাক; কেয়ার করি নে আমি। টেকনিক্যাল লোক, স্যার। যেখানে যাব লুফে নেবে।

তা বটে। কিন্তু হঠাৎ ...

ভাগে টান পড়েছে। ঐ যে আপনাদের মিঃ বোনার্জি। লোকটি একটি বাস্তু-ঘুঘু, স্যার। বাজারের চেয়ে চড়াদামে ওষুধ বিক্রী করে। কারণ, তারাদাস ব্রহ্মচারির পেয়ারের লোক তিনি। শতকরা দশ টাকা কমিশন দিতে হয়। এবারে আচ্ছা ক'রে লোকটাকে কড়কে দিয়েছি। বলেছি, আমাকে শতকরা পাঁচ না দিলে সব ফাঁস করে দেব। তাইতেই সেক্রেটারি ক্ষেপেছে।

ওঃ, তাই বুঝি?

তবে আর বলছি কী, স্যার। আচ্ছা, আপনিই বলুন তো, ওর অভাব কি? আশ্রমের ইট-কাঠ-লোহালক্কড় গাঁথার ভার ওর ওপর; কিচেনের খরচ ওর হাত দিয়ে হবে; আশ্রমের মেয়েদের তদারক ওর ওপর ....

হঠাৎ জিব কাটে কমপাউণ্ডার। চারপাশে চেয়ে বলে: কাউকে বলবেন না স্যার।

না, তা বলব না।

রজনী আবার উৎসাহিত হয়ে বলে: যেখানে পয়সা সেখানেই তারাদাস। তোর রোজগারের এত রাস্তা খোলা। তুই কিনা আমাকে ঘুষ নেওয়ার ভয় দেখাস? তাছাড়া মাইনে দিস ত্রিশ টাকা মাসে। ঘুষ খাব নাত খাব কী শুনি?

আর আচার্যদেব?

মানুষটা এদের চেয়ে ভাল। কিন্তু ভাল হলে হবে কী! তারাদাসের মুঠোর মধ্যে।

উনি এসব জানেন?

না জানার কিছু নেই। মাঝে-মাঝে বিরক্তিও দেখান, কিন্তু ঐ টাকার তোড়া, আশ্রমের প্রভুত্ব—এসব ছাড়িয়ে কিছু করার উপায় নেই তাঁর। টাকা

বড় ভীষণ জিনিষ, স্যার। জো খায়া ওভি পস্তায়া, জো না খায়া ওভি পস্তায়া।

হাসতেই হল রবীনকে। সাচ্চা কথা বলেছে রজনী কমপাউণ্ডার।

আর নিতাই ব্রহ্মচারি?

ঐ মানুষটিই বোকা, স্যার। সব সময় পুজো-আচ্ছা নিয়েই মেতে থাকেন। কত বলি, নিতাই দা, সবাই আখের গুছিয়ে নিলে, তোমার কপালেই কেবল পোড়া কলা। আমার কথা শুনে হাসেন।

হুঁ!

একটু এদিক-ওদিক পায়চারি করে রবীন। পৃথিবীর মধ্যে যত বিবাদ রয়েছে, তাদের মধ্যে স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থ্যের বিবাদটাই বোধ হয় সবচেয়ে পুরানো আর মারাত্মক। সব বিরোধেরই একটা-না-একটা মীমাংসা হয়। কিন্তু এ-বিরোধের মীমাংসা নেই। আজ রজনী কমপাউণ্ডারকে দেখে তার সেই কথাটাই নূতন করে মনে পড়ল।

রজনী কমপাউণ্ডার বলল: দরকার হলে আমাকে একটা সার্টিফিকেট দেবেন, স্যার। হাজার হ'ক, এতদিনের চাকরি, হুট করে এক কথায় উড়ে না যায়।

রবীন মনে মনে একটু হাসল। বলল: আমার সার্টিফিকেটে কিছু হবে না, রজনীবাবু। সেক্রেটারির মন জুগিয়ে চলুন, তাহলেই সব ঝামেলা মিটে যাবে।

সে চেষ্টা আর কি প্রথম-প্রথম করিনি, স্যার? করেছি। তবুও যদি দরকার হয়....

নিশ্চয় দেব।

হঠাৎ একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল রজনী কমপাউণ্ডার।

আমি এবার আসি, স্যার।

কিন্তু রজনী কমপাউণ্ডার ঘোরার আগেই তারাদাস ব্রহ্মচারি হাজির হলেন।

কি ব্যাপার রজনী? তুমি এখানে?

রজনী হাত কচলিয়ে বলে: এই, স্যারের সঙ্গে একটু দেখা করতে এসেছিলাম।

বিশ্রামের সময় তুমি ডাক্তারকে বিরক্ত করছ তো?

না, না স্যার, বিরক্ত করব কেন? কালকের কাজের একটা ইনসট্রাকশন নিতে এলাম।

কালকের কাজের জন্যে আজ তুমি এত ব্যস্ত, এ-তো ভাল কথা নয় রজনী; কালকের কাজ কাল হবে।

রজনী একথা মানতে রাজি নয়; বলে: সে কি হয় স্যার? আপনাদের ঐ সরকারি কোয়ের কথা ছেড়ে দেন। ফাঁকি দিতে ওস্তাদ ওরা। আমাদের তো একটা দায়িত্ব রয়েছে।

তারাদাস একটু ঘাড় নেড়ে বলেন: তা রয়েছে। দেখুন, ডঃ দত্ত, আমাদের বহু জীবনের তপস্যার ফলে এমন একজন দায়িত্বশীল মানুষ পেয়েছি। আচ্ছা রজনী, জগতে এত জিনিষ শেখার থাকতে তুমি কমপাউণ্ডারি শিখতে গেলে কেন?

প্রথমটায় রজনী একটু ঘাবড়িয়ে গেল; কিন্তু তারপরেই হেসে বলল: ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছে আমার চিরদিনের, স্যার। কিন্তু পয়সার অভাব। তাই কমপাউণ্ডার হয়েছি। আর আপনাদের আশীর্বাদ পেলে....

তারাদাস হেসে বললেন: সে কি হে রজনী? আমাদের জীবনটাই তো তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। এখনও আশীর্বাদ পাওনি—একি একটা কাজের কথা হল? যাক গে, তা লোক কিছু মারতে পেরেছে?

রজনী বুক ফুলিয়ে বলে: ওটি বলতে পারবেন না, স্যার। গুটি দশেকের বেশী নয়। তা সত্যি কথা বলতে কি, স্যার, ওদের কেউ বাঁচাতে পারত না।

তারাদাস একবার রবীনের দিকে চেয়ে দেখলেন; তারপর হেসে বললেন: শাস্ত্রেই রয়েছে যে বৈদ্য হতে গেলে অন্তত হাজারটি মানুষকে মারতে হবে তোমাকে। তুমি এ-ব্যবসা ছেড়ে দাও রজনী। আশ্রমে যে লেদ মেসিন রয়েছে তাতে কাজ কর। আচার্যদেবকে বলে তোমাকে আমি ফোরম্যান করে দেব। মানুষ রিপেয়ার করার কাজে তোমার যোগ্যতা কম।

নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলেন তারাদাস।

আপাতত, তোমার ওষুধপত্রের অবস্থা কী রজনী?

ভাল নয়, স্যার। ভ্যাকসিন নেই, কাল সকালের মধ্যে না এলে ঐ ছাউনীর লোকেদের কিছু করা যাবে না।

তারাদাসকে একটু চিন্তিত মনে হ'ল; তিনি রবীনকে লক্ষ্য করে বললেন: আপনারও কি সেই মত, ডঃ দত্ত?

প্রায় তাই।

ডায়রেকটরেট অফ হেলথ সার্ভিসের কাছে তো যথাসময়েই আবেদন জানানো হয়েছিল?

হ্যাঁ। তবে এবারে এতটা ভিড় হবে কেউ আশা করতে পারেনি। ফলে, প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম ওষুধ এসেছে।

তারাদাস এবার একটু হাসলেন, বললেন : আমার অনুমান ঠিকই, ডঃ দত্ত। তাই কলকাতা থেকে কিছু ওষুধ আনবার ব্যবস্থা করেছিলাম। এবং সেগুলি যথাসময়েই এসে পড়েছে।

রবীন চোখ দুটি বড়-বড় করে বলল : বলেন কী ?

তারাদাস এবারেও একটু হেসে বললেন : হ্যাঁ। সবই মহাপ্রভুর ইচ্ছে। রজনী, লিস্ট মিলিয়ে সব তুলে রাখ। ডঃ দত্তের বিশেষ অনুমতি ছাড়া ওগুলি ব্যবহার করো না। যাও।

রজনী কমপাউণ্ডার ঝটিতি প্রস্থান করলে। তারাদাস একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন : ওদিককার খবর পেয়েছি, ডঃ দত্ত। সত্যিই খুব দুঃখিত।

অনেকক্ষণ গতকালের কথাটা ভুলেছিল রবীন। তারাদাসের কথায় মনে পড়ে গেল। এবং মনে পড়তেই হঠাৎ কি জানি কেন তারাদাসের ওপর তার বিতৃষ্ণা জমাট বেঁধে নেমে এল।

আপনি আমাকে বলেছিলেন, মিঃ চৌবের স্ত্রীর অসুখ। মিঃ চৌবে তা স্বীকার করলেন না।

তারাদাস ব্রহ্মচারির চোখে-মুখে এমন কোন ভাবান্তর লক্ষিত হল না যাতে বোঝা যায় যে এই কথা শুনে তিনি আশ্চর্য হয়েছেন। বরং মনে হল, রবীনের কাছ থেকে এই ধরনের একটি কথাই তিনি আশা করছিলেন।

বললেন : সত্যি হলেই যে মানুষে সব কথা সকলের কাছে স্বীকার করবে এ তো নাও হতে পারে, ডঃ দত্ত।

রবীন একটু আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল তারাদাসের দিকে ; তারপরে বলল : অর্থাৎ ?

সে-কথার সোজাসুজি কোন উত্তর না দিয়ে তারাদাস বললেন : বিশেষ কারনে মানুষ তো সত্য কথা গোপনও করতে চায়। স্ত্রী যদি দ্বিচারিনী হয়, সেটা কোন স্বামীরই গৌরবের কথা নয়, ডঃ দত্ত। আর স্বীকার করাটা আরও অগৌরবের।

তারাদাসের কথার মধ্যে ভাবাতিশয্য তো নেই-ই ; বরং এতটুকু ভাবও রয়েছে কিনা তাও অনুভব করার মত। স্পষ্ট অথচ মার্জিত সে-কথা। নীতির দিক থেকে পক্ষপাতদুষ্ট নয়।

তবু অবচেতনার কোনখানে একটি স্পর্শকাতর সন্দেহ বহুক্ষণ ধরে রবীনকে খুঁচিয়ে মারছিল।

সে বলল : কিন্তু তাই বলে স্ত্রীকে হত্যা করাও কোন স্বামীর পক্ষে গৌরবের কথা নয়।

তারাদাস শান্তভাবে বললেন : ঠিক তাই।

এবং এই হত্যা ব্যাপারের সঙ্গে মিঃ চৌবে যদি কিছুমাত্রও জড়িত থাকেন তাহলে মানুষ হিসাবে তিনি নিন্দনীয়, আইনের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।

সমর্থনে তারাদাস ঘাড় নেড়ে বললেন : আপনার বক্তব্যটি যদি ঠিক হয় তাহলে আপার সঙ্গে নিশ্চয়ই আমি একমত।

আমার অনুমান ঠিক বলেই আমার ধারনা।

তারাদাস একটু হেসে বললেন : অনুমান আর সত্য এক বস্তু নয়, ডঃ দত্ত। মানুষকে ফাঁসি দেওয়ার সময় অনুমানের ওপর নির্ভর করা উচিত নয়। সত্য কোথায় সেইটাই খুঁজে দেখতে হবে। আমি জানি, মিঃ চৌবে নির্দোষ।

মৃত মহিলাটি যে ওঁর স্ত্রী নন একথা আমাকে বলার পরেও আপনি বলছেন ?

ওটা ওঁর কথার কথা, ডঃ দত্ত। আসলে ওঁর স্ত্রী বিচারিনী ছিলেন। স্বামীর অগাধ বিশ্বাস আর ভালবাসাকে উনি নষ্ট করে নিজের আর স্বামীর জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছিলেন। মানুষ অনেক সময় ভুল করব বলে হয়ত ভুল করে না। কিন্তু তাই বলে ভুল কাউকেই ক্ষমা করে না। শেষ পর্যন্ত নিজের ভুল বুঝতে পেরে মহিলাটি নিশ্চয়ই মর্মাহত হযেছিলেন ; তা না হলে স্বামীকে না জানিয়ে গোপনে ঐরকম কাজ করতে গেলেন কেন ? মিঃ চৌবে যখন আপনাকে ডেকে পাঠান তখন ক্ষতি যা হওয়ার হয়েই গিয়েছে। স্ত্রীকে বাঁচাবার একবার শেষ চেষ্টা করেছিলেন তিনি।

রবীন বলল : আপনার কথাই হয়ত ঠিক। তবু মিঃ চৌবে স্বীকার করলেন না যে মহিলাটি তাঁর স্ত্রী।

তারাদাস একথার উত্তর দিলেন না কিছুক্ষণ ; তারপর বললেন : কথাটা যেন গোপন থাকে, ডঃ দত্ত ; ওর সঙ্গে আমাদের আশ্রমের সুনাম জড়িয়ে। জানেন বোধ হয় মেয়েটি এই আশ্রমেরই।

শুনেছি।

আর এটাও বোধ হয় জানেন যে বিশ্বকর্মার কর্মশালা বলতে যা বোঝা যায় আমাদের আশ্রমটি আসলে তা নয়।

অর্থাৎ ?

রোজগার করার ফ্যাক্টরি নয় এটি। রোজগারটি এখানে গৌণ। মুখ্য

হচ্ছে চরিত্রগঠন। সেই গঠনের কাজে যদি কোন গাফিলতি হয়ে থাকে তাহলে তার সমস্ত দায় আর দায়িত্ব পড়বে আমাদের ওপর। মিঃ চৌবের স্ত্রী যদি কোন দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়ে থাকেন, তাহলে তার ঝক্কি থেকে আমরা এড়িয়ে যেতে পারি নে। পারি কি, ডঃ দত্ত?

রবীন এই প্রশ্নের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। এতক্ষণ প্রশ্ন করে চলেছিল রবীন; এবার সে-ভারটা নিয়েছেন তারাদাস। এতক্ষণ তার মনে আশ্রমের বিরুদ্ধে যে ক্রোধ আর বিতৃষ্ণা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল, তারাদাসের বিশ্লেষণে সেটি ধাক্কা খেয়ে সরে গেল। তারাদাসের সমস্ত যুক্তি সে মেনে নিতে না পারলেও একথা ঠিক যে সেগুলিকে নস্যাৎ করে দেওয়ার মতও কোন হাতিয়ার ছিল না তার হাতে।

তারাদাস উঠে পড়ে বললেন: আশ্রমের সম্বন্ধে যদি কোথাও কোন নোংরা কথা শুনে থাকেন সেগুলিকে বিশ্বাস করবেন না, ডঃ দত্ত। অনেক লোকে অনেক কথা বলে; না বলাটাই আশ্চর্যের। কিন্তু সব সময় মনে রাখবেন, কোন ব্যক্তির চেয়ে সংঘ অনেক বড়; কারণ, সংঘকে আশ্রয় করেই মানুষ বেড়ে ওঠে। আজ আপনি বিশ্রাম করুন। কাল থেকে আর নিঃশ্বাস ফেলবার সময় থাকবে না আপনার।

তারাদাস চলে গেলেন। রবীন অবাক হয়ে চেয়ে রইল তাঁর চলে-যাওয়ার পথের দিকে। অদ্ভুত তীক্ষ্ণ এই মানুষটি। এই ক'মাসের একটি দিনও এঁকে রাগতে দেখেনি সে। হাসির প্রলেপে ঢাকা তাঁর কথাগুলি। বিনয়ের গোলাপজলে মার্জিত। কিছু মানুষ ওঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটায় বটে, কিন্তু ওঁর মুখ থেকে সে কোনদিন অপরের কুৎসা শোনে নি। মিঃ চৌবের বিরুদ্ধেও তাঁর যেমন বলার কিছু নেই, তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধেও তেমনি। সব দোষটা যেন নিজের গায়েই মেখে নিতে তিনি উদগ্রীব। এই কি বৈষ্ণবের বৈষ্ণবত্ব?

১৫

রঙের খেলা সুরু হয়েছে। চুয়া-চন্দন আর আবির-গুলালে ছেয়ে গিয়েছে চারপাশ। নাটমন্দির থেকে সুরু করে গাছপালা, ঝোপঝাড়, মাটিপাথর আর দিঘীর জল। ভোর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে রাধামাধবের স্নানযাত্রা শেষ হয়েছে। তারপর জেগে উঠেছে আশ্রম। মেতে উঠেছে আশ্রমের লোক! আজ আর কেউ বাদ নেই; পৃথক করে চেনা যাবে না কাউকেই।

কেউ বলেন, রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নই প্রথমে এই দোল উৎসব সুরু করেন। সাধকদের মতে শঙ্খচূড় অথবা হোলিকাকে বধ করেই ভগবান বিষ্ণু এই উৎসবের প্রচলন করেন। সভ্যতার ইতিহাসে বসন্তের উৎসব কবে সুরু হয়েছিল জানিনে, তবে এটুকু অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে, মানুষ তখন তার যাযাবর অবস্থা কাটিয়ে উঠেছে, মাটিকে ভালবাসতে শিখেছে, শিখেছে ফসল ফলাতে, প্রকৃতির অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে লড়তে সুরু করেছে ধীরে ধীরে। এ-উৎসব তাই কেবল ভারতের নয়, সমস্ত বিশ্বের। প্রাচীন গ্রীসে ব্যাক্কার উৎসব, আর লুপারক্যাল অনুষ্ঠান এই বসন্তোৎসবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের।

আমাদের দেশে এই উৎসব ব্রজমায়ীদের। নারীদেরই প্রাধান্য এখানে। পুরুষের চেয়ে প্রকৃতিই যে বেশী শক্তিশালী সেইটাই বোধ হয় প্রমান করার জন্যে এক ব্যাটালিয়ন নারীসৈন্য পিঠ থেকে আবিরের ঝোলা ঝুলিয়ে, আর এনফিল্ড বন্দুকের ভঙ্গীতে পিচকিরি বাগিয়ে ধরে কদমে কদমে মার্চ করে চলেছে। কোন মায়া-মমতা, ক্ষমা-দাক্ষিণ্য নেই এই প্রমীলার রাজত্বে। সামনে যাকে পাচ্ছে তাকেই তছনছ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। অনেকটা সেই জুলিয়স সিজারের বিজয়-অভিযানের মত: আসিলাম, দেখিলাম, জয় করিলাম। নারীদের বিলোল কটাক্ষ যে হাইড্রোজেন বোমার চেয়ে বেশী মারাত্মক তা আগে কে জানত?

রবীনকে এখন আর চেনা যাচ্ছে না। কাউকেই চেনার উপায় নেই, চিনতে পারাটাই আজ ব্যতিক্রম। এই হট্টগোলে নাজেহাল হয়ে এক সময় নিজেকে সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে, আশ্রমের একটি প্রত্যন্ত অংশে সরিয়ে নিলে, শত্রুপক্ষের তাড়া খেয়ে যেমন কোন সৈনিক প্রানভয়ে পালিয়ে এসে সামনের যে-কোন আবরণকে পরম নির্ভরযোগ্য অশ্রয়স্থল বলে মনে করে।

হাতে পিচকিরি, আর ঝোলায় আবির নিয়ে হাজির হ'ল সুকন্যা। ক্লান্ত তার পদক্ষেপ, কৌতুকময়ী তার আঁখিদুর্টি। এদিক-ওদিক দৃষ্টি ফেলে গুটি-গুটি এগিয়ে এল মেয়েটি। তারপর রবীনকে পরম নির্ভয়ে ঐ ধরনের একটি কেয়াঝাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করে থাকতে দেখে প্রথমে অবাক হ'ল, তারপর হাসল।

বলল: এ-জগতে কেবল আমিই মিথ্যে কথা বলি, আর সকলেই সত্যবাদী যুধিষ্ঠির, এই তো?

অন্যমনস্ক ছিল বলেই বোধ হয় প্রথমে সে সুকন্যাকে দেখতে পায়নি। হঠাৎ

তার চমক ভাঙল। আর চমক ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের ওপর একটি বিপদের পূর্বাভাস সূচিত হ'ল। কিন্তু নিজেকে সে সামলে নিয়ে বলল: অর্থাৎ ?

সুকন্যা রবীনের সামনে এগিয়ে গিয়ে বলল: সেদিন রাত্রে আমার খুব মাথার যন্ত্রনা হচ্ছিল, আপনার ওষুধ খেয়ে সেরেছে। বলি, কদ্দিন ডাক্তারি করছেন, য়্যাঁ!

সে কথার উত্তর না দিয়ে রবীন বলে: ইস্, কি করেছেন ? আপনার শরীর খারাপ; এই রঙ নিয়ে মাতামাতি করলে....

কথাটা শেষ করতে পারল না রবীন। মাঝপথে একতাল আবির এসে ছিটকে পড়ল তার মুখের ওপর।

আততায়ীকে ঘায়েল করে বীরদর্পে দাঁড়িয়ে রইল সুকন্যা; তারপর একটু ধমকে বলল: খুব হয়েছে। আর ডাক্তারি করতে হবে না।

রবীন হেসে জিজ্ঞাসা করল: আপনার বাবা কোথায় ?

সুকন্যা ঝপ করে তার পাশে বসে পড়ে বেশ কিছুটা ঝাঁঝের সঙ্গেই বলল: আজকাল দেখছি, আমার চেয়ে আমার বাবাকেই বেশী আমল দিচ্ছেন।

হ্যাঁ; তা ঠিক। জানের ভয় তো একটা রয়েছে।

আপনি একটা কাওয়ার্ড।

কী, কী ?

বাংলা ভাষায় যাকে বলে কাপুরুষ।

রবীন একটু হেসে বলে: তা ঠিক।

সমীরণ আপনার চেয়ে অনেক বেশী গ্যালাণ্ট।

সহজ সমর্থনে ঘাড় নড়ে উঠল রবীনের: সেটাও সত্যি।

সুকন্যা চুপ করে রইল একটু। তারপরে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল: ডাক্তার, না, ছাই।

রবীন একটু হেসে ফেলল: ভেবে দেখছি, আপনার কথা মিথ্যে নয়।

মাথাটা ঘুরিয়ে বড় বড় চোখ দুটো দিয়ে একটু ফ্যাল ফ্যাল করে রবীনের দিকে তাকিয়ে রইল সুকন্যা। তারপর স্বরে কিছুটা প্রশ্নাত্মক বিস্ময় জড়িয়ে বলল: সবই সত্যি ? তাহলে মিথ্যে কোনটা ?

অনায়াসে স্বাচ্ছন্দ্যে রবীন বলল এবার: আমার সম্বন্ধে আপনি শীলাকে যা বলেছেন।

হঠাৎ বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল সুকন্যা। সামনের পাতাঝরা বকুল গাছের ডালে বসে একটা কোকিল তখন গলা ছেড়ে মনের আনন্দে গান ধরেছে। পাশ থেকে একটা ছোট পাথর কুড়িয়ে নিয়ে সেই কোকিলটার দিকে ছুঁড়ে দিল সুকন্যা; তারপর ঘাড় বাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করল : কী বলেছি?

আমি নাকি মিথ্যেবাদী; আমি নাকি আশ্রমের কোন মহিলা অতিথির পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াই। আর....

আর....?

আর কি বলছেন তা আমি জানি নে। কিন্তু সেগুলি যে মিথ্যা তা আপনি জানেন।

আবার চুপ করল সুকন্যা। কিছুক্ষণ নখ দিয়ে কচি ঘাসের শিস ছিড়ল। তারপর বলল : বলেছে বুঝি?

স্বরে কিছুটা দার্শনিকতার ছোঁয়াছ মাখিয়ে রবীন উত্তর দেয় : বললেই বা কী? না বললেই বা কী? ওসব গ্রাহ্য করি নে আমি।

সুকন্যা এবার বিস্ময়ে ফেটে পড়ল : তাই বুঝি? জগতে আপনি কাউকেই গ্রাহ্য করেন না?

না।

ভাল করে ভেবে দেখুন।

ভেবে দেখেছি।

প্রশ্নটাই আবার করল সুকন্যা : কাউকেই গ্রাহ্য করেন না?

না।

বাবাকে?

এবার হো হো করে হেসে উঠল রবীন : হ্যাঁ। আপনার ঐ বাবা ছাড়া।

যেন বিষম একটা অস্বস্তির পাষানভার নেমে গেল সুকন্যার বুক থেকে। সে দুটি হাতের চেটো এক সঙ্গে ঘষে যেন ময়লা পরিষ্কার করছে এইভাবে বলল : যাক বাবা, বাঁচা গেল। আপনিও তাহলে মিথ্যা কথা বলেন।

কি আশ্চর্য! মিথ্যা কথা বলব না কেন! নিশ্চয়ই বলি।

আর একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলল সুকন্যা : সত্যিই তো, মিথ্যা কথা বলবেন না-ই বা কেন? মানুষের জীবনটাই তো একটা মিথ্যার মহাভারত।

রবীনকে এবার ঘাড় নাড়তে হয় : জীবন মিথ্যা নয়; সত্য। আর সেই সত্যকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে মাঝে-মাঝে প্রয়োজনে মিথ্যা কথা বলতে হয়।

তাহলে আপনার সঙ্গে আমার পার্থক্যটা কোথায় ?

একটু হাসে রবীন ; বলে : আপনি স্বীকার করেন না, আমি করি।

অর্থাৎ, আপনি পুরোমাত্রায় মধ্যবিত্ত আর দাম্ভিক।

ঐ বলে আপনি যদি আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চান তো করুন। আমার আপত্তি নেই কোন। আমার কথা যদি বলেন, তাহলে যা স্বাভাবিক, এবং অবশ্য করণীয় তাকে বিকৃত করে তথাকথিত সুনাম কেনার হেংলামি বরদাস্ত করা আমার পক্ষে কষ্টকর।

সুকন্যার জবাব এল : আমরা যে সত্য কথা বলতে চাই নে অথবা পারি নে সেকথা আমরা সবাই জানি ; কিন্তু পাছে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যায় এই ভেবে পারতপক্ষে আমরা এ জিনিষটি নিয়ে হৈ চৈ করতে চাই নে। বাইরের শালীনতা বজায় রাখাটাই আধুনিক সভ্যতার ধর্ম। আধুনিক যুগে বাস করে আপনি পাঁচশ বছর আগের জগতে ঘুরে বেড়াবেন সেটা স্বাভাবিকও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়।

কিন্তু তাই বলে তা নিয়ে গর্ব করার কিছু নেই। তবু বিশ্বাস করুন, সেদিন আপনাকে অপমান বা অপদস্থ করার এতটুকু ইচ্ছা আমার ছিল না। আমি সেদিন কেবল এই কথাটাই ভেবে আশ্চর্য হয়েছিলাম যে আপনি কেবল মিথ্যা বলতেই পটু নন, কারও স্পষ্ট উক্তি সহ্য করার মতও শক্তি নেই আপনার।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল সুকন্যা : কিন্তু তাই বলে আমাকে আপনি ঘৃণা করতে পারেন না, কোন অধিকার নেই আপনার।

রবীন চেয়ে দেখল সুকন্যার দিকে। সেখানে আবিরে মাখান মুখটির ওপর একটি সজল কাল মেঘের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। এখনই অতর্কিতে বর্ষণ সুরু হতে পারে।

সে তাড়াতাড়ি বলল : সে কি কথা ? আপনাকে ঘৃণা করব কেন ?

বড় বড় চোখ মেলে নিতান্ত অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে রবীনের দিকে চেয়ে রইল সুকন্যা : ফের মিথ্যা কথা ! করেন না আবার !

মিথ্যা নয়, সত্য।

আপনার মুখ দেখে বুঝতে পাচ্ছি যে কথাটা মিথ্যে।

রবীন ভাবে এত বড় বিপদেও মানুষ পড়ে ? নারীজাতিকে তার সব সময়েই মনে হয় একটি আদিম, অনাবিষ্কৃত অরণ্যের মত। দূর থেকে যাকে স্পষ্ট আর সহজ বলে ভাবা যায়, আসলে সেটি বিরাট অস্পষ্ট আর সর্পিল। সুকন্যা কিছুতেই

বুঝতে চায় না যে সে এইমাত্র যা বলেছে সেটি তার মুখের কথা নয়, ভদ্রতা-ভব্যতার কথা নয়, একেবারে নির্ভেজাল সত্য কথা।

পুনরাবৃত্তি করতে হল রবীনকে: না, সত্যি কথা।

সুকন্যা মুখ ঘুরিয়ে তবু গজগজ করে: মিথ্যে কথা বলার আর জায়গা পেলেন না! আমি যেন কিছু বুঝি নে!

শেষ পর্যন্ত তিতিবিরক্ত হয়ে সুকন্যার ঘাড় ঘুরিয়ে দিলে রবীন; তারপর চটে বলল: বলছি, তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে, তবু বিশ্বাস হচ্ছে না?

আঃ! ছাড। মিথ্যেবাদী কোথাকার।

না, ছাড়ব না। আগে বল, সত্যি কথা বলেছি।

এতদিন বল নি কেন?

রবীন অবাক হয়ে সুকন্যার চোখে চোখ রেখে বলে: কী বলি নি?

যে মিথ্যা কথা বলতে তুমি আমার গুরুদেব?

সুকন্যাকে ছেড়ে দিলে রবীন। মেয়েটার মাথার মধ্যে ঘি বলে কোন পদার্থ নেই। কেবল বালি আর কাঁকরে বোঝাই।

রাগ করে বলল: বেশ তাই। খুশি হ'লে তো?

কোন জবাব দিল না সুকন্যা। উঠে দাঁড়াল। ঝাঁকানি দিয়ে ঘাড়ের চুলগুলিকে ঠিক করল। কী যেন ভাবল একটু। তারপর ঝোলার ভিতর থেকে একটা কুঙ্কুমের পুঁটলি বার করে ধাঁ করে রবীনের মাথায় সেটি ফাটিয়ে দিয়েই খিল-খিল করে হাসতে-হাসতে দৌড় দিলে আশ্রমের দিকে।

অকস্মাৎ এবং অতর্কিত। বড় জোর কুঙ্কুম ছুঁড়েছিল সুকন্যা। মাথায়, চোখে মুখে তাই ছত্রাকার হয়ে ঝরে-ঝরে পড়লো। একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল রবীন। দূরে একজন কে যেন গাইছে তখন:

নয়নো মে আবীর
না ডালো রে
শ্যামসুন্দর গিরিধারী।

চোখ মুছে সামনের সেই বকুলগাছটার দিকে চেয়ে দেখল রবীন। ছন্নছাড়া কোকিলটা তারই দিকে চেয়ে মনের আনন্দে ডেকে চলেছে তখনও।

ডাক্তারবাবু আছেন ?

কে ?

অতিথিভবনের আওতা ছাড়িয়ে হাসপাতালের একটি ঘরেই বাসা বেঁধেছে রবীন। রাত্রি প্রায় এগারটার কাছাকাছি। সমস্ত দিনের বিভিন্নমুখী উৎসবের উচ্ছাসে সে যে কেবল ক্লান্ত তাই নয়, বিপর্যস্তও বটে।

মুখ তুলে দরজার দিকে চেয়ে দেখল রবীন। শীলা দাঁড়িয়ে।

ভিতরে আসুন।

শীলা ভিতরে এল। সন্ধ্যেবেলার আগুনে শাড়িটা এখন আর নেই; তার পরিবর্তে একটা ফিকে নীলচে রং-এর শাড়ি পরেছে শীলা। একটি মাত্র আলো জ্বলছে; তারও জেল্লা বড কম।

তন্দ্রাতুর রবীনের দিকে চেয়ে শীলা বলল: আপনি বড ক্লান্ত। আমি যাই এখন।

ইজি চেয়ারটার ওপর সোজা হয়ে উঠল রবীন: ভিতরে আসুন। বসুন।

ভিতরে এসে একটি চেয়ারের ওপর বসল শীলা।

ভীষণ মাথার যন্ত্রনা হচ্ছে, ডাক্তার বাবু। রগটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে।

শীলা নিজের হাত দিয়ে রগদুটো চেপে ধরল।

এতক্ষণে হয়ত রবীনের চোখের জড়তা কেটে উঠল। শীলার মুখের দিকে চেয়ে রইল সে। চোখ দুটি ফোলা-ফোলা লাগছে একটু। মুখটা ভারি, থমথমে। হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হওয়ার পর গাছের পাতাগুলি যেমন ভিজে-ভিজে দেখায় সেই রকম।

ভাল করে পরীক্ষা করার জন্যেই হয়ত সে ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল; তারপর ঘরের আর একটি আলো জ্বেলে দিলে। সেই জোরাল আলোতে শীলার মুখের দিকে চেয়ে বলল: এখন বিশ্রাম দরকার আপনার। সমস্ত দিনই আপনার পরিশ্রম গিয়েছে। অতটা পরিশ্রম না করলেই পারতেন।

হঠাৎ চটে উঠল শীলা। বলল: কী করলে পারতাম, আর কী করলে না পারতাম, সে সম্বন্ধে উপদেশ নিতে তো আসি নি। যে জন্যে এসেছি তার কিছু করতে পারেন কিনা দেখুন। না হলে চলে যাই।

বিস্মিতই হল রবীন। এই কয়েকটি মাসের মধ্যে কোনদিনই সে শীলাকে

রুক্ষ হতে দেখে নি। সুতরাং, হয় মাথার যন্ত্রনাটি সত্যসত্যই তার সহ্যের সীমানার বাইরে চলে গিয়েছে, নতুবা কোন জায়গায় কোন একটি বিশেষ উত্তেজনার কারণ ঘটেছে। ব্যাপারটি একটু ভাল করে অনুধাবন করার জন্যেই বোধ হয় শীলার দিকে চোখ ফেরাল রবীন। দেখল, শীলা চেয়ারে হেলান দিয়ে পড়ে রয়েছে। সন্ধ্যাবেলাতে সমবেত ভদ্রমণ্ডলির সপ্রশংস দৃষ্টি আর অজস্র করতালির মধ্যে চারপাশে আগুনের আবরণে নৃত্যময়ী যে-শীলাকে প্রজ্জ্বলন্ত শিখার মতই মনে হয়েছিল তার, সে-শীলা এ নয। এই কিছুক্ষণের ভিতরেই সেই আগুন শুকিয়ে ফ্যাকাসে হযে গিযেছে।

খুব যন্ত্রণা হচ্ছে ?

তা না হলে এত রাত্রে কি আপনার সঙ্গে গল্প করতে এসেছি ?

রবীন শান্তভাবে বলল : সে কথা বলছি না। তবে ওষুধ দেওয়ার আগে রোগের সম্বন্ধে ডাক্তারের কিছু জানা দরকার।

বললাম তো, মাথায যন্ত্রনা হচ্ছে।

রবীন দু'পা পিছিয়ে এসে বলল : ঘুমোগে যান।

উঠে পড়ল শীলা ; বলল : ঘুমোতে পারলে আর এতরাত্রে ওষুধ চাইতে আসব কেন ? ডাক্তার না ছাই। ফাঁকি দিয়ে কেবল পয়সা নিয়ে যাচ্ছেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল শীলা, তারপর হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বলল : আর সবাই যখন মজা লুটছে, তখন আপনিই বা বাদ যাবেন কেন ?

দরজার দিকে পা বাড়াল শীলা।

রবীন চট করে তার প্রসারিত হাতটি ধরে ফেলল ; তারপর ভিতরের দিকে একটু টেনে বলল : বসুন। আমাকে আপনি যত খুশি গালাগালি দিতে পারেন, কিন্তু তাতে আপনার অসুখ সারবে না।

কোন কথা না বলে একটা চেয়ারে বসে পড়ল শীলা।

এক গ্লাস জল, আর একটি ট্যাবলেট তার সামনে এগিয়ে দিলে রবীন। শীলা ট্যাবলেটটি খেয়ে নিয়ে বলল : কতক্ষণ লাগবে কমতে ?

সেটা নির্ভর করবে আপনার ধৈর্যের গভীরতা আর রোগের প্রকৃতির ওপর।

খুব গম্ভীর হয়েই কথাটা বলল রবীন ; ডাক্তার ঠিক যেভাবে রোগীর সঙ্গে কথা বলে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সহজ হয়ে এল শীলা: বলল: আপনার ডাক্তার না হয়ে অন্য কিছু হওয়া উচিত ছিল।

যথা?

এই ধরুন, কবি কিংবা দার্শনিক।

রবীন আর একটু গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলে: মানুষের বৃত্তি নিয়ে ঠাট্টা করছেন আপনি। এর ফল কিন্তু বিষময়।

একটু হেসে শীলা জবাব দেয়: তাই নাকি?

ঘাড় নাড়ে রবীন: হ্যাঁ। আমি যদি বলি, সন্ধ্যাবেলা ওরকম অগ্নিনৃত্য দেখানো আপনার উচিত হয় নি, অথবা আপনাদের আজকের প্রধান অতিথি ভারতের সেরা চোরা কারবারি শেঠজির কোটের বুকে অমন সুন্দর নিষ্পাপ গোলাপ ফুলটি পিন দিয়ে এঁকে দেওয়া আপনার পক্ষে গর্হিত কাজ হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি—কী উত্তর দেবেন আপনি?

সত্যিই কোন উত্তর দিতে পারল না শীলা। কিছুক্ষণ মুখ নিচু করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে মুখ তুলে বলল: আপনি জানেন, আপনার সঙ্গে আমার তফাৎ অনেক। তবু, ঐ কথাটা বারবার কেন জিজ্ঞাসা করেন বুঝতে পারি নে। আমরা দেবদাসী। দেবতাদের আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করাটাই আমাদের জীবিকা।

রবীনের মুখের ওপর একটি ব্যঙ্গের বিজলি চিকচিক করে উঠল হয়ত: তাই বুঝি? তা, এ আশ্রমে দেবতা আর উপদেবতা মিলে তো কম নেই দেখছি। সকলকেই কি আনন্দ দিতে হয়?

প্রয়োজন হলে দিতে হয় বইকি?

আর কোন কথা না বলে ঘরের মধ্যেই পায়চারি করতে লাগল রবীন। যেন ঠিক এই কথাটিই শীলার কাছ থেকে সে আশা করে নি। কিন্তু কেন করে নি তা সে কিছুতেই বুঝতে পারল না।

আপনি এখান থেকে চলে যেতে পারেন না?

রবীন এবার কঠোর সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

না।

কেন জানতে পারি?

নিষ্প্রয়োজন।

অর্থাৎ আত্মহত্যা না করলে নিস্তার নেই আপনার?

এক হিসাবে। কিন্তু সব চেয়ে মজার কথা হচ্ছে, আমি এখানে আত্মরক্ষা করতে এসেছি, আত্মহত্যা করতে নয়।

শীলার স্বরে আবার একটা নির্মম রুক্ষতা আত্মপ্রকাশ করল। রবীনের চিন্তাধারাতেও সেই সঙ্গে কিছুটা জট পাকাল। অদ্ভুত প্রকৃতি মেয়েটির। রবীন যখনই মনে করে শীলার আসল সত্তাটিকে সে স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছে, তখনই সে তার সমস্ত কিছু ধারণাকে বানচাল করে দিয়ে তারই চোখের ওপর একটি প্রহেলিকার সৃষ্টি করে বসেছে।

শীলার স্বরে এবার একটি অপরিসীম ব্যঙ্গের মূর্ছনা টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল : আশা করি, আপনার প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন ?

একটু হেসে উত্তর দিলে রবীন ; জবাব দেওয়ার জন্যে যে আপনি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তা তো মনে হচ্ছে না।

এক হিসাবে কথাটি সত্যি।

কারণ ?

মানুষ কেবল অন্যের জবাব-ই চেয়ে এসেছে চিরকাল। অন্যের জন্যে জবাব-দীহি করেনি কোনদিন। আচ্ছা, এখন চলি তাহলে। ধন্যবাদ।

রবীনের কাছ থেকে কোন উত্তর আসার আগেই তীর বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল শীলা। ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিল রবীন।

হি হি করে হাসতে হাসতে হাজির হল রজনী কমপাউণ্ডার।

মেয়েটাকে তাড়িয়ে দিয়ে ভাল করেছেন, স্যার।

একেই বলে, ভগবানের মার। চোখ বুজতে গিয়ে বিষম খেল রবীন। তারপর হাঁ করে চেয়ে রইল আগন্তুকটির দিকে।

ও-মেয়ে সামান্য নয়, স্যার। একেবারে পর্তুগীজ ফিরিঙ্গী।

প্রথমে আশ্চর্য হয়েছিল রবীন ; এবারে আঁৎকে উঠল : কী যে বলেন ছাই, মাথামুণ্ডু বুঝি নে।

রজনী কমপাউণ্ডার মাথা নেড়ে বলে : বুঝবেন স্যার, সবই বুঝবেন। একে নতুন, তার ছেলেমানুষ। আমি কিন্তু বাবা শেয়াল ধূর্ত। কে কোন্ তালে ঘুরে বেড়ায় সব আমার মুখস্ত। আমি জানিনে কী ?

যথেষ্টই বিরক্তি হয়েছিল রবীন ; তবু সোজা হয়ে বসল। একটু চ'টেই জিজ্ঞাসা করল : কী জানেন আপনি ?

যদি আদেশ করেন, বলতেই হবে আমাকে। হাজার হ'ক আপনি আমার "বশ"।

দীর্ঘগ্রীব, তীক্ষ্ণচঞ্চু, স্ফুরিতনাসা এই মানুষটিকে কোনদিনই সে ভাল নজরে দেখতে পারেনি। লোকটির কোথায় যেন একটি অপরিসীম ক্লেদপঙ্কের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে।

রজনী কমপাউণ্ডার হয়ত রবীনের ভাবান্তর লক্ষ্য করল না; অথবা লক্ষ্য করেও গ্রাহ্য করল না; নিজের ভাবের আবেগে মাতোয়ারা হয়ে বলে চলল: ঐ তারাদাস ব্রহ্মচারি আপনাদের। ভীষণ এলেমবাজ লোক, স্যার। ওর কাজই হ'ল, পয়সাওয়ালা মানুষদের পাকড়িয়ে এখানে এনে ছেড়ে দেওয়া। ব্যস, বাকি সব কাজ ঐ শীলা লাহিড়ীর। মেয়েটা ভেল্‌কী জানে, স্যার। বড় বড় রুই-কাতলা কাৎ হয়ে গেল। অমন যে জাঁদরেল শেঠজি, সেও শেষ পর্যন্ত কুপোকাৎ।

রবীন তো একেবারে থ।

ব্যাখ্যা করল রজনী কমপাউণ্ডার: শেঠজি একটি ছবি তুলছেন। শীলাকে দেখে বেশ পছন্দ হয়েছে তাঁর। হিরোইন করবেন। টাকা দেবেন বিশ হাজার। আর শীলাকে পেলে আশ্রমের জন্যে তিনি দুলাখ টাকার দান খয়রাত করতে রাজি রয়েছেন।

রাগ আর বিতৃষ্ণা কেটে গিয়ে আবার বিস্ময় দেখা দিয়েছে রবীনের মুখে। বলেন কি?

রজনী কমপাউণ্ডার আক্ষেপ করে বলে: কী আর বলব, স্যার! আমরা সারা মাস হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে পঞ্চাশটি টাকা পাই; আর ঝোলায় বিশ হাজার টাকা নিয়ে তারাদাসের কাছে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন শেঠজি। দুনিয়াটা এমনি বেইমান, বুঝেছেন।

কাঁটাটা রজনী কমপাউণ্ডারের কোথায় বিঁধছে, এতক্ষণ পরে যেন তার কিছুটা হদিস করতে পারল রবীন।

রজনী কমপাউণ্ডার বলে গেল: তারাদাস জহুরী, স্যার। মানুষ চিনতে ওর জোড়া আর নেই। তা না হলে, রেসকিউ হোমে এত লোক থাকতে বেছে-বেছে ঐ মেয়েটিকেই বা নিয়ে এল কেন বলতে পারেন?

তথ্য উদ্‌ঘাটন নয়, বলা যেতে পারে একটি বোমশেল। রবীনকে আজ সত্যিই বড় দুশ্চিন্তায় ফেললে রজনী কমপাউণ্ডার। এই ক'মাসে শীলাকে সে অনেকবার দেখছে; কিন্তু তার এমন একটি কাজও নজরে পড়ে নি যা থেকে তার ওপর মানুষের ঘৃনা জন্মাতে পারে।

হঠাৎ সতর্ক হ'ল রবীন ; একটু বিরক্ত হয়েই বলল : থাক রজনীবাবু, ওসব নিয়ে আর আলোচনা করে লাভ নেই। আপনি এখন আসুন। আমি বড় ক্লান্ত আজ।

রজনী কমপাউণ্ডার একটু থতমত খেয়ে গেল ; কয়েক সেকেণ্ড দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকাল ; তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

রজনী কমপাউণ্ডার চলে গেল বটে, কিন্তু ততক্ষণে তার যতটা ক্ষতি হওয়ার দরকার প্রায় ততটাই হযে গিয়েছে। ঘুম আর জড়তা কেটে গিয়ে তার মাথার মধ্যে একটি দারুণ অস্বস্তি জেগে উঠেছে। রজনী কমপাউণ্ডারের সত্য ভাষণে কতখানি জল রয়েছে সেটি নির্ধারণ করা সময় সাপেক্ষ হলেও, রবীন এ-কথাটি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারল না যে আশ্রমটির সমস্ত কিছু শৃঙ্খলার মধ্যে কোথায় যেন একটি চরম বিশৃঙ্খলা ওৎ পেতে বসে রয়েছে। কিছুতেই সে তার নাগাল পাচ্ছে না।

বন্ধ ঘরের হাওয়াটা সহ্য করা ক্রমশ কষ্টকর হয়ে উঠল তার পক্ষে। সে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

কতক্ষণ সে একা-একা নিশীথ রাত্রির ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে বেড়িয়েছে খেয়াল নেই তার, হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল আশ্রমের নির্জন পথ বেয়ে একটি নারীমূর্তি তার দিকে এগিয়ে আসছে।

রবীন বাবু?

চাপা, অস্পষ্ট, আতঙ্কিত সে স্বর।

মিস লাহিড়ি ?

ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়াল শীলা।

আপনার তো এখন ঘুমানোর কথা, মিস লাহিড়ি।

শীলা বলল : লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি।

কেন ?

আপনার কাছ থেকে বিদায় নিতে।

কোথায় যাচ্ছেন ?

আপাতত বম্বে। শেঠজির নতুন ছবিতে হিরোইনের পার্ট আমাকে ছাড়া আর কাউকে দিয়েই হবে না।

বলেন কি ?

শেঠজি এবং তারাদাস ব্রহ্মচারি দুজনেই এ-বিষয়ে একমত। আর তা ছাড়া,

আমি এতদিন আশ্রমের খেয়েছি, পরেছি, তারাদাস ব্রহ্মচারি বিপদের দিনে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমারও তো একটা কর্তব্য রয়েছে।

ঘাড় নেড়ে মন্তব্য করল রবীন : আপনার কথার কিছুই বুঝলাম না।

শীলা একটু হেসে বলল : আপনার দোষ নেই, ডঃ দত্ত। তারাদাস ব্রহ্মচারি যা বুঝতে পারেন, আপনার আমার মত সধারণ মানুষে তা পারে না।

কিন্তু যা বুঝতে পারেন না, তাই বা আপনি করতে যাচ্ছেন কেন ?

নীতি আর জীবন এক নয়, ডঃ দত্ত।

অর্থাৎ, আপনি বাধ্য হচ্ছেন ?

আপনার অনুমান সত্যি।

সদানন্দদেব কী বলেন ?

এখনও কিছু বলেন নি তিনি।

কিছু বলার, অর্থাৎ আপনার বিষয়ে, প্রয়োজন হলে, হস্তক্ষেপ করার কিছু রয়েছে কি তাঁর ?

গুরুদেবের সম্বন্ধে কোন কিছু চিন্তা করার অধিকার আমাদের নেই।

ওটাতো আইন-শৃঙ্খলার কথা, মিস লাহিড়ি।

শীলা একটু হেসে বলল : ও-ছুটিই এখানকার সব চেয়ে বড় জিনিষ, রবীনবাবু।

আর কোন কথা না বলে ভাবতে লাগল রবীন। তার মনে পড়ল চম্পার কথা, রজনী কমপাউণ্ডারের সাবধান বাণী।

হঠাৎ বলে উঠল শীলা : আমাকে উদ্ধার করতে পারেন ?

কোথায় যেতে চান ?

যেখানে হ'ক ; কেবল এই আশ্রম ছেড়ে।

কখন ?

এখনই, এই মুহূর্তে।

কার্য-কারণের মধ্যে সামঞ্জস্যহীন দ্রুততা মুহ্যমান করে দিলে রবীনকে। এই আশ্রমটি তার কাছে এখনও গভীর অরণ্যানীর মত সুদুর্গম। শীলাকে ঠিক এই অবস্থায় কোথাও নিয়ে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব কি না, তার চেয়েও বড় কথা, উচিত কি না, এই চিন্তাই তাকে সবচেয়ে বেশী দ্বিধান্বিত করল।

কিন্তু হ্যাঁ, কিংবা না, কোন একটি সমাধানে উপস্থিত হওয়ার আগেই ও-পাশ থেকে উত্তর ভেসে এল : আচ্ছা, থাক।

তারপরেই বিদ্যুতের গতিতে অন্ধকারের অন্তরাল দিয়ে একটি অশরীরীনীর নিঃশব্দ পদসঞ্চার অন্তর্হিত হ'ল। আর ঠিক সেই সঙ্গেই তার মনে হ'ল কে যেন একটি ঠাণ্ডা কনকনে চাবুক দিয়ে তাকে কষিয়ে দিয়ে গেল। সমস্ত ঘটনাটি এমন একটি দ্রুততার সঙ্গে ঘটে গেল যে কিছুক্ষণ সে অনড় হয়েই দাঁড়িয়ে রইল। সামান্য কিছু চিন্তা করার শক্তিটুকুও তার লোপ পেয়ে গেল বুঝি বা।

১৭

ঠিক এই সময়টির জন্যেই যেন অপেক্ষা করে বসেছিল ওরা। কিন্তু কেউ ওদের লক্ষ্য করে নি। করার উপায়ও ছিল না। একপাশে দোল উৎসবের প্রচণ্ড উচ্ছাস; আর একপাশে আশ্রমের বাইরে বিরাট একটি মেলার সমাবেশ। অনেক দূর থেকে অনেক লোক এসেছে ওরা। মরা দামোদরের কঙ্কালটি পেরিয়ে, কংসাবতীর খাল পাশে ফেলে, রোদে পুড়ে ধুঁকতে-ধুঁকতে লোক এসেছে। সারানপুরের ঝাঁপি-মেলায় ঝাঁপ ফেলে, পাহাড় ঝাঁপিয়ে, বন-ডাঙা-আবাদা-জঙ্গল ডিঙিয়ে বন্যার আবেগে অজস্র মানুষের ঢল নেমেছে এইখানে। তিনদিনের পথ ওরা অতিক্রম করেছে একদিনে, দেড়দিনে। মেয়ে-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ, কেউ আজ আর বাড়ীতে বসে থাকার বান্দা নয়। এই মেলার সঙ্গে ওদের ছ-টি মাসের দিন-চলার প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে। সঙ্গে নিয়ে এসেছে যে যার সম্বল। এসেছে গরু, মহিষ, ছাগল, হাঁস, মুরগী। নানান রকমের পাখীর দল খাঁচার মধ্যে কিলবিল করছে। বিকিকিনির হাটে কেউ আজ আর পিছিয়ে নেই।

জনসমাবেশটি যে এতটা বিরাট হবে তা বোধ হয় কেউ কল্পনাই করতে পারে নি। তবু এখনও সব এসে পড়ে নি। এখনও কেউ পথে, কেউ বাড়ীতে। জনসংখ্যা অকস্মাৎ প্রায় দ্বিগুন বেড়েছে বলেই বোধ হয় জনস্বাস্থ্য রক্ষার অথবা আকস্মিক কোন মহামারির বিরুদ্ধে যথোচিত সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। আশ্রমের যাঁরা খাস অতিথি তাঁদের জন্যেই কিছুটা ব্যবস্থা হয়েছিল; কিন্তু অতিথি-অভ্যাগতদের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে-ব্যবস্থাটিও নগন্য বলে বিবেচিত হ'ল। সরকার পক্ষ থেকে এবারেও কিছু সাহায্য এসেছে; কিছু মানুষ, কলেরা বসন্তের কিছু প্রতিশেধক, আর সেই সঙ্গে সাধারণভাবে স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় সম্বন্ধে মানুষকে ওয়াকিবহাল করার জন্যে কিছু ছাপান বুলি।

আনন্দ, উত্তেজনা, আর হৈচৈ-এর মধ্যে মেলাটি সবে সুরু হয়েছে, হঠাৎ কলেরার বীজ ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে।

সাধারণের কথা ছেড়েই দিলাম, যাদের ওপর সমস্ত কিছু লক্ষ্য করার দায়িত্ব রয়েছে তাদেরও নজর পড়ে নি এদিকে। তারাদাস তাঁর বিরাট অফিস ঘরে বসে লোকজন নিয়ে মেলাটিকে পরিচালনা করেছেন; রবীন তার নিয়ম মাফিক রোঁদে বেরিয়েছে; মেডিক্যাল য়্যুনিটের ছোকরারা তাস খেলে কাটিয়েছে, আবগারি বিভাগের লোকেরা স্মাগলারদের সঙ্গে একটা আপোষ করার তালে ঘুর-ঘুর করেছে। কেউ লক্ষ্য করে নি এদের, একমাত্র রজনী কমপাউণ্ডার ছাড়া।

সেদিন দুপুরে নিজের ঘরটিতে বসে রবীন মেডিক্যাল জার্ণালের পাতা উল্‌টোচ্ছিল, রজনী কমপাউণ্ডার দরজার সামনে এসে মাথা চুলকোতে লাগল।

রবীন মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল: কী ব্যাপার, রজনীববাবু?

রজনীবাবুর চোখ দুটি লালিম হয়ে উঠেছে। রবীনের বুঝতে এতটু কষ্ট হল না যে এরই মধ্যে বেশ কিছু লাল পানি উদরস্থ হয়েছে তার।

স্যার, উনি এসেছেন।

কে?

আজ্ঞে উনি।

রজনীবাবুর স্বরে কিঞ্চিৎ জড়তা ছিল। সে রবীনের বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে বলল: আজ্ঞে স্যার, ঐ আপনার কলেরা।

তার কথা বলার ধরণ দেখে হাসতে গিয়ে হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল রবীনের স্বর: কি! কলেরা? কোথায়?

যেথানে আসার, স্যার। মেলায়।

তারাদাস ব্রহ্মচারি জানেন?

বলেছি তো স্যার। কিন্তু ও-মালকে বোঝান আমার কম্ম নয়। তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলে আমাকে।

চলুন তো দেখি।

মেলার উত্তর-পূর্ব কোনে একটি কৃষ্ণচূড়ার ছায়ার নিচে একটি দশ বার বছরের ছেলে শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছে। চারপাশে মলমূত্রের ছড়াছড়ি। ছেলেটির হাতে তখনও একটি মিঠাই। তার চারপাশে জন দশেক দেহাতি দরিদ্র মেয়ে পুরুষ বসে-বসে তেলেভাজা সিঙাড়া আর বাসি মিঠাই পরম পরিতৃপ্তি ভরে খাচ্ছে। বড়-বড় মাছিতে থিক থিক করছে চারপাশ। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তাদের।

ছেলেটিকে দেখেই রবীন বুঝতে পারল রজনী কমপাউণ্ডারের অনুমান। ঠিক

আর বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে পুরোমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠলো। সেদিন কেবল ছেলেটিকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আর তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেই সে থেমে যায় নি, তন্ন তন্ন করে মেলার একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছিল। একটি নয়, কয়েকটিরই কলেরা হয়েছে। আপৎকালীন ব্যবস্থার জন্যে মেলার একেবারে প্রান্তদেশে আশ্রমিক সংঘের উদ্‌যোগে যে কিছু হোগলার ঘর তৈরি করা হয়েছিল সেইগুলির প্রায় অর্দ্ধেকই ভরে গেল রোগীতে প্রথমে চারদিনে। রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। প্যানিক সৃষ্টি হলে মেলা ভেঙে যাওয়ার কিছুটা সম্ভাবনা রয়েছে বলেই তারাদাসের দল এ বিষয়ে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেছে। দিঘীর পাশে কড়া পাহারা বসেছে, সিরাম হাতে নিযে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ছোটাছুটি করেছে; পুলিশের লোক রাত্রিতে কলেরা অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি থেকে বাসি আর পচা খাবার নষ্ট করে ফেলেছে। স্বাস্থ্যরক্ষার প্রাথমিক সাহায্য দেওয়ার জন্যে মেডিকেল য়্যুনিটের লোকেরা রবীনের নির্দেশমত ছোটাছুটি করতে দ্বিধা করেনি এতটুকু।

আরও তিন দিনে আপৎকালীন ঘরগুলি সব ভর্তি হয়ে গেল। এই সাত দিনে লোক মরল প্রায় জন পঁচিশেক। বাইরের এই দুঃসংবাদ বেড়া ডিঙিয়ে আশ্রমের মধ্যে হাজির হয়েছে। ফলে এখানেও একটা অস্থিরতা দেখা দিয়েছে।

আচার্যদেব সেদিন রাত্রিতে তারাদাস আর রবীনের সঙ্গে মন্ত্রনায় বসলেন। একটু বেশী তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়া স্বভাব রবীনের। তারাদাসের গতি ঠিক উলটো। আকর্ষণ আর বিকর্ষণ সমান শক্তিধর হলে ব্যাপারটি যা দাঁড়ায় এক্ষেত্রে অবস্থাটি প্রায় সেই রকমই দাঁড়াল।

আজকে তাই রবীন তার সমস্ত কিছু বক্তব্য সোজাসুজি পেশ করতেই এসেছে। সে বলল: অবস্থা যাতে আয়ত্বের বাইরে চলে না যায় তার জন্যে চাই প্রচুর স্যালাইন, কলেরার ইনজেকশন, স্যানিটারি ব্যবস্থা, আর সেচ্ছাসেবক বাহিনী। আর সব শেষে চাই, এই বিরাট জনতার পরিকল্পিত অপসারন।

তারাদাস একটু হেসে বললেন: অর্থাৎ আপনি মেলাটি ভেঙে দিতে বলছেন। কিন্তু তা সম্ভব নয়। কারণ মেলাটি এই সবে সুরু হয়েছে। এই মেলা দুটি মাস চলার কথা। তিন সপ্তাহ পর থেকেই আসল মেলার সুরু। ঠিক এই সময় মেলা ভেঙে দিলে আশ্রমের প্রায় তিন লাখ টাকার মত ক্ষতি হবে। আমার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এ সময়ে দুদশটা কলেরা প্রাকৃতিক নিয়মেই প্রতি বছর দেখা দেয়। তা নিয়ে এতটা বিব্রত হওয়ার কোন কারণ নেই।

সদানন্দদেব তারাদাসকে সমর্থন করে বলেন : মেলা চালাতেই হবে রবীন। এই অঞ্চলে এই একটাই মেলা। এর ওপর আশে-পাশে বিশ থেকে ত্রিশ মাইল এলাকার লোকে অনেক কিছু নির্ভর করে। তবে কলেরার মত রোগকে ছড়াতে দিলেও চলবে না। সেদিক থেকে যেটুকু ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বলে মনে হয় তা আমাদের করতে হবে।

তারাদাস বললেন : কিন্তু ডঃ দত্তের হিসাব মত ওষুধ আনতে গেলে এখনই অনেক টাকার দরকার। অত টাকা আমাদের নেই।

রবীন একটু উত্তেজিত হয়েই বলল : আমাদের টাকা নেই বলে তো আর মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যেতে পারে না। আমাদের না থাকলে সরকারের কাছ থেকে আনানোর ব্যবস্থা করুন।

তারাদাস এবার একটু হাসলেন, বললেন : সরকারের সাহায্য কতটুকু আমাদের কাজে লাগবে, আর কী করলে সেটি যথাসময়ে আমাদের হাতে এসে পৌঁছবে তার তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়ত আচার্যদেবের রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে এবিষয়ে আমি বিশেষ আশাবাদী নই।

রবীন বলল : আপনি আশাবাদী কিনা জানি নে ; ডাক্তার হিসাবে আমি বলতে বাধ্য যে সাপের সঙ্গে বিনা অস্ত্রে খেলা করতে রাজি নই আমি।

সঙ্গে-সঙ্গে তারাদাসের চোখে তীব্র একটি ব্যঙ্গের বিদ্যুৎ-রেখা খেলে গেল। তিনি একটু হেসে বললেন : সাপকে বশ করার মন্ত্র আমার জানা রয়েছে, ডঃ দত্ত।

আচার্যদেব এতক্ষণ এদের লক্ষ্য করছিলেন। এরা দুজনেই একটি শক্ত লাঠির দুটি দিক ধরে গোঁয়ারের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। লাঠি না ভাঙলে, এদের কেউ স্থানচ্যুত করতে পারবে না।

তিনি রবীনের পেশ করা ওষুধের তালিকার দিকে একবার চেয়ে দেখলেন। তাঁর কপালের ওপর দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। তারপর, তারাদাসের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কী বলতে চাও, তারাদাস?

তারাদাস বললেন : এখনও উদ্বিগ্ন হওয়ার মত কোন অবস্থা আসে নি। গত বছরের তুলনায় এ বছর রোগীর সংখ্যা কম। মাত্র সাতান্নটি। গত বছর এই সময়ে ছিল একশ একুশ।

আচার্যদেব বললেন : তা হলে তো তোকে আরও কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে রবীন। আমার ধারনা, তিনশ লোকের চিকিৎসার মত ওষুধ মজুত রয়েছে।

তাই হবে।

১৮

সেদিন অনেক রাত্রে ফিরে এল রবীন। নতুন কোন অভ্যুপাত না ঘটলে আজকের মত হয়ত তার বিশ্রাম জুটবে। ঘরে ঢুকে হ্যাঙারে জামাটা ঝুলিয়ে রাখল। তারপর আড়মোড়া দিয়ে দেহটাকে একবার টান করে নিলে; হাই তুললে; ইজিচেয়ার এলিয়ে দিলে নিজেকে, তারপরেই লাফিয়ে উঠল।

মিস্টার তালুকদারকে দেখতে যাওয়া হয় নি। আজ তিন চার দিন হল, হার্টের অসুখে তিনি শয্যাশায়ী। আক্রমনটি জোরাল নয়, মৃদু। তবু বর্তমান অবস্থায় যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই সাবধান না হয়ে উপায় ছিল না তার। প্রধান অতিথিভবনের গোলমাল থেকে তাঁকে সরিয়ে আনা হয়েছে। সেবার জন্য পর্যায়ক্রমে দু'টি নার্সেরও বন্দোবস্ত করতে হয়েছে। নড়া-চড়া বন্ধ মিস্টার তালুকদারের। এখন কিছুটা উন্নতির দিকে; এবং উন্নতিটি এইভাবে চলতে থাকলে মাসখানেকের মধ্যেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ভালই রয়েছেন নিশ্চয। না থাকলে, খবর আসত। তবু, কর্তব্যের দিক থেকে, এবেলা একবার দেখতে যাওয়া উচিত ছিল তার। কেবল মিস্টার তালুকদারের জন্যে নয়, সুকন্যার জন্যেও বটে। বিদেশে এইভাবে আটকিয়ে পড়ে ব্যাচারী যথেষ্ট ঘাবড়িয়ে গিয়েছে।

ক্লান্তিতে ভেঙে পড়লেও, সে উঠে দাঁড়াল। হ্যাঙার থেকে জামাটা খুলে নিয়ে নেহৎ যান্ত্রিক ভাবেই মাথাটা গলিয়ে দিলে।

কিন্তু এগোতে হল না। তার সামনে পথরোধ করে দাঁড়াল সুকন্যা। রবীন দেখল, তার চোখ আর মুখের ওপর রক্তহীনতার একটি ছোপ পড়েছে। স্বরে কিছু উত্তেজনা, কিছুটা ক্ষোভ।

রবীনকে বেরতে দেখে সুকন্যা বলল: সারাদিন তো টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পাই নি তোমার। এখন আবার চলেছ কোথায়?

তোমাদেরই ওখানে।

মাই গড! দায়িত্বজ্ঞানকে বলিহারি। এতক্ষণে মনে পড়ল বুঝি?

মনে সারাদিনই রয়েছে; কিন্তু অনুপায় আমি। বাবা কেমন আছেন?

একটা ঢোক গিলল সুকন্যা: ভালই। কিন্তু....কিন্তু....

দুরন্ত একটি ভাবাবেগ সুকন্যার কণ্ঠরোধ করল। জানালার গরাদের ওপর মাথাটি রেখে সে অকস্মাৎ ফুঁপিয়ে উঠল।

এর জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না রবীন। প্রথমে তাই সে একটু হাঁ করে চেয়ে রইল; তারপর ব্যস্ত হয়ে সুকন্যার কাছে এগিয়ে গেল। উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করল: কী হয়েছে তোমার ?

মুখ তুলল সুকন্যা। চোখের পাতা দুটি ভিজে গিয়েছে। বলল: কী জানি ? ভয়ে সারাদিন বুকটা ঢিপ ঢিপ করছে। মাথাটা টনটন করছে। এই দেখ, কপালটা কেমন গরম হয়ে উঠেছে।

এই বলেই রবীনের একটা হাত টেনে নিয়ে নিজের কপালের ওপর চেপে ধরল সুকন্যা।

রবীন দেখল, কপাল গরম তো নয়ই; বলতে গেলে বরং একটু ঠাণ্ডাই।

ধীরে ধীরে কপাল থেকে হাতটা টেনে নিয়ে বলল: বোকা কোথাকার; কিছু হয় নি তোমার।

সুকন্যা কিছুতেই তা স্বীকার করবে না; বলে: কিছু হয় নি মানে কী ? বুকের ভিতরটা যে ঢিপ ঢিপ করছে সেটাও বুঝি কিছু নয় ?

রবীন হেসে বলল: না। কিছু নয়।

কিন্তু চারদিকে যে কলেরা সুরু হয়েছে তার কী ?

এবার হো হো করে হেসে উঠল রবীন: তুমিও শেষ পর্যন্ত প্যানিকের পাল্লায় পড়লে ?

চটে উঠল সুকন্যা: কিন্তু এদিকে যে আশ্রম ফাঁকা হয়ে গেল সে খবর রাখ ?

রবীন ঘাড় নাড়ে: সে খবর রাখার দায়িত্ব আমার নয়। যে যাবে তার। ইচ্ছে হলে তুমিও যেতে পার। বাধার কিছু নেই।

এবার ঝংকার আসে সুকন্যার কাছ থেকে: সে কথা তো অনেকবার বলেছ। আর সুযোগ পেলে বলবেও অনেকবার। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হচ্ছে কোথায় ?

বাধাটা কোথায় তা তো দেখতে পাচ্ছি নে! মিস্টার তালুকদারের কোন অসুবিধে হবে না। ঠিক সময়ে আমরা পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দেব।

ওহরি। সে কথা ভাবি নি মনে করেছ ? কিন্তু, তোমার ভরসাতে বাবাকে রেখে যাওয়াও যা, জলে ভাসিয়ে দেওয়াও তাই। যে লোক পুরো বার ঘণ্টার মধ্যে দু'পা গিয়ে দেখা করার সময় পায় না, তার ওপর ভরসা কোথায় ?

রবীন এবার হেসে বলে: আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ সুকন্যা। কত কাজ আমার ? বিপদের সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছি।

মনে রেখ, বিপদের মধ্যে যারা ইচ্ছে করে জড়াতে চায় লোকে তাদের বুদ্ধিমান বলে না।

তুমি কি বলছ সুকন্যা! ডাক্তার হয়ে যদি মানুষের এই বিপদে ভয়ে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকি তাহলে নিজের কাছে কৈফিয়ৎ দেব কী? কষ্ট করে লেখাপড়াটাই বা শিখলাম কেন? না, না; তা হয় না।

সুকন্যা রবীনের একেবারে কাছে সরে এসে তার কাঁধে দুটো হাত রেখে অনুনয়ের সুরে বলে: কিন্তু তোমার যদি কোন বিপদ ঘটে তাহলে আমার কাছে কী কৈফিয়ৎ দেবে বলত? না, না; লক্ষীটি তুমিও আমাদের সঙ্গে চল।

তারপর?

কলকাতাতেই প্র্যাকটিশ করবে।

রবীন হেসে বলে: অর্থাৎ আমার ভার তুমি নেবে? কিন্তু সমীরণ বাবুর ব্যবস্থাটা করবে কী?

সুকন্যা রবীনের কাছ থেকে চট করে সরে গেল। কোন জবাব দিল না।

রবীন বলল: সমীরণ বাবুর সঙ্গে যুক্তি করেই না হয ব'ল। তেমন কিছু তাড়া নেই।

রজনী কমপাউণ্ডার হাজির হল দরজার কাছে। একটু দাঁড়িযে রইল; কাশ্‌ল একটু। তারপর বলল: স্যার, চারটে নতুন রোগী এসেছে। একটা মর-মর। একটার শ্বাস উঠেছে। আর দুটো ঝিমিয়ে রয়েছে।

চলুন, যাচ্ছি।

রজনী কমপাউণ্ডার ঘাড় চুলকিয়ে বলে: আপনি আবার এত রাত্রে কী করতে যাবেন? কী করব বলে দিন; স্যালাইন দিতে হলে ডাক্তারখানার চাবিটা দিন।

রবীন সে কথার উত্তর না দিয়ে বলে: আপনি এগোন। আমি যাচ্ছি।

রজনী কমপাউণ্ডার চলে গেল।

রবীন সুকন্যার দিকে চেয়ে বলল: তুমি যে আমাকে কিছু দিতে চেয়েছিলে তা আমার মনে থাকবে। এখন তুমি ঘরে যাও, সুকন্যা। রাত অনেক হয়েছে।

১৯

তারাদাসের অনুমানই শেষ পর্যন্ত ঠিক বলে প্রমানিত হ'ল। আরও দিন দশেকের মধ্যেই কলেরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। মহামারিকে সেই জন্যেই বোধ হয় উড়ো ঝড়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ধুলো-বালিতে দিগ্‌বলয় আচ্ছন্ন করে যেমন সে হৈ হৈ করে দৌড়ে আসে, তেমনি আবার অকস্মাৎ দিগন্তে মিলিয়ে যায়।

এতটা তাড়াতাড়ি যে বিপদের নিরসন হবে তারাদাসের মত চরম আশাবাদীরও তা চিন্তা করতে বিস্ময় বোধ হয়েছিল। এমন কি, অমন যে ভীরু সুকন্যা, তার মুখেও গোলাপী আভা চিকচিক করে উঠল।

রবীনকে বলল: তুমি যখন এত করেই বলছ, তখন না হয় থেকেই যাই আর ক-টা দিন। কী বল?

তোমার যা ইচ্ছে।

সুকন্যা রবীনের গায়ে একটা চিমটি কেটে বলে: তোমার কী ইচ্ছে সেইটাই বল না শুনি। আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া?

রবীন প্রথমে একটু অবাক হয়েই চেয়ে রইল সুকন্যার দিকে, তারপর হেসে বলল: আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের ওপর তোমার থাকা-যাওয়া নির্ভর করছে নাকি?

তা অবশ্য নয়: তবে তুমি যদি খুশি হও।

আর সমীরণবাবু?

রবীনের পিঠে এবার দুমদাম করে গোটাকত কিল বসিয়ে দিলে সুকন্যা: আবার! অসভ্য কোথাকার।

কেবল সুকন্যাই নয়; অনেকেই এই বিপদের শান্তিতে একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছে। এমন কি সদানন্দদেবের হরিদ্বারে যাত্রার অয়োজন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সবাই। এবার হরিদ্বারে আনন্দধামের একটি নতুন শাখার উদ্বোধন হবে। জোর কদমে তারই প্রস্তুতি চলেছে।

যারা মারা গেল, সংখ্যার দিক থেকে তারা নগণ্য। যারা বেঁচে রইল, তাদের সংখ্যাই বেশী। মৃতদের আত্মীয়-স্বজনেরা ঘণ্টা কত ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদল; তারপর সে যার কর্মক্ষেত্রে ফিরে গেল। মেলার যেটুকু অংশ ভেঙেছিল, সেটুকু তো জোড়া লাগলই; কয়েকটি দিনের মধ্যে ক্ষতস্থান সেরে উঠে ফুলে-ফেঁপে একাকার হয়ে উঠল। প্রথমের দিকে যারা আসতে পারে নি,

অথবা কলেরার নাম শুনে পথের মাঝখানেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, তারা আবার গুটি-গুটি এগিয়ে এসেছে। না এসে উপায় নেই। এই মেলার ওপরেই তাদের আগামী কয়েকটি মাসের জীবিকা নির্ভর করছে। মাঠে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে কর্মব্যস্ততার মত অজস্র মরসুমী ফুলের সমারোহ জাগল।

আর ঠিক সেই সময়েই, অলক্ষে বসে বিধাতা পুরুষ বোধ হয় একটু হাসলেন।

কয়েকটি দিন অসহ্য গুমোটের পর হঠাৎ আকাশ তার দক্ষিণের জানলা খুলে দিল। উতরোল দক্ষিণে বাতাসের ঝাপটায় মানুষ কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। আশ্রমের বাগানে ফুল ফুটলো অজস্র। বনভূমিতে কচিপাতারা আপনাদের আনন্দে নেচে নেচে সেই দক্ষিণে বাতাসকে অভ্যর্থনা জানালো। পাখি-পাখালিদের কলগুঞ্জনে বনস্থলীতে জেগে উঠলো সমারোহ। মাঠে-ঘাটে, নদী-নালায়, পাহাড়ে-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে টুরিস্টরা ক্যামেরা নিয়ে ছোটাছুটি সুরু করে দিলে।

আর সেই সঙ্গে লোকচক্ষুর আড়ালে কোটি-কোটি বসন্তের বীজ ছড়িয়ে পড়লো চারপাশে। প্রথমে ধীরে-ধীরে, তারপর প্রচণ্ড গতিতে। ঠিক যেমন ভাবে বনের মধ্যে লোকচক্ষু, বৃক্ষলতা, পশুপাখির দৃষ্টির অন্তরালে আগুনের প্রথম বীজ অঙ্কুরিত হয়ে দাবানলের রূপ পরিগ্রহ ক'রে চারপাশ তছনছ করে বেরিয়ে যায়, ঠিক সেইভাবে অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে, আর নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কালবসন্ত এগিয়ে এসে বিপুল আবেগে সঞ্চারিত হয়ে একেবারে অকস্মাৎ সব কিছু, সমস্ত কিছু পরিব্যাপ্ত করে ফেললো। আক্রমনের এই প্রচণ্ড আকস্মিকতায় মানুষ হঠাৎ কেমন হতভম্ব হয়ে গেল। তাদের সমস্ত কিছু কর্মক্ষমতা আর চিন্তাশক্তি মুহূর্তে জড়পদার্থে রূপান্তরিত হ'ল। মনে হ'ল, যেন একটি দুরন্ত আগুনে ঝড় কাল বৈশাখের উন্মত্ততায় বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে সব কিছু পুড়িয়ে এগিয়ে চলেছে অন্য এক প্রান্তে। পিছনে রেখে যাচ্ছে, প্রত্নতাত্ত্বিকের খোরাক হিসাবে রাশি-রাশি ছাই, আর অর্দ্ধদগ্ধ কিছু কঙ্কাল।

বিপদের প্রাথমিক ধাকাটি কাটার পর, আর সুস্থ চিত্তে কোন কাজ করার মত মানসিক স্থিতিস্থাপকতা ফিরে আসার আগেই, প্রায় দুলাখ লোকের জনতা ছত্রাকার হয়ে পড়লো। সঙ্গে করে নিয়ে গেল কোটি কোটি পীড়াবীজ। প্রথম দশ দিন মানুষ কেবল পালিয়েছে। কেউ সুস্থ অবস্থায়, কেউ অসুস্থ অবস্থায়। যারা একেবারে পারে নি, কপাল ঠুকে একমাত্র পড়ে রইল তারাই। যারা পালালো, তাদের অনেকেই বাড়ীতে গিয়ে শয্যাশায়ী হ'ল। কেউ কেউ,

এবং তাদের সংখ্যাও নগণ্য নয়, রাস্তার উপড়ে মুখ থুবড়ে পড়লো। তাদের দিকে কেউ মুখ ফিরিয়ে তাকালো না। ফলে, যে রোগের এক জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকার কথা, সেই-রোগ বিষাক্ত সাপের মত কিলবিল করে চারপাশে ছোবল দিয়ে-দিয়ে বিপুল আনন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। বাধা পেল না এতটুকু।

রজনী কমপাউণ্ডার রবীনের চিন্তিত মুখের দিকে চেয়ে ভরসা দিল : ও কিছু নয়, স্যার। এসময়ে দু'দশটা ওরকম হয়। আবার সব ঠিক হয়ে যায়। আসল ভয় ছিল কলেরার। সে-ব্যাটাকে যখন সায়েস্তা করে ফেলেছি তখন আর মায়ের অনুগ্রহকে থোড়াই কেয়ার করি।

সেদিন সন্ধ্যায় আচার্যদেব আর তারাদাসের সঙ্গে তার এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হ'ল। তারাদাসের সম্মান রেখে গিয়েছে কলেরা। এখন সবাই তাঁরই মুখের দিকে চেয়ে বসে রইলেন।

তারাদাস রজনী কমপাউণ্ডারের কথাগুলিই হুবহু বলে গেলেন। তাঁর মতে বর্ষশেষে এই বিশেষ রোগটির আগমন বসন্তোৎসবের মতই অনস্বীকার্য। অতএব, মাভৈ। একান্তিকরণ, টিকা, আর ওষুধপত্রের কথা যদি ধরা যায় তাহলে প্রয়োজন মত রবীন সেটুকুর ব্যবস্থা নিশ্চই করবে; তবে অনাবশ্যক আতঙ্ক যাতে ছড়াতে না পারে সেদিকেও সকলের নজর রাখতে হবে।

এই ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করেই আরও দু-চারটে দিন কাটলো; কিন্তু তারপরেই বোঝা গেল যে বসন্ত এখানে সত্যকার একটি মহামারিতে পরিণত হয়েছে। একান্তিকরণের কথা কেউ আর চিন্তা করতেই সাহস পেল না। ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হওয়ার জোগাড়। গাঁ-কেই একসঙ্গে একান্তিকরণ করতে পারলে যদি কিছুটা সুরাহা হয়। তার চেয়ে বরং একটা পাহাড়কে খাঁচায় বন্ধ করা অনেক কম মেহনদের কাজ।

শেষ পর্যন্ত আশ্রমের কর্তাদেরও টনক নড়লো। তারাদাসের দল যাই বলুক না কেন আচার্যদেবকে স্বীকার করতেই হয়েছে যে এপিডেমিকটি সংকটের সীমারেখা অতিক্রম করে চলেছে; এবং সরকাবের কাছে বিশেষ সাহায্যের আবেদন জানাতে আর দেরী করলে একটি অভূতপূর্ব পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হবে সকলকে।

সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তর ওখান থেকে মাইল চল্লিশেক দূরে। রবীন সেখানে হাজির হয়েছিল। অনেক চেষ্টা আর কসরতের পর তাঁদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত দেখা হ'ল। তাঁরা ধৈর্য ধরে রবীনের কথা শুনলেন, সহানুভূতি দেখালেন, এবং

দেশের সেবায় ডাক্তারের জীবন উৎসর্গ করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু বললেনও; কিন্তু বসন্তের পরিব্যাপ্তি যত বিস্তৃতই হ'ক, সেটিকে তাঁরা এপিডেমিক বলে স্বীকার করতে রাজি হলেন না; কারণ সেটি স্বাস্থ্যদপ্তরের কয়েকটি বিশিষ্ট অনুশাসনের সীমা লঙ্ঘন করে নি। স্বাস্থ্যদপ্তরের লিখিত অনুশাসন যাই হ'ক না কেন, চারপাশের অবস্থা যে ক্রমশ আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, এখানে যে চিকিৎসার সরঞ্জামের অভাব, চিকিৎসকের অভাব, পথ্যের অভাব, সে সব বিষয় নিয়ে রবীন তর্ক করল, আবেদন জানাল। রবীন এও জানাতে ভুলল না যে আশ্রমের চারপাশ ঘিরে, দশ পঁচিশ খানা গ্রাম জুড়ে বর্তমানে যে ব্যাধি-দানবের তাণ্ডব-নৃত্য চলেছে, তাকে অবিলম্বে ঠেকাতে না পারলে জনসাধারনকে অবধারিত মৃত্যুর মুখেই ঠেলে দেওয়া হবে। বুদ্ধি আর নীতির দিক থেকে দুটিই গর্হিত কাজ। এদুটি বিষয় নিয়ে তাঁরা আর একটু গবেষণা করলেন, যথাসম্ভব সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন, এবং যথাসময়ে করমর্দন করে আলোচনার সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

তারপর আরও সাতদিন কেটে গিয়েছে। স্বাস্থ্যদপ্তর এ নিয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য করেন নি। আশ্রমের আবেদন-নিবেদনের উত্তরে নিকটস্থ দপ্তর থেকে একটি ছত্র স্বীকৃতি এসেছে মাত্র : রিসিভিং য়্যাটেনশন।

দিনের পর দিন প্রায় কয়েক হাজার ভীত সন্ত্রস্ত মানুষদের বাঁচিয়ে রাখার পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে বসে রইল রবীন। তাদের চারপাশ ঘিরে বিরাট শত্রুচমূ দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে। আর প্রতিদিনই সে বাইরে থেকে সাহায্যের আশায় বসে রয়েছে। কিন্তু কোথায় সাহায্য? এক-একটা দিন যেন এক-একটা দুঃস্বপ্নের মত কেটে যেতে লাগল।

আশ্রমের তিন-চারশ বাসিন্দা পিঁজরাপোলে বন্দী পশুর মত আটকিয়ে গিয়েছে। পালাবার ইচ্ছা থাকলেও সাহস ছিল না তাদের। পথে-ঘাটে, গাছে-পালায় বসন্তের পীড়াবীজগুলি উন্মত্ত বাঘের মত ওৎ পেতে বসে রয়েছে। যে-কোন মুহূর্তে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। সুতরাং সাহস করে এগিয়ে পড়লেও বিপদ, আবার ভীরুর মত এখানে পড়ে থাকলেও বিপদ। লোকগুলি যেন ভয়ে আধমরা হয়ে গিয়েছে। তার ওপর অন্ধকার রাত্রিতে যখন দিগবিদিক আচ্ছন্ন করে প্রেতের অট্টহাসির মত চারপাশে ধ্বনি জেগে ওঠে, রাম নাম সচ্চা হ্যায়, তখন এরা ঘুমোতে-ঘুমোতেও আঁৎকে ওঠে। রামনামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়ে। মাঝে-মাঝে আশ্রমের পাশ দিয়ে চাদরমুড়ি

দিয়ে কোন ক্লান্ত অপিরিচিত লোককে যেতে দেখলেই আশ্রমের লোকেরা ভিতর থেকে ঢিল ছুঁড়ে তাকে নাস্তানাবুদ করে তোলে।

এমনি করেই দিন কাটছিল।

হঠাৎ একদিন সহরের একটি বহুল প্রচারিত দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় বড়-বড় হেডলাইন দিয়ে এই দুঃসংবাদটি ছাপান হল। আশ্রমের জনহিতকর সেবাকার্যের অজস্র প্রশংসা করে, সরকারের চরম ঔদাসীন্যকে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে জর্জরিত করল। আক্রমন করল স্বাস্থ্যবিভাগের শম্বুকগতি দপ্তরটিকে। লাখ-লাখ অজ্ঞ মানুষের জীবন নিয়ে এই রঙ্গতামাসার বিপদটি যে কোথায় সে বিষয়টি নিয়েও জোরাল ভাষায় লিখতে ছাড়ল না। হয়ত তখনই সরকারের টনক নড়ল। কারণ, ঠিক সেইদিনই রাত্রিতে আশ্রমবাসীরা যুগপৎ বিস্ময়-পুলক আর বিষাদে অভিভূত হয়ে রেডিয়ো মারফৎ সরকারের প্রথম বিবৃতি শুনল। আশ্রমটিকে কেন্দ্র করে আশপাশের দশটি গ্রামকে দুমাসের জন্যে বিপজ্জনক এলাকা বলে ঘোষনা করা হয়েছে। সরকার আরও আশ্বাস দিয়েছেন যে অতিশীঘ্রই সমস্ত রকম সাহায্যের ব্যবস্থা হচ্ছে; এবং সেই সাহায্য আসার পূর্বে আপৎকালীন সমস্ত কিছু চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার সাময়িক ক্ষমতা আশ্রমের ওপর ন্যস্ত থাকবে। সরকার আরও জানিয়েছেন যে কেবল গমন-বহির্গমনই নয়, জনস্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য ক'রে পত্র গমনাগমনের ওপরেও বিধিনিষেধ আরোপ করতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। আশ্রমে যে পোষ্টঅফিসটি রয়েছে তার ওপর নির্দেশ এই যে সমস্ত বহির্গামি চিঠিই তারা পড়ে দেখবে; এবং যে-চিঠি বাইরে পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে তারা মনে করবে সেগুলিকে আগে প্রতিশোধন করে তারপর পাঠাতে হবে। অন্য কোন নির্দেশ প্রচারিত না হওয়া পর্যন্ত, আশ্রমের ডাক্তারের লিখিত অনুমতি ছাড়া ঐ সব নিষিদ্ধ এলাকা থেকে বাইরে যাওয়া আইনত দণ্ডনীয় বলে গন্য করা হবে।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ঠিক নয়; মেঘ কিছুটা অবশ্য জমেই ছিল, কিন্তু যে দুর্বার গতিতে অকস্মাৎ এই বজ্রটি নেমে এল তার জন্যে এখানকার কেউ-ই বড় একটা প্রস্তুত ছিল না। এতদিন আশ্রমের মধ্যে মানুষে ইচ্ছা করেই বন্দী হয়ে ছিল। কেউ দেখি-দেখি করে সময় নষ্ট করেছে; কেউ-বা যাচ্ছি-যাব করে যায় নি। কিন্তু সরকারি বিজ্ঞপ্তি তাদের নাকের ওপর যেন বিরাট ভারি একটি লৌহযবনিকা নামিয়ে দিলে। কেবল যে তাদের বহির্গমন বন্ধ হল তাই নয়, পত্রালাপও ব্যাহিত হল।

সদানন্দদেব বললেন: এত তদ্বিরের পর একটি চরম হট্টগোলের সৃষ্টি করলেন সরকার। এত কড়াকড়ি করলে মানুষ তো ভয়েই আধমরা হয়ে যাবে।

কাজই বলুন, আর অকাজই বলুন, ঐ একটি ছাড়া পরের পনেরটি দিন সরকারের কাছ থেকে আর কোন আশার বাণী আসে নি; না লোকমুখে, না বেতারের মারফৎ। এদিকে সরকারি বিজ্ঞপ্তি আর জনসাধারনের প্রতিরোধ-ক্ষমতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে মহামারি ক্রুদ্ধ ধুর্জটির মত চারপাশে দক্ষযজ্ঞ বাঁধিয়ে চলেছে।

কোনদিকে কোন ভরসা নেই, একমাত্র সহরের ঐ দৈনিক কাগজটি ছাড়া। সেই প্রথম প্রকাশের দিন থেকেই সংবাদপত্রটি প্রতিদিনই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ছাপিয়ে চলেছে। মৃতের সংখ্যা যে দিন-দিন বাড়ছে, এবং সাহায্যের কথা তো দূরস্থান, একটি মাত্র বিজ্ঞপ্তি ছাড়া সরকার যে দ্বিতীয় কোন কর্তব্য সম্পাদন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নি, এবিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর তীব্র ভাষায় লিখিত আর প্রচারিত বিবরণীটি সহরবাসীদের মনেও বেশ কিছুটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। ফলে সহরের আরও দুচারটি দৈনিক কাগজ বিষয়টি নিয়ে অধুনা কিছুটা লেখালেখি সুরু করেছে।

তারপর একদিন সকালে রবীনের ডাক পড়ল স্টেশনে। স্টেশনের পাশেই আস্তানা নিয়েছেন মেজর ভোঁসলে। ভোর রাত্রে মেজর একটি জিপে চড়ে অবস্থাটিকে প্রত্যক্ষভাবে পরিদর্শন করার জন্যে এখানে হাজির হয়েছেন। রবীনকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। আধুনিক সংগ্রামে খোদ সেনাপতিরা রণক্ষেত্রে যাওয়াটা বিশেষ গর্হিত কাজ বলেই মনে করেন হয়ত।

রবীনের সঙ্গে প্রায় আধঘণ্টা কথাবার্তা হল তাঁর। সতর্ক ব্যবস্থার কড়াকড়ি করার জন্যে পুলিশ ইনসপেকটরের সঙ্গেও আলোচনা হল। তারপর সন্তুষ্ট হয়ে সংবাদপত্র গুলির মুণ্ডপাত করে প্রত্যক্ষদর্শীটিকে মিথ্যা অপবাদ প্রচারকারি বলে নস্যাৎ করে যেন একটি বিরাট কর্তব্য সুসম্পাদন করেছেন এই ভেবে মনের আনন্দে শিস দিতে-দিতে ব্রেকফাস্ট আনার আদেশ জারি করলেন, এবং তাতে অংশগ্রহণ করার জন্যে রবীনকেও আমন্ত্রণ জানালেন।

সাহায্যের কথায় তিনি আশ্বাস দিলেন যে যথাস্থানে তিনি এই আবেদম পৌঁছে দেবেন। ব্যাকরণের দিক থেকে এখনও দপ্তর ভবিষ্যৎ কাল ব্যবহার করছেন এবং বর্তমান অবস্থায় যে সেটি মারাত্মক, এই কথাটি মেজরকে জানানো হলে, মেজর কাঁধে একটি শ্রাগ করে জানালেন যে দর্শনের দিক থেকে বিচার

করলে কালের ইতিহাসে অতীত আর বর্তমান দুটিই মানুষের জীবনে ডেবিট ব্যালান্স। ভবিষ্যৎটাই হল আসল। তারই আশাতে বেঁচে থাকে মানুষ। যার ভবিষ্যৎ নেই সে মনুষ্য সমাজে ইতরপ্রাণী বিশেষ। তবে ব্যবস্থাপনার দিক থেকে সরকার মোটেই বসেছিলেন না; সহরের হাসপাতালগুলির সাহায্য চাওয়া হয়েছিল; কিন্তু সহরবাসীদের স্বাস্থ্যহানির ভয়ে সে ব্যবস্থা কার্যকরী হয় নি। মিউনিশিপ্যালিটিও বর্তমানে নির্বাচন নিয়ে এত ব্যস্ত যে ওখান থেকেও কোন সাহায্য আশা করা দুরূহ। তা ছাড়া, বৎসরের এই শেষ কটাদিন বসন্তের প্রকোপ ভারতের একটি বাৎসরিক উৎসবের মত। আর বর্তমানে, ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা এত বেড়েছে সে তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতেই নাজেহাল হতে হযেছে; তাই, কোন একটি বিশেষ এলাকায় একটি বা বিশেষ কয়েকটি ওষুধের প্রয়োজনাতিরিক্ত অভাব দেখা দিলে স্বাস্থ্যদপ্তরকে যথেষ্ট বিব্রত হতে হয়। তবু এ বিষযে সরকার অতিমাত্রায় সচেতন ও সমবেদনাশীল; এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি মুহূর্ত বেশী সময় নষ্ট না করে সাহায্য পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। সব শেষে, রবীন আর তার সহকর্মীদের ওপর বিরাট একটি নির্ভরতা জানিয়ে, জনকল্যানের মহত্ব সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়ার পর রবীনের ওপরেই আনুষ্ঠানিক ভাবে সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেন; এবং এ-আশ্বাসও দিতে ভুলবেন না যে যখনই সে প্রয়োজন মনে করবে তখনই মেজরের সঙ্গে পত্রাদির মারফৎ যুক্তি অথবা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে সে যেন দ্বিধা না করে। সকলের শেষে মেজর তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র ছুঁড়লেন। তিনি জানালেন যেহেতু এই সব এলাকায় একমাত্র আশ্রমেই হাসপাতাল রয়েছে সেই হেতু সরকার মনে করেন যে সমস্ত রোগীকে ঐ হাসপাতালেই একান্তিভূত করা হক।

গাদা-গাদা উপদেশ, স্বীকৃতি, দায়িত্ব আর শুভেচ্ছা নিয়ে ফিরে এল রবীন।

তারাদাস সমস্ত শুনে বললেন: এ হতেই পারে না। রাজ্যের রোগীকে আশ্রমে টেনে তোলায় অর্থ হচ্ছে আশ্রমের জীবন বিপন্ন করা।

সদানন্দদেব হেসে বললেন: কিন্তু রোগীটিকে বাইরে ছেড়ে রাখলেও তো সে এখানে এসে ঢুকবে।

নিতাই ব্রহ্মচারি বলেন: মানুষের এই বিপদের দিনে আমাদের এতটা স্বার্থ্যপর হওয়া উচিত হবে না বোধ হয়।

তারাদাস বললেন: তা ছাড়া, ট্রাসটি বোর্ডের বিনা অনুমতিতে এ কাজ আমরা করতেও পারি নে।

নিতাই ব্রহ্মচারি বললেন : কিন্তু আপদকালে যে-কোন কাজ সাময়িকভাবে করার ক্ষমতা আচার্যদেবের রয়েছে। ট্রাসটি বোর্ড তা অনুমোদন করতে বাধ্য।

তারাদাস আর কোন কথা না বলেই উঠে দাঁড়ালেন, বললেন : ব্যক্তিগত ভাবে আমি আপনাদের এই কাজের প্রতিবাদ করি ; এবং প্রয়োজন হলে, আমার শেষ রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত দিয়ে আপনাদের বাধা দেব। একজন যুবকের ওপর এত বড় দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে সরকার যে ভুল করেছেন, আপনারাও সেই ভুলটি স্বীকার করে নিলেন দেখে আশ্চর্য হচ্ছি আমি।

সদানন্দদেব তখনই কোন উত্তর দিলেন না। চুপ করে রইলেন। কিন্তু তাঁর মুখের ওপর বিরক্তির একটি চিহ্ন ফুটে বেরোল। তিনি একবার চেয়ে রইলেন তারাদাসের দিকে ; তারপর বললেন : শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে তোমার মতবিরোধ দেখা দেবে এটা কিন্তু আমি ভাবতে পারি নি, তারাদাস।

তারাদাস বললেন : আপনি এর গুরুত্ব বুঝতে পারছেন না আচার্যদেব। এ বড় সংক্রামক ব্যাধি।

সদানন্দদেব বললেন : বিশৃঙ্খলার চেষ্টা করাটাও তার চেয়ে বেশী সংক্রামক, তারাদাস। এই মহামারির সময়ে ডাক্তারের উপরেই আশ্রমের ভার থাকা উচিত।

তারাদাস বললেন : আপনি কি চান যে আমাদের এই সাধের আশ্রম পুড়ে ছাই হয়ে যাক ?

সদানন্দদেবের স্বরে এবার রুক্ষতার আভাস দেখা দিয়েছে : মানুষকে আশ্রয় দিতে গেলে যদি আশ্রম পুড়ে যায় তো যাক। আবার গড়ে তুলব আমরা। আজ মানুষ বড় বেশী বিপন্ন। তাদের বিপদকে আমি তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিতে পারব না। রবি, তুই হাসপাতালের দরজা খুলে দে, এখনই। সরকারের সাহায্য যখন আসে আসুক। আমাদের বসে থাকলে চলবে না। আশ্রমের আপৎকালীন দায়িত্ব আমি তোর উপরেই তুলে দিলাম।

রবীনের হঠাৎ চোখ পড়ে গেল তারাদাসের দিকে। চোখ দুটি স্থির। সেখানে একটি নিষ্ঠুর অতিকায় দানবের জিঘাংসা ওৎ পেতে বসে রয়েছে। এতদিন যাকে সে দেখে এসেছিল এ যেন সে-লোক নয় ; অন্য তারাদাস। তাঁর কপালের শিরাগুলি ইস্পাত-কঠিন হয়ে উঠেছে। বুকের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে তরঙ্গ নেই। হয়ত এখনই ঝড় উঠবে।

কিন্তু ঝড় উঠল না। ভিতরেই অশ্রান্ত পাক খেয়ে-খেয়ে থেমে গেল সেই

ঝড়। তারাদাস একটু হেসে বললেন: আমি তাহলে পদত্যাগ করলাম আচার্যদেব।

একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল সদানন্দদেবের মুখ থেকে: তারাদাস!

তারপরেই একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন কিছুক্ষণ। একটু পরে মুখ তুলে বললেন: তারাদাস, তুমি আজ উত্তেজিত। বিশ্রাম কর গে।

তারাদাস চলে গেলে সকলেই চুপ করে বসে রইলেন। রজনী কমপাউণ্ডার এতক্ষণ বসে ছিল একধারে। একেবারে নির্বাক গরুড়-স্তম্ভের মত। সে একটু কেশে বলল: একটু সাবধানে থাকবেন আচার্যদেব। সেক্রেটারিবাবুর একটি দল রয়েছে।

সদানন্দদেব হাসলেন; নিজের চিন্তাধারাকে লক্ষ্য করে অনেকটা আত্মগত হয়েই যেন বললেন: সবই বুঝলাম। তবু এই আশ্রমের জন্যে তারাদাস অনেক কিছু করেছে। এখান থেকে ওকে সরানোর প্রশ্নই ওঠে না। তোমরা সব কাজে যাও রবি।

সকলেই চলে গেলে সদানন্দদেব উঠে দাঁড়ালেন। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। তাঁর কপালের রেখাগুলি কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে। আশ্রমের ভিতরে তিনি যেন একটি আসন্ন ঝড়ের গন্ধ পাচ্ছেন। তারাদাসকে তিনি যে কেবল চেনেন তাই নয়, বেশ ভাল করেই চেনেন। এই আশ্রমেরই মধ্যে আজ থেকে দশটি বছর আগে কাকজ্যোৎস্নায় ভরা একটি রাত্রিতে দুজনের প্রথম সাক্ষাৎ।

কয়েকখানি মাটির বাড়ি; পাঁচজন সন্ন্যাসী; কাঁটাতারের বেড়া। তখনকার দিনে আশ্রম বলতে বোঝাত ঐটুকুই। চারপাশে কয়েক মাইল জুড়ে অরণ্য। রাত্রি হওয়ার অনেক আগে থেকেই নিশাচর পশুরা, আর তারও আগে থাকতে ডাকাতের দল বেরিয়ে পড়ত বনের অন্তরালে।

একদিন রাত্রে দরজায় ধাক্কা শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সদানন্দ। কাকজ্যোৎস্নায় দেখলেন, দরজার সামনেই একটি লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। হঠাৎ দেখলেই সন্দেহ হয় দুষ্ট চরিত্রের লোক বলে।

সদানন্দ কী যেন ভাবলেন একটু; তারপর কপাট বড় করে খুলে দিয়ে বললেন: বাইরে বড় শীত বুঝি? না, বাঘে তাড়া করেছে?

কোন উত্তর দিল না লোকটি।

ভিতরে এস।

লোকটি কোমরের পিছনে ঝোলান কি একটা জিনিসের ওপর হাত বুলিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

ভিতরে এস! সঙ্-এর মত দাঁড়িয়ে কেন?

লোকটি ভিতরে না এসে বাইরে থেকেই বিরক্তভাবে বলল: এখানেও সন্ন্যাসী? কজন রয়েছ?

কজন থাকলে তোমার সুবিধে হয়?

হঠাৎ চটে উঠল লোকটি; ঝাঁকানি দিলে: থাক, থাক। আমার আর সুবিধে অসুবিধের কথা ভাবতে হবে না। দু'ঘণ্টা যে একটু আরামের নিঃশ্বাস ফেলব তারও উপায় নেই রে বাবা। এ জগতে মানুষ বাস করে?

সদানন্দদেব একটু হাসলেন; বললেন: তুমি বুঝি আরামের নিঃশ্বাস ফেলতে এখানে এসেছ? ডাকাতি করতে নয়?

ডাকাতি।—লোকটা চমকে উঠল। তীব্র কণ্ঠে, রুক্ষ মেজাজে চীৎকার করে বলল: ডাকাতি। হ্যাঁ, তাই করতে এসেছি। দিয়ে দাও কী রয়েছে?

নিতেই যদি হয় ভিতরে এস।

লোকটি এবার সন্ত্রস্ত হয়ে চারপাশে চেয়ে দেখল: তোমরা কজন রয়েছ এখানে তা তো বললে না।

আগে ভিতরে এস, তারপর অন্য কথা। আর যদি আসতে না চাও, দাড়িয়ে থাক বাইরে। বাঘে যদি খেয়ে না যায়, তো কাল সকালে জমে বরফ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। মনে হচ্ছে, এলাকার বাইরে চলে এসেছ?

লোকটি সন্দিগ্ধভাবে এপাশ-ওপাশ তাকাতে লাগল; তারপর গজ-গজ করতে করতে ঘরে ঢুকে এল: তা না হলে কি এখানে আসি?

অনুতাপ হচ্ছে?

লোকটি এবার খিঁচিয়ে উঠল: অনুতাপ! এ বান্দা কোন কাজের জন্যে অনুতাপ করে নি কখনও। কৈফিয়ৎ দেয় নি কারও কাছে। বুঝেছ?

সদানন্দদেব দরজাটি বন্ধ করে খিল এঁটে দিলেন।

লোকটি চীৎকার করে দু'পা লাফিয়ে এল সামনে: খবরদার। দরজা বন্ধ করো না। খুন করে ফেলব।

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটির হাতে একটি ছোরা ঝলসে উঠল। সদানন্দ ঘুরে দাঁড়ালেন। লোকটি সদানন্দের দিকে চেয়ে একটু পিছিয়ে গেল। তারপর বলল: ওঃ! তুমিও আমারই মত ডাকাত।

ডাকাত বলতে পার ; কিন্তু তোমার মত নয়।

লোকটি ক্রুর দৃষ্টিতে সদানন্দের দিকে চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ হেসে ফেললে : তা তো দেখতেই পাচ্ছি। আমার হাতে ছোরা ; তোমার হাতে রিভলবার। তা চেহারাটি তো বেশ বাগিয়েছে বাবাজী। দেখলে শ্রদ্ধা হয়।

তোমাকেও হবে। এখন ঐ ছোরাটি টেবিলের ওপর রাখ দেখি !

লোকটি আবার তাকিয়ে রইল সদানন্দের দিকে। তার সর্বাঙ্গ জড়িয়ে একটা ভীষন অস্বস্তি জেগে উঠেছে। একটি বিপদের পূর্বাভাসে সে যেন কিছুটা চঞ্চল।

কয়েকটি মুহূর্ত সদানন্দের চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইল লোকটি। তারপর ধীরে ধীরে টেবিলের ওপর ছোরাটি রেখে পিছিয়ে গেল।

সদানন্দ এগিয়ে এলেন ; ছোরাটি হাতে নিয়ে বললেন : রক্তের দাগ এখনও মোছে নি। কি রকম ডাকাত হে তুমি ? কাকে খুন করলে ?

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল লোকটি ; বলল : খুন ? খুন করতে পারলাম কোথায় ? বেইমানকে খুন করাই উচিত ছিল আমার।

সদানন্দ হেসে বললেন : খুন করাটা হয়ত অপরাধ নয়, কিন্তু খুন করে ধরা পড়াটা অপরাধ।

লোকটির চেহারার মধ্যে এবার স্পষ্ট একটি পরিবর্তন দেখা গেল। সে দুহাতের মধ্যে নিজের মুখটাকে চেপে ধরল।

লজ্জা, না, অনুতাপ হচ্ছে ?

লোকটি মুখ তুলে বলল : অনুতাপ। আর একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল আমার।

এখন কী করবে ?

কিছুই ঠিক করি নি।

কোমরে আর কিছু নেই তো ?

না।

হাত তোল।

ডান হাতে রিভলবারটি ধরে সদানন্দ লোকটিকে সার্চ করলেন। না, কোথাও কিছু নেই। তারপর বাঁ হাত দিয়ে তার কব্জিতে চাপ দিলেন একটু জোরে। লোকটি উহু করে উঠল। হাত ছেড়ে দিলেন সদানন্দ।

এবার হেসে উঠল লোকটি ; বলল : দেখলে তো মনে হয় পরম বৈষ্ণব। হাতটাকে এমন লোহা করে রেখেছেন কেন ?

সদানন্দও একটু হাসলেন, বললেন: তোমাদের মত লোকদের নিয়েই তো এই জঙ্গলে বাস করত হয় আমাদের।

আর রিভলবার? সেও কি চোরাই নাকি?

এখানকার পুলিশের বড সাহেব আমার চেলা। তাই দুচারটে রিভলবার পেতে আমার অসুবিধে হয় নি।

লোকটি সত্যিই ভড়কে গেল। ধীর পায়ে কিছুটা এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল: অর্থাৎ আবার আমাকে ধরিয়ে দেবেন?

সে বিষয়ে এখনও কিছু ঠিক করি নি।

হাল ছেড়ে দিলে লোকটি: তাহলে দিন।

তারপরেই তীব্র বেগে সদানন্দের দিকে ঘুরে লোকটি বলল: কিন্তু ডাকাতি করি কেন জানেন?

প্রয়োজন নেই।

হোঁচট খেল লোকটি: নে-ই?

না।

কেন?

তুমি যা বলবে তা সকলেই বলে। দারিদ্র্য, এই তো?

লোকটি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল; তারপর বলল: এটা কি যথেষ্ট কারণ নয়?

না। যে দেশে দরিদ্রকে নারায়ণ বলে প্রচার করা হয়েছে সে দেশে দারিদ্র্য থাকবে না তো থাকবে কোথায়? কিন্তু তাই বলে তুমি আইন বাঁচিয়ে চলবে না, এ তো কোন কাজের কথা নয়।

কিন্তু এদেশের আইন আমাদের বাঁচতে সাহায্য করে না।

তুমি কিছু বুলি কণ্ঠস্থ করেছ দেখছি। কিন্তু গলার জোর না দেখিয়ে মাথাটা যদি একটু খাটাতে তাহলে আজ তোমাকে এ অবস্থায় পড়তে হত না। ভগবান যে মাথাটা দিয়েছেন সেটা কিসের জন্যে?

লোকটি আবার অবাক হযে চেয়ে রইল সদানন্দের দিকে। তারপর অনিশ্চিত ভাবে ঘাড় নাড়ল: অনেক খাটিয়েছি। কোন কাজে আসে নি। বুড় বাপ, আর কচি দুটো ছেলেকে বাঁচাতে পারি নি। স্ত্রীকে ঘরে রাখতে পারি নি।

যা পার নি, তা নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই। কি পার, এখন তাই

নিয়েই চিন্তা কর। আমার এখানে থাকলেই আজকে তোমার চোখে যা ঝাপসা লাগছে কাল সেটি পরিষ্কার ঝরঝরে হয়ে যাবে।

আমাকে আপনি আশ্রয় দেবেন?

যদি তুমি চাও।

লোকটি এবার পিছু ফিরে দুচার পা ঘোরাঘুরি করল। সদানন্দ এক দৃষ্টিতে তার চলাফেরা দেখছিলেন। এই প্রচণ্ড শীতের উপযুক্ত পোষাক নেই তার শরীরে। আর তারই ফলে তার দেহের ওপর প্রকৃতির রুক্ষ ছাপ পড়েছে।

মুখোমুখী দাঁড়াল লোকটি; বলল: আপনাকেও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি নে; তবু একবার চেষ্টা করে দেখি। কিন্তু তার আগে আমার পরিচয়টা জানার প্রয়োজন নেই আপনার?

না। আজ থেকে তোমার পরিচয় নতুন। নাম হ'ল তারাদাস ব্রহ্মচারি। ও-পোষাক ছেড়ে গেরুয়া পর। তুমি আমার নতুন সঙ্গী।

লোকটি এবার হেসে ফেলল: ডাকাত থেকে ব্রহ্মচারি! কিন্তু যপ-তপ-মন্ত্র-তন্ত্র আমার দ্বারা হবে না; অভ্যাস নেই।

কি জানি কেন, তারপর থেকেই তারাদাস তার পূর্ব পরিচয় ভুলে গেল। বশ্যতা স্বীকার করল সদানন্দের। ধীরে ধীরে লোকটি সভ্য আর মার্জিত হল। আশ্রমটিকে গড়ে তোলার কাজে সদানন্দের অন্যতম সহকারি হল।

কিন্তু মাঝে মাঝে সমস্ত কিছু দীক্ষার আবরণ ভেদ করে তারাদাসের সেই আরণ্য বর্বর মূর্তিটি ফুটে বেরোয়। সদানন্দদেব আগেও তা লক্ষ্য করেছেন। বর্তমানে তার মধ্যে শক্তির দম্ভ দেখা দিয়েছে। সেইটাই তার সম্বন্ধে সত্যিকারের ভয়ের কথা। সময়ে সাবধান না হলে যে শক্তির সংহত নিয়োযনে আশ্রমটি গড়ে উঠেছে, তারই বর্বরতায় সে'টি ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে।

২০

মেজর ভোঁসলের প্রত্যক্ষ (?) অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর স্বাস্থ্যদপ্তরের তরফ থেকে একটি মাত্র বিবৃতি প্রচার করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে রোগের প্রসারতার দিক থেকে সংবাদপত্রে যে বিবরণী প্রকাশিত হচ্ছে তা যথেষ্ট অতিরঞ্জিত আর দায়িত্বজ্ঞানহীন। রোগটিকে মোটেই এপিডেমিকের পর্যায়ে ফেলা চলে না। প্রতি বৎসর এই সব অঞ্চলে বসন্তের যে প্রাদুর্ভাব ঘটে, এ-

বৎসর রোগটি তারই কিছুটা বৰ্দ্ধিত সংস্করণ মাত্র। আর কিছু নয়। এবং দপ্তর প্রথম থেকেই যথেষ্ট (?) সতর্কতা অবলম্বন করার ফলে রোগটি বর্তমানে সীমায়িত হতে বাধ্য হয়েছে। আর কয়েকটি দিনের মধ্যেই, অবশ্য অবস্থার নতুন কোন জটিলতা দেখা না দিলে, সমস্ত এলাকা থেকে বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার কথা বিবেচনা করা হবে।

এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আশ্রমের মধ্যে প্রায়-বিপুল একটি হর্ষধ্বনি দেখা দিয়েছিল। এতদিনকার অন্তরণ দূর হবে তা হলে। অনেকের বুক থেকে পাষাণভার নেমে গিয়েছিল। দুচারজন আশ্রমের বাইরে একটু ঘুরে বেড়াবারও ইচ্ছা প্রকাশ করলে। এমন কি সুকন্যা পর্যন্ত দৌড়ে এসেছিল রবীনের কাছে।

তা হলে এত দিনে মুক্তি হল আমাদের? যাক বাবা, এবার জিনিষপত্র গুছিয়ে নিই। তারপরেই ড্যাং ড্যাং করে কলকাতা। মরে গেলেও আর এমুখো হচ্চি নে। তৈরি হয়ে নাও।

রবীন কোন মন্তব্য প্রকাশ করে নি। সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রমের পর সে সামান্য একটু বিশ্রাম নিচ্ছিল। দক্ষিণা বাতাসের সঙ্গে অসংখ্য মিষ্টি ফুলের গন্ধ ভেসে আসছিল। তার সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে উঠেছিল সংখ্যাতীত কণ্ঠের উচ্চনাদ, খোল আর করতালের বিসদৃশ ঝংকার, আর শ্মশানযাত্রীদের ভাঙা গলার খনখনে শব্দ। স্বাস্থ্যদপ্তরের মাভৈ বাণীর কিছুটা টুকরো তার কানেও এসেছিল; কিন্তু সে জানে বাস্তব অবস্থাটি মোটেই আশাপ্রদ নয়। সত্যি কথা বলতে কি অবস্থাটি দিন দিন জটিল থেকে জটিলতরই হচ্ছে। আশ্রমের হাসপাতালটিতে থিক থিক করছে রোগী। সেখানে আর তিল ধারণের স্থান নেই। আশ্রমের বাইরে মেলাটির একপ্রান্তে বিরাট একটি ক্যাম্প খাটিয়ে রোগীদের একান্তিকরণের জন্যে নতুন ব্যবস্থা হয়েছে। তাও ভরে উঠল প্রায়। এছাড়া প্রতিটি নতুন দিন আসছে তার অজস্র সমস্যা নিয়ে। নতুন রোগীকে আস্তানা দেওয়া, আর মৃতদের সংকার করাও একটি দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের ঘরে ঘরে কত অসংখ্য রোগী যে আত্মীয় স্বজনের চেষ্টায় আত্মগোপন করে বসে রয়েছে তারও ইয়ত্তা নেই। তার ওপর রয়েছে এখানকার সাধারণ মানুষের মনে স্বাস্থ্যরক্ষার বৈজ্ঞানিক উপায়টি সযত্নে এড়িয়ে দেবতাদের প্রসন্ন করার মোহ। পাড়ায় পাড়ায় পূজার ধূম চলেছে; রাশি রাশি কীর্তনীয়ার দল জুটেছে। পুরোহিতরা প্রচার করে বেড়াচ্ছে, ও সব ম্লেচ্ছ ব্যাপার বরবাদ

করো। বাঁচতে যদি চাও তো পূজা করো, হোম করো। দেবতাদের প্রসন্ন করো।

এখন চিন্তা করার কথা। উত্তর দেওয়ার সময় নয়। তাই রবীন কোন উত্তর দিল না।

সুকন্যা বলল: কথা বলছ না যে? রেডিয়োর মিউজ শোন নি?

শুনেছি।

তা হলে?

ভরসা পাচ্ছি না।

সুকন্যা গালে হাত দিয়ে চোখ দুটি বড়-বড় করে বলে: অবাক করলে তুমি? সরকার যখন বলছেন ....

সরকার কী বলছেন তা তো জানি নে। নিজে যা জানি তাই আমি বলছি।

সুকন্যার স্বরে এবার অস্থিরতা জেগে উঠল: তুমি কী বলছ সেইটাই বল না ছাই।

অবস্থার এতটুকু পরিবর্তন বুঝতে পারছি নে; বরং যথেষ্ট খারাপের দিকে এগিয়ে চলেছে বলেই আমার ধারনা।

গুম হয়ে রইল সুকন্যা।

রবীন একটু হেসে বলল: লক্ষ্মীমেয়ের মত আর ক-টা দিন চুপ করে থাকতেই হবে সুকন্যা।

হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে সুকন্যা: চুপ করেই তো রয়েছি। শেষ পর্যন্ত না পাগল হয়ে যাই।

রবীনের স্বরে সহানুভূতি: না, না; পাগল হলে চলবে কেন? মানুষ মরবেই। তার জন্যে দুঃখ বা ক্ষোভ করে লাভ নেই। বীরের মত যুদ্ধ কর সুকন্যা। আর তা যদি না পার, তো সমীরণ বাবুকে বেশ গুছিয়ে চিঠি লেখ একটা। পাঠাবার ব্যবস্থা করব আমি।

দুটি চোখই এবার দপ করে জ্বলে উঠল সুকন্যার: অতটা বদান্যতা না দেখিয়ে দয়া করে আমাদের কলকাতায় দিয়ে আসার ব্যবস্থা কর। তাহলেই তোমার কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ থাকব।

তুমি মহানুভব সুকন্যা। কিন্তু আমি অপারক; আমাকে মিথ্যে অনুরোধ করে লাভ নেই।

এই তোমার ভালবাসা? তুমি নাকি আমাকে ভালবাস? ছিঃ!

রবীন অবাক হয়ে চেয়ে রইল সুকন্যার দিকে। তার চোখের তারায়, মুখের রঙে একটি মৃত্যুভয় নিঃশব্দভাবে এগিয়ে আসছে।

কী !! চুপ করে রইলে যে ?

আমি ডাক্তার। এর চেয়ে বড পরিচয় বর্তমানে আমার নেই।

আর কোন কথা বলল না সুকন্যা। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অপস্রিয়মানা সুকন্যার দিকে চেয়ে রইল রবীন।

আর কেবল সুকন্যাই বা কেন? অতিথিদের সকলেই অস্থির হয়ে উঠেছেন। কিন্তু উপায় কী? কাউকেই এখান থেকে যেতে যাওয়া হচ্ছে না। যারা নিষিদ্ধ এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছে, পুলিশ তাদের পাকডাও করে আনছে।

চেয়ার ছেডে উঠে পড়ল রবীন। তার দিনরাত্রির প্রতিটি মুহূর্ত কর্মব্যস্ততায় ভারাক্রান্ত। এখন অলস চিন্তার সময় কোথায়?

নার্সের পোষাক পরে হাজির হ'ল শীলা। আশ্রমের সেচ্ছাসেবকবাহিনীর প্রথম সৈনিক শীলা। সেই রাত্রির প্রায়ান্ধকার আশ্রমের একান্তে যে-ভীরু মেয়েটির সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল আজকের শীলা সে-মেয়ে নয়। কথায় বার্তায়, চাল-চলনে, অন্তরঙ্গতায় যে-মেয়েটি নিতান্ত অকারণেই তার অত কাছে এগিয়ে এসেছিল, সেই একটি বাত্রির ক্ষণিক বিহ্বলতার পর সে অনেক দূরে সরে গেল যেন। এখনও সে রবীনের পাশে-পাশে ছায়ার মত ঘুরে; কাজে ফাঁকি নেই এতটুকু, ক্লান্তিতে নেই বিরক্তি। একদিন সে নিজেকে বাঁচাবার আগ্রহে ব্যাকুল হয়েছিল, আজ সে অন্যকে বাঁচাতে মরণ-যজ্ঞে ঝাঁপ দিয়েছে।

চলুন, মিস লাহিড়ি।

শীলা আর রবীন পাশাপাশি হেঁটে চলেছিল ক্যাম্প হাসপাতালের দিকে। আকাশে কোন মেঘ নেই। তার ওপর পুরো চাঁদটাই আজ দেখা দিয়েছে। দৃষ্টির কোন বাধা নেই তাই।

মেলা ভেঙে গিয়েছে। পড়ে রয়েছে কেবল শূন্য দোকানের স্মৃতিচিহ্নগুলি। মেলার ঠিক মাঝখানে বিরাট একটি বৃত্ত। সেইখানে যজ্ঞ চলেছে। হোমের আগুন দপদপ করে জ্বলছে। সেই বৃত্তটিকে ঘিরে একটি জনতা দাঁড়িয়ে। তারই একপাশে জোর কীর্তন চলেছে। এই রকম কীর্তন চলেছে রাস্তার প্রতিটি মোড়ে-মোড়ে, প্রতিটি গ্রামে-গ্রামে।

দুজনে ক্যাম্প হাসপাতালে হাজির হ'ল। অনেকগুলি রোগী এখানে। রবীনের হুকুম রজনী কমপাউণ্ডার তামিল করেছে। যেখানে যত রোগী দেখতে পেয়েছে সব এনে হাজির করেছে এখানে।

হাসপাতালে গিয়েই কাজ সুরু হ'ল রবীনের।

শীলা বলল : সরকারী বিজ্ঞপ্তির একটা প্রতিবাদ করা উচিত, ডঃ দত্ত।

অনর্থক সময় নষ্ট করে লাভ নেই, মিস লাহিড়ি।

আমার মনে হয় অনর্থক নয়। না করলেই বরং দেশের লোকের মনে একটা অকারণ আস্থা ফিরে আসবে। এই মহামারির সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতা যে আমাদের দিন-দিন কমে আসছে তা তারা বুঝবে না।

নেই বা বুঝল। আমাদের কাজ আমরা করে যাব। বিনা বাধায় শত্রুদের এক ইঞ্চি জায়গাও ছেড়ে দেব না।

একটু হাসল শীলা; রবীনের দিকে একবার চেয়ে দেখল। তার চোখের তারায় একটা আলো চিকচিক করছে। সে-আলো দৃঢ় প্রতিজ্ঞার, আত্মাহুতির; যে-আহুতি চিরকাল নিজেকে, নিজের দেশকে ধ্বংস করে এসেছে।

জিজ্ঞাসা করল : রাজপুতানায় এত বীর থাকতেও, গোটা দেশটাই ধ্বংস হল কেন বলুন তো?

শীলার প্রশ্নের ধারাটি বুঝতে না পেরে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল রবীন।

নিজের প্রশ্নেরই উত্তর দিলে শীলা : একমাত্র কারণ হচ্ছে, দেশাত্মবোধের অন্ধ মোহ। শত্রুকে অনেক শক্তিশালী জেনেও তারা তাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ফলে, তারা নিজেরাও ধ্বংস হয়েছিল, দেশেরও স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারে নি।

রবীন বলল : হয়ত আপনার কথাই ঠিক; কিন্তু আমাদের দেশের লোকও তো কম অজ্ঞ নয়। যে-টুকু সাহায্য তারা অনায়াসেই পেতে পারত, তাও তো তারা নিল না।

কিন্তু এর জন্যে দায়ী কে রবীন বাবু?

রবীন এবার একটু বিস্মিতই হল। সত্যিই তো, এর জন্যে দায়ী কে? সে কি কেবল ঐ কুসংস্কারগ্রস্ত, অশিক্ষিত, দরিদ্র মানুষগুলি? এদের হিমালয়-অজ্ঞতার পিছনে ইতিহাসের যে দীর্ঘ অপপ্রচার নিঃশব্দে দেশের শিরায়-শিরায় শম্বুকগতি বিষক্রিয়ার মত দৃঢপদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে তাদের বাধা দেবে কে? তবু সে বলল : আপনার প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। তবে

শত্রুকে সামনে রেখে ওসব আলোচনা এখন না করাই ভাল। যেমন করেই হক, এপিডেমিককে আমাদের নষ্ট করতেই হবে। এভাবে আর বেশীদিন চলতে পারে না।

শীলা চুপ করে রইল।

রবীন একটু হেসে বলল: তা হলে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরনটা লিখেই ফেলুন। আমি বরং একবার রোগীদের দেখে আসি।

অদৃশ্য হয়ে গেল রবীন। শীলা চেয়ারে বসে এক দৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। দক্ষিণের খোলা জানালার ভিতর দিয়ে এক রাশ চাঁদের আলো ঘরের মধ্যে লুটোপটি খাচ্ছে। ছোট ছোট বাতাসের তরঙ্গ এসে এক একবার শীলার চুলগুলিকে এপাশ-ওপাশ করছে। শীলার কপালে, মুখে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমেছে। সামনে টেবিলের ওপর আজকের খবরের কাগজ, রোগীর চার্ট, নতুন আমদানি, আর মৃত্যুর তালিকা। তার একপাশে প্রয়োজনীয় কিছু ওষুধপত্রের সরঞ্জাম। কিন্তু কোন কিছুই ভাল লাগছে না তার। হঠাৎ মনে হল, সে যেন একটি অন্ধকার সমুদ্রের নীচে তলিয়ে যাচ্ছে। একেবারে একা, নিতান্ত-ভাবেই সঙ্গীহীন।

কতক্ষণ এই ভাবে কাটার পর চমক ভাঙল রবীনের ডাকে।

ওকি। কাঁদছেন কেন?

কাঁদছে? শীলা তড়াতাড়ি চোখের ওপর হাত দিয়ে দেখল। হ্যাঁ, দুটি চোখই তার জলে ভারি হয়ে উঠেছে। কিন্তু কেন এই অশ্রু? কিসের জন্যে, কার কাছে এই আত্মনিবেদন?

শীলা কিছুই করল না। কেবল টেবিলের ওপর মাথাটি নুইয়ে দিলে। রবীন প্রথমে সত্যিই কিছু বুঝতে পারে নি; বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কাটার সঙ্গে-সঙ্গে সে লক্ষ্য করল, শীলা প্রচণ্ড আবেগে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল না বোধ হয়। একটি রুদ্ধশ্বাস শীলার বুকের পাঁজর ঠেলে বেরোতে লাগল।

রবীন শীলার মাথায় হাত রেখে মুখটা আলোর দিকে তুলে ধরলে। উজ্জ্বল আলোতে সে দেখল শীলার গোটা মুখটিই জলে বোঝাই। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমাল বার করে মুছে দিল মুখটা। শীলা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল; ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল খোলা জানালার দিকে। পিছনে নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল রবীন।

সেখান থেকেই ফিরে দেখল শীলা। রবীনের দিকে চেয়ে একটু হাসল।

রবীন জিজ্ঞাসা করল: আপনি কাঁদছিলেন কেন?

শীলা প্রথমেই এর কোন উত্তর দিতে পারল না।

কি। চুপ করে রয়েছেন যে?

এবার হেসে ফেলল শীলা; বলল: মানুষ মাঝে মাঝে কাঁদে; কিন্তু তাই ব'লে তার জন্যে কৈফিয়ৎ দিতে হবে এ সংবাদ তো জানা ছিল না আমার।

একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলল রবীন: তাই বলুন। আমি ভাবলাম অন্য কিছু। এ সময়ে আপনার অসুখ করলে সব চেয়ে বেশী বিপদ হবে আমার। সে কথাটি মনে রাখবেন দয়া করে।

শীলা এগিয়ে এসে বলল: চেষ্টা করব। এখন, আপনার কাজ যদি শেষ হয়ে থাকে তো চলুন। রাত অনেক রয়েছে।

হ্যাঁ, চলুন।

নিস্তব্ধ রাত্রির বুকে আর কোন সাড়া নেই। কীর্তনীয়ার দলও বোধ হয় একটু বিশ্রাম নিচ্ছে। আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা সচেতন হযে উঠবে। তারপর সমস্ত রাত ধরে চলবে যাকে বলে নগর-পরিক্রমা। বিভিন্ন দলের মধ্যে জমে উঠবে তীব্র প্রতিযোগিতা।

মাঝে-মাঝে শেযাল আর কুকুরের অতর্কিত আর্তনাদ। আর কিছু নেই।

রবীন আর শীলা এগিয়ে চলেছিল।

রবীন বলল: ঠিক এই মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ একটি কবিতারই অংশ বারবার মনে হচ্ছে আমার।

কোন্‌টি?

আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে, হে সুন্দরি।

আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন, ডঃ দত্ত।

আর আপনার?

বিশ্রাম আমাদের জন্যে, নয়।

কেন বলুন তো? লোহার শরীর বুঝি আপনার?

শীলা একটু হেসে বলল: হয়ত। কিন্তু আপনার শরীরে এ ধকল সইবে না। আপনি কলকাতায় চলে যান।

আপনিও যে সুকন্যার মতই কথা বলছেন দেখছি।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। সুকন্যা কি বলে জানেন ?

না।

বলে, আমার সঙ্গে কলকতায় চলে এস। আমাদের যে কনেকশন তাতে তুমি বত্রিশ টাকা না পার, ষোল টাকা ফি নিশ্চয়ই করতে পারবে। দরকার হলে বিলেত য়্যামেরিকাও ঘুরে আসতে পার।

হো হো করে হেসে উঠল রবীন।

শীলা জিজ্ঞাসা করে ঃ আর কি বলেন ?

বলে, এ অরণ্য প্রদেশে আমার মত তীক্ষ্ণধী যুবক ডাক্তারের পড়ে থাকার যুক্তি তো নেই-ই, এমন কি মুক্তিও নেই। যে লোকটা মাসে কম করে পাঁচ হাজার টাকা হেসে-খেলে কামাতে পারে, সে লোকটা যদি আড়াই-শ টাকার মোহে পড়ে থাকে তাহলে তাকে মুর্খ ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে ? আর কী বলে জানেন ?

না।

বলে, আমার ভার সে চিরদিন বয়ে বেড়াবে।

আপনি কী বলেন ?

বলি নি কিছু। ভাবছি।

হঠাৎ ধমকে উঠল শীলা ঃ ভাবতে হয় শুয়ে শুয়ে ভাবুন গিয়ে। এখন চলুন তাড়াতাড়ি।

হঠাৎ ধমক খেয়ে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল রবীন। দেখল শীলা হনহন করে এগিয়ে চলেছে। রবীনও তার পিছু পিছু পা চালিয়ে দিলে। একটু পরেই ধরে ফেললে শীলাকে।

অমন করে ধমক দিলেন যে ?

সজোরে হাতটা ছিনিয়ে নিয়ে শীলা জবাব দিলে ঃ ছাড়ুন ; ভাল লাগছে না।

কথাগুলি কেবল যে দুর্বোধ্য তাই নয়, কর্কশও। রবীন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারপর বিরক্ত হয়ে বলল ঃ সরল মনে কথাটা বললাম, বিশ্বাস না করেন, না করবেন।

শীলা হেসে ফেলল এবার ; রবীনের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল ঃ আপনি মিস তালুকদারকে ভালবাসেন বুঝি ?

কাঁধে একটা শ্রাগ করে জবাব দিলে রবীন ঃ ব্যাপারটা এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি নে। মানে, সময় পাচ্ছি নে।

সময় হলে ভেবে দেখবেন কিন্তু।

কথা দিতে পারছি নে। চেষ্টা করে দেখব।

২১

পরের ক-টা দিন অস্বস্তি আরও বাড়ল। রবীনের কাছে সংবাদ এল, ওখান থেকে মাইল দুই দূরে চাণ্ডাদের গাঁয়ে মড়ক সুরু হয়েছে। এই বিংশ শতাব্দীতেও ওরা সভ্যতার আলো দেখে নি। আশ্রমের সীমান্ত সমতল ছাড়িয়ে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে যে দুর্ভেদ্য অরণ্যানী কয়েক'শ মাইলের পরিধি নিয়ে বিস্তৃত রয়েছে, তারই মধ্যে বাসা বেঁধেছে এরা। সাপ আর বাঘের সঙ্গে গলাগলি হয়ে কতদিন ধরে যে এরা এইভাবে বেঁচে রয়েছে তা কেউ জানে না।

বর্তমান আইন অনুসারে ঐ গ্রামগুলিও নিষিদ্ধ এলাকার মধ্যে পড়ে, এবং স্বাস্থ্যদপ্তরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আপৎকালীন সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করার ভার রবীনের ওপর। লোকগুলি যে কেবল সভ্য জগতের আলো, দেখে নি তাই নয়, সভ্য জগতকে তারা যেন পরিহার করেই চলেছে। বনের মধ্যে খাবারের অভাব দেখা দিলেই তবে ওরা সমতলের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে।

যাই হক, অবস্থাটিকে যাচাই করার জন্যে রজনী কমপাউণ্ডারকে পাঠানো হয়েছিল; সে ফিরে এসে যে সংবাদ দিলে তাতে রবীন বেশ চিন্তিতই হল।

ওরে বাপ্‌স। ওখানকার লোক নয়, স্যার, এক-একটা বাঘের বাচ্চা।

বলেন কী?

আর কী বলব, স্যার? ওখানে ঢোকে সাধ্য কার? ঢুকতে গেলে মেরে তক্তা বানিয়ে দেবে। শালারা সব জানোয়ার; জানোয়ার।

তা তো বুঝলাম। কিন্তু না গেলে তো চলবে না। লোকগুলি সব মারা যাবে যে।

রজনী কমপাউণ্ডার মুখ কাঁচুমাচু করে বলল: কিন্তু তাই বলে তো আর পৈতৃক প্রাণটা বেঘোরে দিতে পারি না। বাড়ীতে চার ছ-টা কাচ্চা-বাচ্চা রয়েছে। তাদের দেখবে কে?

রবীন কোন উত্তর দিল না; ভাবতে লাগল।

রজনী কমপাউণ্ডার সাহস দেয়: কিছু ভাবনা নেই, স্যার। ওরা গরান পুজো করেই সব রুখে দেবে। ভীষণ জাগ্রত দেবতা কি না।

হাঁ করে রইল রবীন।

ব্যাখ্যা করল রজনী কমপাউণ্ডার : বড় জাঁদরেল দেবতা, স্যার ; বড় এলেমদার। ঠাকুরের চোখদুটো দেখলেই রোগ তো রোগ, রোগের চোদ্দপুরুষ পাঁই-পাঁই করে দৌড় দেবে। ওদের মোড়ল আবার সেই ঠাকুরের পুরুৎ। গরানকে যদি বা ঠেকান যায়, মোড়লকে ঠেকাবে কে ?

শেষ পর্যন্ত পুলিশ সাহেবেরই দ্বারস্থ হতে হলে হল রবীনকে। সাহেব সব শুনে বললেন ; লোকগুল এমনিতে খারাপ নয় ; কিন্তু ওদের ধর্মে আঘাত দিলে সহ্য করার বান্দা ওরা নয়। তখন ওরা ফ্যানাটিক।

কিন্তু আপনি একটু সাহায্য করলে........

সাহেব হেসে বললেন : আপনার কি ধারনা, সরকার আমাকে গাড়ী গাড়ী পুলিশ দিয়েছেন ? আর দেন-ই যদি, অকারণ হামলা করার পক্ষপাতী আমি নই। শান্তি রক্ষা করাই আমার কাজ, শান্তি ভাঙা নয়।

তাহলে ওদের চিকিৎসার কী হবে ?

আপনাদের হাসপাতালে কি যথেষ্ট রোগী নেই ?

তা রয়েছে।

ওষুধপত্র ?

প্রয়োজনাতিরিক্ত নয়।

তাহলে আর ঝামেলা বাড়াবেন কেন ? ওরা যদি ভাল ভাবে আসতে চায়, আসুক। জোর করে কাউকে আনবার চেষ্টা করবেন না ; তাতে বিপদ বাড়বে।

শেষ পর্যন্ত ফিরতে হ'ল রবীনকে। কিন্তু সে চুপ করে বসে থাকার লোক নয়।

সেদিন রাত্রে রজনী কমপাউণ্ডারকে ধমক দিতে বাধ্য হল রবীন : একি শুনছি, রজনীবাবু ?

কি স্যার ?

আপনি নাকি ঘুষ নিয়ে মোড়লের সঙ্গে একটা রফা করে এসেছেন ?

ঘুষ !!

প্রথম ধাক্কাতেই রজনীবাবু কাৎ হয়ে পড়ল ; কিন্তু তার পরেই দ্বিগুন রবে ঘোষনা করল : ঘুষ। কোন্ শালা বলেছে আপনাকে ?

যথেষ্ট বিরক্ত হওয়া সত্ত্বেও গলার স্বর নামিয়ে রবীন বলল, কিন্তু এর সব দায়িত্ব আপনার।

প্রায় মরিয়া হয়ে উঠল রজনীবাবু: বললেই হল? কোন্ শালা আপনাকে লাগিয়েছে? একবার ধরতে পারলে, এইসা ধোলাই দেব যে বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়ব, হ্যাঁ।

এ-কথার কোন প্রতিবাদ না করে উত্তেজিত হয়েই পায়চারি করতে সুরু করল রবীন। তারপর নিজের মনে-মনেই বলল: কিন্তু গ্রামকে গ্রাম যে সাফ হয়ে গেল। আজ সাতদিন ওখানে আমাদের লোক ঢুকতে পারল না।

পুলিশ সাহেবকে বলুন। পলটন পাঠিয়ে দিক।

পুলিশ সাহেব রাজি নন।

এবার একগাল হাসল রজনী কমপাউণ্ডার; বলল: তালেই দেখেন, স্যার। পুলিশ সাহেবই ভয় পাচ্চেন, আমরা তো কোন্ ছার।

ঠিক রয়েছে। আমি একাই যাব।

ও-কাজটি করবেন না, স্যার। লোকগুলি খুনে।

হক। আমার কাজ আমাকে করতেই হবে।

মনে হল রজনীবাবু একটু ঘাবড়িয়ে গিয়েছেন, সে আমতা-আমতা করে বলল: কিন্তু....

আপনার কাজে যান রজনীবাবু।

মাথা চুলকোতে-চুলকোতে রজনী কমপাউণ্ডার অদৃশ্য হয়ে গেল। রবীন মাথা নিচু করে ঘরের মধ্যেই পায়চারি করতে লাগল। ডাক্তার হিসাবে এ-রোগটিকে সে অগ্রাহ্য করতে পারে না। সামান্য একক মানুষ হিসাবেও সে এদের হিমালয় অজ্ঞতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে অপারক। সে যাই করুক, তার সমস্ত দায় আর দায়িত্ব গিয়ে পড়বে তারই নিজের ঘাড়ে। অথচ তারই চোখের ওপর এতগুলি লোক নির্বিরোধে মারা যাবে, আর তাই সে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখবে, এটা ভাবতেও তার মাথাটা ঝিম-ঝিম করে উঠল।

ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকল সুকন্যা।

কি খবর সুকন্যা?

সমীরণের চিঠি এসেছে।

সুকন্যার দিকে মুখ তুলে চাইল রবীন।

ভাল।

সমীরণ লিখেছে, মেজর ভোঁসলের কাছ থেকে ছাড়পত্র নিয়ে সে যে-কোন দিন হাজির হতে পারে। আমরা যেন তৈরি থাকি।

সুখবর-ই বলতে হবে।

কিন্তু তোমার খুব আনন্দ হচ্ছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

নিরানন্দের কিছু নেই।

সুকন্যার স্বরে ব্যঙ্গ : তা থাকবে কেন?

রবীন একটু হাসল : থাকা তো উচিত নয়। তোমাকে এতদিন এখানে আটকে রাখতে বাধ্য হওয়ায় আমি দুঃখিত।

ধন্যবাদ। আর তোমার ওপর আমার যে দুর্বলতা জন্মেছিল তার জন্যে আমিও দুঃখিত; লজ্জার কথাটা নেই বা বললাম।

তুমি কি আজ ঝগড়া করতেই এসেছ?

সুকন্যা একটু দূরে সরে গিয়ে জানালার ওপর কনুই-এর ভর দিয়ে দাঁড়াল। তারপর রবীনের দিকে চোখ মেলে বলল : না। আমার অনেক কাজ রয়েছে। যে-কোন দিন সমীরণ এসে পড়তে পারে। সব গুছিয়ে-গাছিয়ে নিতে হবে তো। এখন কি আর বাজে কাজ করার মত সময় রয়েছে আমার?

কোন উত্তর দিল না রবীন। খোলা দরজার ভিতর দিয়ে অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল।

সুকন্যা ভ্রূ বাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করল : কথাগুলি বেশ মুখরোচক হচ্ছে না, না?

এবার সতি-সত্যিই হেসে ফেলল রবীন : খুব খারাপ লাগছে না। তোমার কিছুটা ভোগান্তি হ'ল এই যা।

হঠাৎ ধমকে উঠল সুকন্যা : আবার সহানুভূতি? পরের সহানুভূতিকে আমি ঘৃনা করি।

হঠাৎ ধমকানি খেয়ে একটু অবাক হয়ে চেয়ে রইল রবীন; পায়চারি করল; তারপর বলল : কলকাতায় ফিরে যাচ্ছ, সে তো আনন্দের কথা, সুকন্যা। অত চটছো কেন?

সুকন্যা উত্তেজিতভাবে বলল : এক কথা কতবার বলবে? কিন্তু একটা কথা তোমাকে জানিয়ে দিই আজকে।

বল!

সমীরণ এলে যে ক-ঘণ্টা থাকি, আমার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করবে না।

নিশ্চয়ই না।

সমীরণ ওসব ভালবাসে না।

শুনলাম।

হ্যাঁ, শুনে রাখ! ভুলে যেও না।

না। আর কিছু?

তোমার সঙ্গে আমার যে আলাপ রয়েছে সেকথা যেন সে ঘুনাক্ষরেও বুঝতে না পারে।

তথাস্তু। এখন তুমি ঘুমোতে যাও; আমি বড় ক্লান্ত।

যাচ্ছি, যাচ্ছি। ব্রুট কোথাকার।

ঝড়ের মত বেগে সুকন্যা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পিছনে রেখে গেল তার অব্যক্ত মনের জ্বালাটুকু।

ঘুম, ক্লান্তি, আর অবসাদ সব কেটে গেল রবীনের। সুকন্যার আজকের ব্যবহার কেমন যেন একটু জটিল। পারিপার্শ্বিক অবস্থাটি যদিও এখনও অপরিবর্তনীয়, তবু ব্যবহারিক বুদ্ধির দিক থেকে সুকন্যার কলকাতায় ফিরে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। চিন্তা সেজন্যে নয়; চিন্তা তার এই কথা ভেবে যে সুকন্যা তাকে অতটা ছোট মনে করল কেমন করে?

বাইরে মৃদু পায়ের শব্দ শোনা গেল। শীলা এসে ঢুকল।

একি শুনছি, ডঃ দত্ত? আপনি নাকি চাণ্ডাদের গাঁয়ে যেতে বদ্ধপরিকর?

আপনিও শুনেছেন? রজনীবাবু যে একটি গেজেট তা তো জানতাম না।

রজনীবাবু ভাল করেছেন, কি খারাপ করেছেন জানি নে; তবে আপনি মোটেই ভাল কাজ করছেন না।

মানুষ, সে বাঘও নয়, ভালুকও নয়। তাদের এত ভয় করেন কেন মিস লাহিড়ি?

শীলা সে-কথার জবাব না দিয়ে বলল: না, না; প্রতিজ্ঞাভঙ্গ আপনাকে করতেই হবে।

রজনীবাবুও একটু আগে আমাকে এই কথাই বলে গেলেন। অথচ প্রতিজ্ঞা আমি এখন কিছু করি নি। আমার ওপরে যে দায়িত্ব রয়েছে তারই কিছুটা পালন করার চেষ্টা করছিলাম মাত্র। কিন্তু তাতে এত বাধার সৃষ্টি হবে বুঝতে পারি নি।

চাণ্ডারা এমনিতেই একটু বিপজ্জনক। কিন্তু সেই সঙ্গে সেখানে আরও একটি বিপজ্জনক লোক হাজির হয়েছে সে সংবাদ রাখেন?

না। কে?

তারাদাস ব্রহ্মচারি।

বলেন কী?

আমার সংবাদ তাই। তিনি নিশ্চয়ই সেখানে শুধু শুধু বসে নেই। আচার্যদেবের ধারনা, তিনি একটা গোলমাল পাকাবার চেষ্টা করছেন।

রবীন কেবল বিস্মিত নয়, একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। আচার্যদেবের সঙ্গে সেদিনের সেই নীতিগত বিরোধের পর থেকেই তারাদাস হঠাৎ একেবারে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন। কাজের চাপে তারাদাসের সম্বন্ধে সেও বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করার সময় পায় নি। রবীন জানত, এ বিরোধ নীতির পার্থক্যের ওপর দাঁড়িয়ে নয়, দাঁড়িয়ে অধিকারবোধের ওপর, আত্মম্ভরিতার ওপর। তারাদাসের সেই স্পর্শকতার জায়গাটিতে মোচড দিয়েছিলেন আচার্যদেব। সেই মোচডের পর মানুষের পক্ষে সব কিছু করাই সম্ভব।

আচ্ছা, মিস লাহিড়ি, আপনি জীবনধারার কিছু পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন, তাই নয়?

শীলা হেসে বলল: হ্যাঁ। আপাতত সে মত বর্জন করেছি।

এবং তারাদাসই সে-বিষয়ে অগ্রনী ছিলেন?

আমিও তাই শুনেছি।

সেই মত সহসা গ্রহণই বা করলেন কেন, আর বর্জণই বা করলেন কেন?

শীলা চুপ করে রইল।

অবশ্য বলতে আপত্তি থাকলে অন্য কথা।

শীলা হাসল: তাতে আপনার সন্দেহটা কমবে কি?

রবীন একটু ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল: আরে না, না। সন্দেহ আবার কী? নিছক কৌতূহল। আর কেবল কৌতূহলই বা কেমন করে বলি?

তাহলে?

আপনাদের আশ্রমটিকে আজও বুঝতে পারলাম না আমি। বাইরে থেকে একটি নিখুঁৎ ধর্মকেন্দ্র। সাধু, সন্ন্যাসী, মন্দির, দেবতা, বিগ্রহ—কোন কিছুই বাদ নেই। অথচ....

ভিতরে বিরাট একটি নোংরামি চলেছে, এই তো?

রবীন হাঁ করে চেয়ে রইল শীলার দিকে।

আপনার অনুমান ঠিকই। কিছু নোংরা লোক তো রয়েছেই। আর নোংরা লোক কোথায় নেই, ডঃ দত্ত? তবে ভাল লোকও সেই সঙ্গে কিছু

রয়েছে বইকি। সেই রকম দু একজন এখানে না থাকলে আমাকে তারাদাসের হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারত না।

কার কথা বলছেন?

নিতাই ব্রহ্মচারির।

চুপচাপ নিরুপদ্রব এই মানুষটিকে অত্যন্ত কাছাকাছি দেখার খুব বেশী সুযোগ হয়নি রবীনের। যতটুকু হয়েছে তার মধ্যে আসল মানুষটিকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। তারাদাসের সঙ্গে নিতাই ব্রহ্মচারির তফাৎ এইখানেই। একজন বহির্মুখী, অপরজন অন্তর্মুখী। তারাদাস এই আশ্রমের সদরমহল, নিতাই ব্রহ্মচারি অন্দরমহল। তাই বোধ হয় আচার্যদেবের কাছে দুজনেই আশ্রমের দিক থেকে সমানভাবে অপরিহার্য ছিলেন।

নিতাই ব্রহ্মচারির সঙ্গে আপনার কত দিনের আলাপ, মিস লাহিড়ি?

বছর চারেক। অর্থাৎ যখন আমাকে তারাদাস এখানে নিয়ে এলেন।

কোথা থেকে?

হঠাৎ শিউরে উঠল শীলা। মুখটা একটু বিবর্ণ হয়ে গেল। ঘাড়টা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে রজনী কমপাউণ্ডারের ইঙ্গিতটা বিদ্যুতের মত তার মনের আকাশে ঝলসে উঠল। কিন্তু সেদিনও যেমন সে রজনীবাবুর কাছে অকারণ কোন কৌতূহল প্রকাশ করে নি, আজও তেমনি শীলার কাছে উদ্ধত প্রশ্নের চাবুক নিয়ে দাঁড়াল না।

বলল: না, না। ও কিছু নয়; আমি এমনিই জিজ্ঞাসা করছিলাম। উত্তর দেওয়ার কোন বাধ্যবাধকতা নেই আপনার দিক থেকে।

শীলা এবার একটু হাসল; তারপর মুখটা ফিরিয়ে বলল: বাধ্যবাধকতা না থাকলেই যে ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার কষ্ট হবে তাই বা ভাবছেন কেন? জীবনের স্রোতে ভাসতে-ভাসতে অনেক ঘাটা-আঘাটা পেরিয়ে আসতে হয়েছে; যাদের আমি সরিয়ে রাখতে পারিনি, তারাই আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে; ফুল তুলতে গিয়ে আমার মত অনেকেই কাঁটার আঘাত খেয়ে ফিরেছে; আমি সেই বিরাট হতভাগ্য জনতার একজন। শুনতে যদি আপনার লজ্জা না হয়, নিজের মুখে নিজের কাহিনী বলতে আমার কোন লজ্জা হবে না।

বলুন তা হলে। কিন্তু অমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবে না। বসুন।

আরও হাজারটা মানুষের মতই তার কাহিনীটিকে নিঃসন্দেহে পৃথিবীর

একটি অতি তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে ফেলা যায়; চমৎকারিত্ব অথবা অস্বাভাবিকত্বের বাটখারায় তাদের ওজন করা চলে না।

দরিদ্র বাপমার মেয়ে হয়েই সে এই পৃথিবীতে এসেছিল। হেসেছিল, কেঁদেছিল, বড় হয়েছিল। আর সেই সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই বাপমাকে হারিয়ে মামার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল কলকতায়। মামার বিরাট সংসার। রোজগার এমন কিছু বেশী নয়। গলগ্রহ হওয়ারই কথা; প্রথম কয়েকটি মাস হয়েছিলও তাই; তারপর হঠাৎ মামা তাকে মাথায় করে রাখলেন। কেন, সেইটাই এজগতে সবচেয়ে সহজ অথচ মানুষের প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

মামার ওপর মামীর নির্ভরতা হয়ত ছিল, কিন্তু নির্ভরশীলতা ছিল না। যে-সংসারে দুবেলা দুমুঠো মোটা চালের ভাতের ব্যবস্থা করতে স্বামীকে হিমসিম খেতে হয, সে-স্বামীকে কোন্ স্ত্রী সুস্থ মস্তিষ্কে বুদ্ধিমানের পর্যায়ে ফেলতে পারে? তার ওপর অনূঢ়া বযস্থা একটি মেয়েকে যে ঘাড়ের ওপর চাপানো হল, তারই বা হেঁপা পোয়ায কে? আর চাপানোই যদি হল, তো যত শীঘ্র সম্ভব তাকে পাত্রস্থা করার বাধা কোথায? বাধা যদি না থাকে, তাহলে মামীর যে ভাইপোটি সম্প্রতি পিসীর বাড়ি যাতায়াত করতে সুরু করেছে সেই বা অযোগ্য কিসের? ভাইপো-টি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে প্রাণটা মাত্র নিয়ে ফিরে এসেছে; সেটাও কম কৃতিত্বের কথা নয়। সরকারের কাছ থেকে ভাতার বদলে অবশ্য দুটো পা-ই শত্রুপক্ষকে উপহার দিতে হয়েছে। তা হোক, যার ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা তার হাতেরই বা দরকার কী, পায়েরই বা প্রয়োজনটা কোথায়? দ্বিতীয় বিপদ হচ্ছে, ঘরে বয়স্থা অনূঢ়া মোটামুটি খুপসুরৎ মেয়ে বিষধর সর্পের সঙ্গেই তুলনীয়। পাড়ার একটি আতংক বিশেষ। কিন্তু এমনি মামীর ভাগ্য যে অমন যে গোবেচারা মামা, তিনিও মামীকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেন।

কেন? কয়েক দিন আগে মামার অফিসে গানের জলসা হয়েছিল। সেই অফিসে গান গেয়েছিল শীলা। সেই থেকে তাঁর অফিসের নতুন ছোকরা সাহেব মিঃ বসু ছলে-ছুতোয় তাঁর বাড়িতে যাওয়া আসা করতে সুরু করছে। আর তারই কিছুদিনের মধ্যে অফিসে মামার পদোন্নতি হয়েছে। এ হেন অবস্থায় কোন্ মামা তাঁর স্ত্রীর খোঁড়া ভাইপোকে বরদাস্ত করতে রাজী হবেন?

মামী বারবার সাবধান করেছিল, ঘি আর আগুন একসঙ্গে রাখছ। ঠেলা সামাল দিয়ো পরে।

কৈশোরের সেই দিনগুলি শীলার মনকে যখন শিলীভূত করার চেষ্টা

করছিল ঠিক সেই সময়ে দীপংকরের সংস্পর্শ তাকে পাষাণী অহল্যার মত মুক্তি এনে দিল।

তুমি কি আমাকে সত্যিই ভালবাস?

সে বিষয়ে কি তোমার এখনও সন্দেহ রয়েছে ?

না। জীবনে সন্দেহ করতে শিখি নি কোনদিন।

শিখলে ভাল করতে শীলা, ঠকতে কম।

তুমি বুঝি আমাকে ঠকাতে চাও?

দীপংকর শীলাকে কাছে টেনে বলেছিল : ছিঃ!

তারপর যা অবশ্যম্ভাবী তাই ঘটল। দীপংকর আর শীলা কলকাতার একটি ফ্ল্যাটে এসে হাজির হল। মামা অন্ধকারে মুখ লুকোলেন, মামী তারস্বরে স্বামীর নির্বুদ্ধিতার কেচ্ছা করে বেড়ালেন। আর এদিকে সেই দিনেই হঠাৎ বাবার কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেয়ে সাতদিনের জন্য দীপংকর বিশেষ প্লেনে চেপে ভারতের বাইরে পাড়ি জমাল। ফ্ল্যাটে পড়ে রইল শীলা আর একটি মাত্র পরিচারিকা।

সাত দিনের জায়গায় সাত মাস কাটল। প্রথম প্রথম কয়েকটা চিঠি আসত ; কিছু টাকাও এসেছিল ; তারপর সব বন্ধ হয়ে গেল। ছুটি মাস সে ফ্ল্যাটে দীপংকরের পথ চেয়ে বসে ছিল ; তৃতীয় মাসে সে ফ্ল্যাট থেকে মামার বাড়ির দিকে ধাওয়া করল। স্থান পায় নি সেখানে।

অর্থাভাব এড়াতে পারে নি শীলা ; অমর্যাদার হাত এড়ানোও দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। নিজের ওপর নির্ভর করার শক্তি, সামর্থ্য, আর শিক্ষা কিছুই ছিল না তার। সুতরাং পরিচারিকার ওপরেই নির্ভর করতে হল বেশী! একটা সময় এল যখন পরিচারিকাই তার অভিভাবিকার স্থান গ্রহন করল। কলকাতার ঐ ফ্ল্যাটটিতে প্রতিদিন কত লোকেরই যে আমদানি হ'ত, তা গনে শেষ করা শেষ পর্যন্ত দায় হয়ে পড়েছিল। কিন্তু শিকারীর কাছ থেকে প্রথম গুলি খাওয়া বাঘিনীর মত সে নবাগতের ছায়া দেখলেই সাবধান হয়ে উঠত। যেখানে পারত না সেখানে আততায়ীকে আক্রমন করতেও সে দ্বিধা করত না। তার সেই ভয়ংকর মূর্তি দেখে আততায়ীরা পিছিয়ে যেত।

একদিন রাত্রে কোনদিকে চিন্তা না করেই শীলা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। দেশের বাড়িতে ফিরে যাবে। দেশের বাড়িতে কেউ নেই তা সে জানত ; যারা রয়েছে তারা যে তাকে আশ্রয় দেবে না এটুকু বোঝার মতও তার বুদ্ধি হয়েছিল।

নিমজ্জমান মানুষের একেবারে শেষ চেষ্টা হিসাবে সে সেই কুটোটাকে আশ্রয় করার জন্যেই হাওড়া স্টেশনে হাজির হল। স্টেশনে এসেই লক্ষ্য করল তার কাছে পয়সা নেই। ভয়ও করল কিছুটা। একবার মনে হল, ট্রেনের তলায় মাথাটা পেতে দেয়। একবার ভাবল, ট্রেনে উঠে কোথাও চলে যায়। কিন্তু কিছুই করল না সে। শেষ বিপর্যস্ত নিরাশ্রয়, বিপস্ত, অসহায় মানুষের চিরকালের সম্বল একটা থামের ওপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে উঠল শীলা।

যাবেন কোথায় ?

মুখ তুলে দেখল শীলা। একটি পুলিশ দাঁড়িয়ে।

জানি নে।

আসছেন কোথা থেকে ?

জানি নে।

আপনার সঙ্গে কে রয়েছে ?

কেউ না।

পুলিশ অফিসারটি এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শীলার দিকে। অভিজ্ঞ দৃষ্টি দিয়ে তাকে মেপে-মেপে দেখতে লাগল।

কী করতে চান এখন ?

ট্রেনের তলায় মাথা পেতে দিতে।

এবার আরও ভাল করে চেয়ে দেখল অফিসারটি। তার মুখের শিরাগুলি কুঞ্চিত হল। বলল : আসুন আমার সঙ্গে।

কোথায় ?

থানায়।

মুখ শুকিয়ে গেল শীলার।

থানায় কেন ? আমি তো চুরি করি নি।

অফিসারটি হেসে বলল : কিন্তু এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে আপনাকে কেউ চুরি করতে পারে। আমার সঙ্গে আসুন ; ভয় নেই।

সেখান থেকে রেসকিউ হোমে। এখানে যে তার জীবন আনন্দের হয়েছিল তা নয় ; তবে সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল। মাস কয়েক কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিল সে। কিছু হাতের কাজও শিখেছিল। কিন্তু কয়েকমাস পরেই বুঝতে পারল, এও বন্যপশু-অধ্যুষিত অরণ্য বিশেষ। যে সময়ে মানুষে আশার বালুচরে আনন্দের ইমারৎ তৈরি করে, সেই সময়ে শীলার জীবন-দ্বীপের চারপাশ

ঘটনাবিপর্জয়ের দুর্বার ধাক্কায় ঝরে ঝরে পড়ছিল। এইভাবে আর কিছুদিন কাটলেই হয়ত তার জীবনের শেষ মৃত্তিকাটুকু পর্যন্ত অতলস্ত সমুদ্রের গর্ভে তলিয়ে যেত। তলিয়েই যদি যায়, তাহলে আর বেঁচে থেকে লাভ কী?

ঠিক এই সময় তারাদাস ব্রহ্মচারি হাজির হলেন রেসকিউ হোমে। নারীদের স্বাবলম্বিনী করার জন্যে তাঁরা বাংলার বাইরে একটি আশ্রম খুলেছেন। তারই জন্যে তারাদাস মহিলা সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছেন। সেই আশ্রম থেকে সেবারে যে কটি নারী আনন্দধামে এসেছিল তাদের মধ্যে শীলা একজন।

এই আশ্রমে আপনি শান্তি পেয়েছেন?

শীলা একটু হাসল: আমার ভাগ্য সেই কইমাছের ভাগ্যের মত, ডঃ দত্ত। মাছটা ভাবল, খোলাটা বড্ড গরম। দিই আগুনে ঝাঁপ। তেমনি এই আনন্দধাম। আমাদের জীবনে আনন্দধাম সেই বয়লারের আগুনের মত। বাইরে থেকে এতটুকু বোঝা যায় না; ভিতরে যা ঢোকে তাই পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

আচ্ছা, চম্পাও কি?....

কেবল চম্পাই নয়, ডঃ দত্ত। চম্পার মত অনেক মেয়েই এখানকার কামনার আগুনে জীবন বিসর্জন দিয়েছে।

২২

আচমকা ঘুমটা ভেঙে গেল রবীনের। ঘরের বাতিটা টিম-টিম করে জ্বলছে। সেই আলোতে দেখল, রজনী কমপাউণ্ডার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার শরীরের মধ্যে একটি উত্তেজনা; কপালে বোধ হয় বড-বড ফোঁটার ঘাম জমেছিল; সেইগুলিই সে হাত দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলল। মাথার চুলগুলি রীতিমত বিপর্যস্ত; দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সমানে হাঁপাচ্ছে। যেন অনেক পরিশ্রম করে এই-মাত্র ফিরে এল কোথা থেকে।

চারপাশে নিটোল অন্ধকার জমাট বেঁধে বসে রয়েছে। ঠিক এই সময় রজনী কমপাউণ্ডারকে আশা করে নি সে।

কী ব্যাপার রজনীবাবু?

নিয়ে এসেছি, স্যার।

কাকে?

মোড়লের ছেলেটাকে!

উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়ল রবীন : বলেন কী ?

হ্যাঁ। বাড়িতে শালাদের কেউ নেই। সবাই গিয়েছে গরান ঠকুরের থানে। মহাধুমধাড়াক্কা করে পূজো হচ্ছে। দুটো কেঁদো-কেঁদো মোষ বলি হয়েছে আজ সকালে। সেই সঙ্গে হাড়িয়া আর মহুয়া খেয়ে ব্যাটারা বুঁদ হয়ে রয়েছে। সেই সুযোগে মোড়ালের ছেলেটাকে নিয়ে চম্পট দিলুম।

রবীন কান পেতে শুনলো, দূরে, পাহাড়ের দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ওপাশে একটানা মাদল বেজে চলেছে। শব্দ খুব জোরালো নয়, নিঃস্তব্ধ রাত্রির আস্তরণ ভেদ করে সেই শব্দ অত্যন্ত ধীরে ধীরে ভেসে আসছে। কান পেতে থাকলে শুনতে না পাওয়ার কথা নয়।

ঐ শুনুন, স্যার, ঝাঁপাই ছক্করের শব্দ।

কিন্তু আপনি হাঁপাচ্ছেন কেন ?

আর কেন ? বাপের কপাল জোর, তাই কোন রকমে প্রানটা নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছি আমরা।

কী রকম ?

য়্যাম্বুলেন্স রেখেছিলাম পাহাড়ের এপাশে। মোড়লের ছেলেটাকে তার উপর চাপিয়ে ভাবলাম, সুযোগ যখন পেয়েছি, এই তালে আর ক-টা সরিয়ে ফেলি। আমাদের বরাৎ খারাপ। পড় তো পড়, ঝপাং করে পড়ে গেলাম একদল জেনানার পাল্লায়। মেয়েগুলো নেশায় তর হয়েছিল, তাই প্রথমটা ঠাহর হয় নি তাদের। কিন্তু একবার ঠাহর হওয়ার পরেই চীৎকার করতে করতে তাড়া করল আমাদের। উঃ, মাগীদের চরণে নমস্কার। আরবী ঘোড়া ওদের কাছে নস্যি। আর হাতের কী তাক! বিবেচনা করুন, সেই অন্ধকারে বোঁ-বোঁ করে ঢিল ছুঁড়তে লাগল। আমরা তো তখন পাঁই-পাই দৌড়। দেখুন স্যার, শরীরের অবস্থাটা। একবার ধরতে পারলে ঐ গরান ঠাকুরের কাছে বলি দিয়ে ছাড়ত।

বলেন কী ?

রজনীবাবুর স্বরে ক্ষোভ : আর বলব কী স্যার ? গরীবের কথা তো আর শুনলেন না। বিদেশ-বিভূঁই-এ আমি থাকতে আপনি বিপদে পড়বেন, সেও তো একটা কাজের কথা নয়।

এ-কথার কোন জবাব দিল না রবীন। কপালে হাত রেখে কয়েক সেকেণ্ড মুখ নিচু করে বসে রইল। তারপর উঠে বলল : চলুন।

রজনী কমপাউণ্ডারের চোখে রাজ্যের বিস্ময় : কোথায় ?

হাসপাতালে।

আপনি ক্ষেপেছেন, স্যার ? লিখে রাখুন, ও যদি বাঁচে তো আমার কমপাউণ্ডারি শেখাই বৃথা হয়েছে। কাল না মরে, পরশু নিশ্চয়। স্বয়ং ধন্বন্তরী এলেও কিছু করতে পারবে না ওর। আপনি শুধু শুধু এসময়ে গিয়ে কী করবেন ? তার চেয়ে বিশ্রাম করুন আজ ; কাল যা হয় হবে।

রবীন পা বাড়াল দরজার দিকে : ঘুম আর হবে না। বাঁচাবার চেষ্টা তো করতে হবে একটা।

কথা বলতে-বলতে দুজনে হাসপাতালে হাজির হল। সাধারণ রোগীদের কাছ থেকে সরিয়ে আলাদা একটি ঘরে ছেলেটিকে রাখা হয়েছে।

ব্যাপারটিকে বিশ্লেষণ করল রজনীবাবু : উপায় নেই স্যার। এ অঞ্চলে চাঁড়াল একেবারে বেয়েল্লা জাত। জল চলে না ওদের হাতে। ছায়া মাড়ালেও চান করতে হয়।

ঘরের মধ্যে ঢুকে এল রবীন। লম্বায়-চওড়ায় ছেলেটি জোয়ান। কালো কুচকুচ করছে গায়ের রঙ। এক মাথা ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া বাবরি চুল। দুটি হাতের কব্জীর ওপর বাজপাখীর উল্‌কী আঁকা। কানে মাকড়ি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালার মত একটা মালা। গোটা গায়ে বসন্তের গুটি বেরিয়েছে। রসাল গুটিগুলি মৌমাছির ঝাঁকের মত এক এক জায়গায় ছেঁকে বসেছে। বেঘোরে পড়ে রয়েছে ছেলেটি ; এক একবার যন্ত্রনায় কাতর হয়ে চোখ মেলার চেষ্টা করছে ; কিন্তু চোখের পাতাগুলি ভারি হয়ে নেমে আসছে সঙ্গে-সঙ্গে। মাঝে-মাঝে শরীরটা সঙ্কুচিত হচ্ছে। নাক আর মুখের ভিতর দিয়ে একটা অস্বস্তিকর ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ বেরিয়ে আসছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখল রবীন ; তারপর চিকিৎসার প্রাথমিক পর্যায় শেষ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তখন সকাল হয়েছে।

ঘর থেকে বেরোবার মুখেই রজনীবাবুর সঙ্গে দেখা। তাকে দেখে মনে হ'ল, সে যথেষ্ট বিব্রত হয়েছে। বলল : ব্যাটা এসেছে, স্যার।

কে ?

ঐ গুয়োটার বাপ। মোড়ল।

সে কি ?

রজনীবাবু ঘাড় নেড়ে বলল : হ্যাঁ। কেমন করে খবর পেল কি জানি।

একা এসেছে, না, দলবল নিয়ে এসেছে?

একাই। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। আপনি কিন্তু যাবেন না, স্যার।

কেন?

শালাদের বিশ্বাস নেই। হয়ত ছোরাই বসিয়ে দেবে বুকে।

রবীন রজনী কমপাউণ্ডারের দিকে চেয়ে রইল। সেখানে একটা আতংকের ছায়া অত্যন্ত সন্তর্পনে গুটি গুটি এগিয়ে আসছে।

বলল: চলুন না দেখি, কী বলে?

ধীরে ধীরে হাসপাতালের বাইরে বেরিয়ে এল রবীন। গেটের কাছেই দুজন পুলিশ। তাদের পাশে একটি জোয়ান মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার শরীরে পোষাকের বাহুল্য নেই, কিছুটা বাহুল্য রয়েছে তার চলাফিরা আর চাহনির ভঙ্গিতে।

রবীনকে দেখেই সে সেলাম করে দাঁড়াল; তারপর অনর্গল কথা বলে গেল। তার কথার বার আনা বুঝল না রবীন। শব্দ আর ফুৎকারই বেশী; ভাবপ্রকাশক ভাষা যৎকিঞ্চিৎ। সব জড়িয়ে রবীন যা বুঝল তা হচ্ছে এই যে হাসপাতালের লোকে গত রাত্রিতে তাদের পাড়া থেকে তার ছেলেকে ধরে এনেছে। তাকে ছেড়ে দিতে হবে।

এইটাই আশংকা করেছিল রবীন; তাই সে বিশেষ চিন্তিত হল না। মোড়লকে আকার, ইঙ্গিত আর ভাষা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করল যে এখানে তার ছেলে ভালই থাকবে; একেবারে সেরে উঠলে তখন বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু লোকটা কিছুতেই বুঝতে চায় না। শেষ পর্যন্ত দুজনের মধ্যেই একটা জিদ চেপে গেল। তারপর এমন একটা সময় এল যখন গেটের দরোয়ানের ওপর তাকে ছেড়ে দিয়ে রবীনের ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না। তারই কিছু পরে রবীন লক্ষ্য করল, দূরে দিঘীর পাড়ে একটা বটগাছের তলায় লোকটি চুপটি করে বসে রয়েছে; আর মাঝে-মাঝে হাসপাতালের দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছে। তারও অনেক পরে লোকটি ধীরে ধীরে পাহাড়ের পাকদণ্ডী বেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আশ্রমে হাজির হল রবীন। সেখানে প্রথম দেখা হল শীলার সঙ্গে।

ভোরেই কোথায় গেছলেন রবীনবাবু?

হাসপাতালে। জানেন, রজনীবাবু একটি অসম্ভব কাজ করেছেন।

কী বলুন তো ?

খোদ মোড়লের ছেলেটাকে পাকড়িয়ে এনেছেন।

শীলা যেন আর্তনাদ করে উঠল : য়্যাঁ !

রবীন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল : হল কী আপনার ?

না ; কিছু নয়। কিন্তু রজনীবাবু সব জেনেশুনে এমন কাজ করলেন কেমন করে ?

রবীন বলল : ভালই তো করেছেন।

শীলা একটা ঢোক গিলল। তারপর বলল : বাঘের বাচ্চা ছিনিয়ে আনার বিপদ রয়েছে রবীনবাবু।

রবীন ঘাড় নাড়ে : বাঘ না হাতি। আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হয়েছে মোড়লের। সুস্থ ছেলে ফিরে পেলে খুশিই হবে।

তাই হ'ক। কোন গোলমাল না হলেই ভাল।

আর একজনের ছায়া পড়ল দরজার কাছে ; সে সুকন্যা। দরজার সামনে এসেই থমকে দাঁড়াল।

এস সুকন্যা।

না, থাক।

থাকবে কেন, এস।

ভিতরে যাওয়ার দরকার নেই। সমীরণ আজ সকালেই এসেছে একেবারে মেজর ভোঁসলের ছাড়পত্র নিয়ে।

ভাল। কবে যাচ্ছে ?

দেখি। আজও পারি, কালও পারি, আবার দুচার দিন পরেও পারি।

কথাগুলি বলেই ঝোলানো সাড়ীর আঁচল উড়িয়ে প্রস্থান করল সুকন্যা।

২৩

রাতই হয়েছে কিছুটা। হাসপাতালে বসেছিল শীলা। আজকে তার নাইট ডিউটি রয়েছে। রবীন ক্যাম্প থেকে ফিরলেই শীলা ক্যাম্পে চলে যাবে।

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে দেখল সমীরণ দাঁড়িয়ে।

সমীরণ ঘুরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল : তুমি এখানে ?

শীলা বলল : ঐ প্রশ্নটাই তো তোমাকে করা উচিত ছিল আমার।

কাল তো চিনতেই পারলে না দেখলাম।

চিনতে না-পারাটাই তো ভাল।

তোমার অনেক পরিবর্তন হয়েছে দেখছি।

তুমিও যে ঠিক এক রয়েছ তাতো মনে হচ্ছে না।

সমীরণ একটু হেসে বলল : কথা বলার ধারাটাও বদলিয়েছ।

শীলাও হাসল : বদলানোর দায়িত্ব বুঝি একা তোমারই ?

হঠাৎ কোন উত্তর দিল না সমীরণ। ঘরের দেওয়ালে যে দুচারখানা ছবি টাঙানো ছিল সেইগুলির দিকেই চেয়ে-চেয়ে ধীরে ধীরে পায়চারি করল একটু। তারপর অকস্মাৎ ঘুরে বলল : আশা করি, সেই সব পুরান দিনের কথা তুমি বলতে সুরু করবে না।

না। প্রথমত, সে সব তুচ্ছ কথা স্মরণ করে নষ্ট করার মত সময়ও আমার নেই। দ্বিতীয়ত, সেদিনের সব কিছুকেই আজ ঘৃণা করতে শিখেছি।

ঘৃণা !!

হ্যাঁ।

একটু চুপ করে রইল সমীরণ ; তারপরে বলল : ভুল সকলেই করে। যে সময়ে আমাদের প্রথম দেখা হয়, মানুষের গোটা জীবনের মধ্যে সেইটাই হল সবচেয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীন। আমাদের জীবনের সেই কলঙ্কিত অধ্যায় যে আমরা মুছে ফেলে এগিয়ে আসতে পেরেছি এইটাই আমাদের পরম সৌভাগ্য।

তোমার যে সৌভাগ্য তা তো দেখতেই পাচ্ছি ; কিন্তু সেদিন যে কিশোরীটি তোমাকে আশ্রয় করে সংসার ছেড়েছিল, তার জীবনে কোনদিনই সৌভাগ্য আসে নি। নিরপরাধ আশ্রয়হীনা একটি অনাথাকে তোমাদের ভদ্র সংসার সেই থেকে পিষে ফেলার চেষ্টা করেছে। তার কোন সান্ত্বনা নেই।

এত সুন্দর গুছিয়ে কথা বলতে শিখলে কোথা থেকে ?

বলা কষ্টকর।

হুঁ ! আমার জীবনের কাহিনী শুনতে ইচ্ছা যায় না তোমার ?

না।

কিন্তু তোমার কাহিনী শুনতে ইচ্ছা করে আমার।

অবান্তর।

সমীরণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল শীলার দিকে। এতটা সহজ উত্তর হয়ত সে আশা করে নি শীলার কাছ থেকে।

তুমি আমাকে ভুল বুঝছো নাত ?

ভুল ? ভুল বুঝবো কেন ? তোমাকে আগে বুঝতে পারি নি ; পরে বুঝেছি। আর যা বুঝেছি তা যে ভুল সেটা মনে করার কোন কারণ ঘটে নি এখনও।

কী বুঝেছ জানতে পারি ?

প্রয়োজন কিছু নেই।

তবু ?

তোমাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্যটা মৌলিক।

যথা ?

তুমি অনেক বুদ্ধিমান। এটুকু বোঝার ক্ষমতা রয়েছে বলে আমার ধারনা ছিল।

সমীরণের মুখচোখ লাল হয়ে উঠল। সে দাঁতে দাঁত চিপে বলল : আমাকে কেউ অপমান করতে সাহস পায় নি, সে কথাটা মনে রাখলে খুশি হব।

মানুষকে অপমান করার অধিকার একমাত্র তোমারই যে রয়েছে এধারনা তোমার কোথা থেকে হল ?

সমীরণ একটু চুপ করে থেকে বলল : তোমার সঙ্গে প্রতারনা করি নি আমি। তোমাকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। কারণ আমার সমাজ তা সহ্য করত না !

ধন্যবাদ। তোমার পথে কোন বাধার সৃষ্টি করি নি আমি।

বাধার সৃষ্টি করতে পারতে না শীলা। গুঁড়িয়ে যেতে।

শীলা ঘুরে দাঁড়াল : আর কিছু বলবে ?

সমীরণ বলল : অনেক দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল। একদিন তুমি আমাকে ভালবাসতে। ভেবেছিলাম তার কিছুটা তলানিও হয়ত অবশিষ্ট রয়েছে।

শীলার মুখে ব্যঙ্গের হাসি ফুটে বেরলো : আর কিছু ?

সমীরণ বলল : তুমি হয়ত ঠাট্টা করছ। কিন্তু আমি তো জানি........

যে আমি তোমার বিরহে কেঁদে কেঁদে হয় পাগল হয়ে গিয়েছি, আর না হয়, আত্মহত্যা করেছি !

সমীরণ ঘুরে দাঁড়াল ; তারপর শীলার কাছে এসে বলল : তুমি আমাকে তুচ্ছ বলে মনে কর কোন্ সাহসে ?

কারণ, তুমি তুচ্ছ ছাড়া আর কিছু নও।

তুচ্ছ !!

চুপ। পিছিয়ে গেল সমীরণ। মাত্র বছর পাঁচেকের ব্যবধান। সেদিন যে-মেয়েটিকে সে পেলব দেখেছিল, সামান্য হওয়াতেই যে লতার মত কাঁপত, আজ সেই যেন বিরাট মহীরূহতে পরিণত হয়েছে, ঝড়কে সে যে কেবল প্রতিহত করতেই সমর্থ, তাই নয়, পালটা আঘাত করার শক্তিও সে সঞ্চয় করেছে। কিন্তু তবুও সে নিজে অভিজাত। দেশের ওপরতলার লোক। আর শীলা একটি পার্বত্য উপত্যকার হাসপাতালের নার্স। দুজনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে নিশ্চয়। তাকে অস্বীকার করলে চলবে কেন ?

শীলা বলল : ভুলে যেয়ো না, কারও করুণার দরজায় মাথা খোঁড়ার প্রয়োজন নেই আমার। আমি আজ স্বাবলম্বিণী। তোমার মত অপরের সঞ্চিত অর্থের ওপর বাবুয়ানা করি নে।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। এই পাঁচ বছরে তোমার জীবন যে কতটা নোংরা হয়েছে তারও কিছু কিছু সংবাদ আমার কাছে এসেছে। আর এখন তো স্পষ্ট বুঝতেই পাচ্ছি।

ধন্যবাদ।

ভেবেছিলাম, তোমার সঙ্গে যখন দেখাই হল, তখন একটা মিটমাট করে নেব, প্রয়োজন হলে যাতে ভদ্রভাবে জীবন কাটাতে পার তারও ব্যবস্থা করব একটা। কিন্তু সে মোহ আমার ভেঙেছে। ভগবান আমাকে বাঁচিয়েছেন।

শীলা হেসে বলল : তোমাদের ভগবান মহানুভব। কিন্তু এখন পথ ছাড়। ডঃ দত্ত আমার জন্যে অপেক্ষা করে বসে রয়েছেন।

আই সি। দ্যাট কিউপিড অফ এ ডকটর! ভদ্রলোক বুঝি একধারে কিউপিড আর প্রোলিটেরিয়েট!

না। তিনি ডাক্তার!

সমীরণ হেসে বলল; ডাক্তার তো আমরা সবাই। তবে কিনা সকলের মনের অসুখ সারাবার মত শক্তিতো সব ডাক্তারের থাকে না।

কী যেন বলতে গেল শীলা। বলা হল না। রজনী কমপাউণ্ডার হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল : ডঃ দত্ত, আপনাকে এখনই ডাকছেন, এখনই।

হ্যাঁ, চলুন।

সমীরণ দুজনের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। ওরা বেরিয়ে গেল।

২৪

শীলাকে সঙ্গে নিয়ে রজনী কমপাউণ্ডার যে-ঘরে ঢুকলো সেখানে সেই চাঁড়াল রোগীটি রয়েছে। মশারির দিকে চেয়ে রবীন হতভম্বের মত একটি চেয়ারে বসে রয়েছে।

কী ব্যাপার, ডঃ দত্ত?

রবীন কোন কথা না বলে মশারির দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে দিলে।

মশারির একটা কোন তুলে রোগীর দিকে চেয়ে দেখল শীলা। বেঘোরে পড়ে রয়েছে সে। বিরাট একটি অস্থিরতায় তার ভিতরটা ফুলে-ফুলে উঠছে। সেই বেঘোর অবস্থাতেই সে মাঝে-মাঝে এপাশ-ওপাশ করার চেষ্টা করছে; কখনও-কখনও তীব্র ভাবে চীৎকার করার জন্যেই বোধ হয় হাঁ করছে; কিন্তু স্বর রুদ্ধ হয়ে এসেছে তার; ফুসফুসের হাওয়া বোধ হয় জমে উঠছে ক্রমশ।

শীলা ধীরে-ধীরে ফিরে এল রবীনের কাছে।

বাঁচবে তো?

রবীন একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল: কোন সম্ভাবনা দেখছি নে।

কিন্তু বিকেলের দিকেও তো ভাল ছিল।

তা ছিল। আমি নিজে এসেও খুব খারাপ দেখি নি; কিন্তু সন্ধ্যের পর থেকে এই ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই ওর অবস্থার অবনতি হয়েছে। আর, অবনতিটি এই ভাবে এগিয়ে চললে, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ও মারা যাবে।

তা হলেই তো বড ভাবনার কথা হয়ে দাঁড়াল।

রাত্রির সেই নিস্তব্ধ অন্ধকারে দূরে পাহাড়ের ওপাশে শাল-পিয়ালের বনে একটি অস্পষ্ট মাদলের ধ্বনি ভেসে উঠল, ধিতাং, ধিতাং। ধীরে-ধীরে সেই ধ্বনি মৃত্যুর আসন্ন জোয়ারের মত উপত্যকার ওপর দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো। মনে হল, একটি ভয়ঙ্কর আতঙ্ক এখানে এসে আড়ি পেতেছে।

শব্দটি ঘরে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেটির কণ্ঠ থেকে একটি চাপা ক্ষীণ আর্তনাদ বেরিয়ে এল: গরর-গরর।

রবীন বলল: ঐ, ঐ শব্দ। ঐ শব্দটাই কাল হয়েছে ওর।

তারপরেই চীৎকার করে উঠল সে: রজনীবাবু!

রবীনের চীৎকারটি অস্বাভাবিক। এতটা অস্বাভাবিক যে শীলা আর রজনী কমপাউণ্ডার দুজনেই চমকে উঠল।

বিহ্বলের মত আবার চেঁচিয়ে উঠল রবীন : ঐ শব্দ কি কিছুতেই থামবে না? বন্ধ করতে বলুন, বন্ধ করতে বলুন।

রজনী কমপাউণ্ডার প্রথমটায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর শীলার দিকে চেয়ে মাথা চুলকোতে লাগল।

রবীনের স্বর ঝাঁঝালো এবার : অমন করে দাঁড়িয়ে কেন? যান, বন্ধ করতে বলুন।

আজ্ঞে স্যার, ও যে চাণ্ডাদের পরবের বাজনা।

এতক্ষণে রবীন ধাতস্থ হল যেন। সে রজনী কমপাউণ্ডারের দিকে একটু চেয়ে মুখ নিচু করে বলল : ওঃ, তাই বুঝি?

সত্যই তো। ও-বাজনার ওপর রজনী কমপাউণ্ডারের হাত নেই। ওদের কারুরই কোন হাত নেই এ বিষয়ে। তবু, যেমন করে হক, ও-বাজনাটিকে বন্ধ করতে পারলেই যেন ভাল হত। ঐ বাজনাটিই ওর মৃত্যুদূত।

আরও ঘণ্টা তিনেক প্রায় যমে-মানুষে টানাটানি চললো। তারপর রাত্রিশেষের অনেক আগে মাদলের ঐ শব্দ আর একবার হঠাৎ উৎকট হয়ে উঠল। রাত্রির আকাশে সেই শব্দ অসংখ্য হতভাগ্যের কান্নার মূর্ছনায় ভেঙ্গে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। আর সেই সঙ্গে দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করে ঐ ছোকরাটিও চেঁচিয়ে উঠল। তারপর নেতিয়ে পড়ল একপাশে।

ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, বিপর্যস্ত হয়ে ধীরে ধীরে চেম্বারে ফিরে এল রবীন। যে জিনিষটি তাকে সব চেয়ে বিস্মিত করেছে সেটি হচ্ছে ছেলেটির চিন্তার স্বয়ংক্রিয় বৈশিষ্ট্য। হাসপাতালে আসার পর থেকেই ছেলেটি গুমরে-গুমরে কেঁদেছিল। রোগের যন্ত্রনায় যতটা, তার চেয়ে অনেক বেশী আতঙ্কে। আধুনিক চিকিৎসার সরঞ্জাম তার প্রাণশক্তিকে ক্ষীণ করে দিয়েছিল। সে বেশ বুঝতে পারছিল, সে আর বাঁচবে না। একটা অনতিক্রমনীয় কুসংস্কারের পাষানভার তাকে ধীরে ধীরে পিষে ফেলছিল। প্রতিটি উপসর্গ লক্ষ্য করেছে রবীন।

কিছুক্ষণ পরে শীলাও ফিরে এল চেম্বারে। দেখল, একটা ইজিচেয়ারের ওপর গভীর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন রবীন। তার কপালের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। চোখের পাতাগুলিও ভিজে। বহুদিনব্যাপী যুদ্ধে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত সৈনিকের ক্ষণিক অবসর তাকে যে হঠাৎ আচ্ছন্ন করে বসেছে সেটুকু বুঝতে দেরি হ'ল না শীলার। সে এই সুযোগে রবীনের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল একবার। ঘরের তীব্র আলোতে রবীনের মুখের ক্রম-সঞ্চরমান

রেখাগুলি একটি গভীর তাৎপর্য নিয়ে ধরা পড়লো তার কাছে। একটি অপরিতৃপ্ত আত্মবঞ্চনার জ্বালা তখনও তার মুখের ওপর প্রকট হয়ে বসে রয়েছে। আত্মবিশ্বাসভঙ্গের একটি বিস্ময়কর অনুভূতি তার সেই নিদ্রাতুর মনটিকে তখনও অস্থির করে তুলেছে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এল শীলা। তোয়ালের প্রান্ত দিয়ে আলতো ভাবে রবীনের মুখের ঘামবিন্দুগুলি পরিষ্কার করে দিলে। অতি সাবধানে সরিয়ে দিলে মাথার অবিন্যস্ত চুলগুলিকে। তারপর খোলা জানালার কাছে গিয়ে অন্ধকারের দিকে মুখ করে দাঁড়াল।

রজনী কমপাউণ্ডার এসে বলল: ওরা আসছে। লাসটাকে বার করে দিই?

হ্যাঁ। কিন্তু সাবধান, যেন হট্টগোল বাধাতে না পারে।

একি মগের মুলুক? পুলিস আছে না?

রজনী কমপাউণ্ডার চলে গেল। তারই একটু পরে জানালার ভিতর দিয়ে শীলা দেখল দিঘীর পাড়ে আট-দশটা মশাল জ্বলে উঠেছে। সেই মশাল হাসপাতালের দিকে এগিয়ে আসছে।

হাসপাতালের সামনে এসে তারা দাঁড়াল। মৃতদেহটি তাদের হাতে তুলে দেওয়া হ'ল। হঠাৎ একটা কর্কশ শব্দে রাত্রির স্তব্ধতা টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। তারপর, মশালের শোভাযাত্রাটি ধীরে ধীরে পাহাড়তলীর দিকে মিলিয়ে গেল।

সেই বিকট চীৎকারে রবীনের ঘুম ভেঙে গেল।

কি ব্যাপার, মিস লাহিড়ি?

আত্মীয়দের হাতে দেহটা তুলে দেওয়া হ'ল।

রবীন পিছিয়ে এল জানলার কাছ থেকে। হঠাৎ বোধ হয় রাত্রির ঘটনাটি মনে পড়ে গেল তার; একটু পরে বলল: ভাবছি, ডাক্তারি ছেড়ে দেব।

কেন?

আমি এ-দেশের কোন কাজে আসতে পারলাম না, মিস লাহিড়ি।

একদিন না একদিন নিশ্চয় পারবেন, রবীনবাবু।

রবীন ম্লান হেসে বলে: কুসংস্কারের যে পাথর আমাদের বুকের ওপর চেপে বসে রয়েছে তা সরাতে এখনও অনেক অনেক দিন লাগবে। ততদিন আমি বাঁচব না।

শীলা হঠাৎ সরে এল রবীনের কাছে। তার চোখের ওপর চোখ রেখে বলল: এ আপনার অভিমানের কথা। কুসংস্কার কোথায় নেই? যারা শিক্ষার আলো দেখতে পেল না, দোষ কি তাদেরই? আর যারা শিক্ষার আলো দেখল বলে বড়াই করে তারা দিনের পর দিন কী করে চলেছে তা কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না?

রবীন নিঃশ্বাস ফেলে বলল: তা পাচ্ছি কিছু কিছু।

২৫

সেদিন রাত্রিশেষের আকাশ হঠাৎ লাল হয়ে উঠল। যুগপৎ বিস্ময় আর আতঙ্কে আশ্রমবাসীরা দেখল, পূব দিকে আশ্রমের প্রান্ত জুড়ে বিরাট একটি আগুনের কুণ্ড পাক খেয়ে-খেয়ে আকাশের বুকে নেচে বেড়াচ্ছে।

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে অনেকের মত রবীনও হতভম্বের মত সেইদিকে চেয়েছিল।

হাঁপাতে হাঁপাতে রজনী কমপাউণ্ডার দৌড়ে এল; বলল: সর্বনাশ হয়েছে, স্যার। ব্যাটারা আশ্রমে আগুন দিয়ে গেছে। আচার্যদেবকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি আনন্দ মহারাজকে খবর দি গিয়ে।

অনেকের সঙ্গে রবীনও ধাওয়া করল আচার্যভবনের দিকে। দেখল, রজনী কমপাউণ্ডারের কথাই ঠিক। আচার্যভবন আর আশেপাশের খড়ের ঘরগুলি পুড়ছে; দূরে দূরে যে কখানা ছড়ান-ছিটান মেটে বাড়ি ছিল সেগুলিও জ্বলছে। একটু চিন্তা করার অবসর থাকলে যে কেউ বুঝতে পারত যে এই অগ্নিকাণ্ডটি অকস্মাৎ ঘটে নি; এর মধ্যে কোন বিশেষজ্ঞের সুপরিকল্পিত হস্তচালনা রয়েছে।

আশ্রম ভেঙ্গে সবাই প্রায় জুটেছে এখানে; চারপাশ থেকে লোক আসছে আরও। কিন্তু আগুনের দাপট এমন বেশী যে কারও সাধ্য নেই তার সামনে এগিয়ে যায়। আগুনের গোলাগুলি তালগোল পাকিয়ে আশ্রমের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত ছুটাছুটি করছে।

প্রায় ঘণ্টা চারেক পরিশ্রমের পর আচার্যভবনের আগুন নেবানো গেল। তারও অনেকক্ষণ পরে অগ্নিমুক্ত হ'ল আশ্রমটি। অর্থাৎ ভক্ষণ করার মত বিশেষ কিছু আর অবশিষ্ট ছিল না বলেই বোধ হয় অগ্নিদেবকে বাধ্য হয়ে শান্ত হ'তে হ'ল। তারপর পরিষ্কার করার পালা সুরু। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে

একটি বীভৎস দৃশ্য সকলের চোখের ওপর উদ্‌ঘাটিত হল। কালো ছাই, আর পোড়া বাড়ির প্রদর্শনী।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চারপাশ ভরে উঠল মানুষে। ষ্টেশন থেকে পুলিশসাহেব হাজির হলেন তাঁর সেপাইশান্ত্রী নিয়ে। অবস্থাটিকে আয়ত্তে আনলেন।

খাণ্ডবদাহন শেষ হওয়ার পর তদন্তে বসলেন পুলিশসাহেব। কী গেল, আর থাকলই বা কারা, তারই একটা হিসাব-নিকাশ করতে হবে এবার। কে বা কারা এই অগ্নিকাণ্ডের জন্যে দায়ি তারও হদিস চাই একটা।

প্রথম সাক্ষী হিসাবে যখন আচার্যদেবকে খোঁজ করা হ'ল তখনই জানা গেল আচার্যদেব নেই। তাঁর ঘরে শেকল তোলা ছিল। সেই শেকল খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকলো সবাই। ঘরের মধ্যে দগ্ধ, অর্দ্ধদগ্ধ জিনিষের স্তূপ পড়ে রয়েছে। পোড়া কাঠ, ভাঙা আলমারি, আধপোড়া কাঠামোর চালে পথ ওখানে দুর্গম। তার ওপর রয়েছে গন্ধক আর সোরার দুর্গন্ধ।

জায়গাটিকে পরিষ্কার করার পর সেই ঘরের একটি কোন্ থেকে একটি অর্দ্ধদগ্ধ মৃতদেহ আবিষ্কার করা হ'ল। সেই বিকৃত দেহটি যে কার উপস্থিত কেউ তা সনাক্ত করতে পারল না। ঐ একটি মানুষ ছাড়া আর কোথাও প্রায় কোন জীবহত্যা হয় নি।

সেদিন দুপুর থেকেই আশ্রমটি স্তব্ধ হয়ে গেল। আপৎকালীন সমস্ত কানুন শিথিল করা হ'ল। বিকাল থেকেই আবার ট্রেন চলতে সুরু করল। পুলিশ থেকে জানানো হ'ল যে কাউকেই স্থানত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে না; তবে আশ্রমের বর্তমান বিশৃঙখলা, আর জনস্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় এখানে কেউ থাকতে না চাইলেই খুশি হবেন তাঁরা।

সন্ধ্যার সময় সদর হাঁসপাতালের ডাক্তার কৃষ্ণমূর্তি সর্বময় কর্তৃত্ব নিয়ে হাজির হলেন। রবীনের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা হ'ল তাঁর। তারপর পৃথক ভাবে আলোচনা করলেন পুলিশ সাহেবের সঙ্গে। পুলিশ সাহেব রবীনের ওপর প্রসন্ন নন! তাঁর ধারনা, রবীনের গোঁয়ার্তুমির জন্যেই এই রকম একটি অভাবিত ঘটনা ঘটেছে। কেবল তাই নয়; এই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে মানুষের ধর্ম নিয়ে নষ্টামি চলে না; চাণ্ডাদের ধর্মে আঘাত করেছে রবীন। আইনত তার শাস্তি হওয়া উচিত।

পুলিশ সাহেবের সঙ্গে আলোচনা শেষ করে, কৃষ্ণমূর্তি রবীনকে ডেকে পাঠালেন আবার। রবীন এসে বললেন: আপনার আদর্শ আর কর্মোত্তমতার কথা শুনে খুশি হয়েছি। কিন্তু যে-কোন কারনেই হ'ক, এখানের লোকেরা আপনার ওপর অসন্তুষ্ট। যে-কোন মুহূর্তে আপনার বিপদ ঘটতে পারে। সেইজন্যে পুলিশ সাহেব আপনাকে এখানে রাখতে আর ভরসা পাচ্ছেন না। তা ছাড়া, আপনিও বড় ক্লান্ত। মাস কয়েকের ছুটির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আপনার। বিশ্রাম নিন আপনি।

শরীর আর মনের দিক থেকে রবীন সত্যিই বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বিশ্রাম, বিশ্রামই তার চাই।

রবীনের সঙ্গে করমর্দন করে বিদায় নিলেন কৃষ্ণমূর্তি। আশ্রমের পথে বেরিয়ে পড়ল রবীন। বারবার সে বিড়বিড করে বলতে লাগল, হ্যাঁ, ফিরেই তাকে যেতে হবে। এখানে অনেক দিন কেটেছে। আর নয়, আর নয়।

এতদিন সে বুঝতে পারে নি, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তেই সে যেন আবিষ্কার করে বসল যে এখানকার মাটি-পাথর, গাছ-পালাকে সে কেমন হঠাৎ ভালবেসে ফেলেছে। এদের আকর্ষণই আজ তার কাছে তীব্র। তবু উপায় নেই; তাকে চলে যেতেই হবে। আর যতটা তাড়াতড়ি চলে যাওয়া যায় ততই তার পক্ষে মঙ্গল।

পথে মিস্টার পাকডাশীর সঙ্গে দেখা।

আপনি রয়ে গেলেন বুঝি ?

মিস্টার পাকডাশী একটু হেসে বললেন : কোথায় আর যাব ভায়া ? যে-কটা দিন বাঁচি, পাগলা গারদের বাইরে থাকতে পারলেই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব।

তা বটে।

তুমি ?

আমি চলেই যাব।

মিস্টার পাকড়াশীর বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। তিনি বললেন : তোমার দুঃখটা কোথায়, বুঝি আমি। কিন্তু দুঃখ করে লাভ নেই ভাই। এ জগতে যতটুকু পাও, তাই তোমার লাভ। কিছু না পেলেও, অভিযোগ করতে পার না তুমি।

একটু হাসল রবীন। তারপর মাথাটি একবার নুইয়ে সেখান থেকে চলে

গেল। কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে-ঘুরে এক সময় অতিথিভবনের দিকে হাজির হল। অতিথিভবন প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে। এখনও যারা রয়েছেন, তাঁরাও হৈ-চৈ করে বাঁধাছাঁদা সুরু করেছেন। রাত্রি দশটায় স্পেশাল ট্রেন ছাড়বে একটা। এইটিই আজকের শেষ ট্রেন। এবং সেই ট্রেনেই আশ্রমের শেষ অতিথিটিও বিদায় নেবে।

না, তার পরিচিত কেউ নেই; না সুকন্যা, না মিষ্টার তালুকদার।

২৬

শেষ পর্যন্ত নিজের ঘরেই ফিরে এল রবীন। দেখল, টেবিলের ওপর মাথাটি রেখে একটি চেয়ারে বসে রয়েছে শীলা।

কি খবর মিস লাহিড়ি?

চমকে উঠল শীলা। মুখ তুলে চাইল। মুখটা একটু ভারি-ভারিই মনে হল। আর একটু লক্ষ্য করলে দেখা যেত, তার চোখের নিচে শুকনো জল কিছুটা দাগ রেখে গিয়েছে। হয়ত একটু আগে জায়গাটি ভিজে ছিল।

একটু হেসে রবীন বলল: এখানের কাজ সারা হল আমার। এবার নতুন যাত্রাপথের সুরু।

শীলাও হাসল একটু: এই তো জীবন, রবীন বাবু।

দার্শনিকরা তো তাই বলেন। কিন্তু আপনি যাবেন না?

একটু চুপ করে থেকে শীলা বলল: কোথায় আর যাব? আপনি বুঝি কালই চলে যাচ্ছেন?

ইচ্ছে রয়েছে।

সেই ভাল, ডঃ দত্ত।

রবীন শীলার উল্টো দিকের একটা চেয়ারে বসে বলল: আমার ভালমন্দর কথা উঠছে না, মিস লাহিড়ি। আশ্রমের আর সেই সঙ্গে এই অঞ্চলের মঙ্গলের জন্যেই নাকি আমার এখানে থাকা চলবে না।

শীলার স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল: কে বলল? পুলিশ সাহেব?

হ্যাঁ, যাক গে। কিন্তু আপনিই বা পড়ে থাকবেন কেন?

শীলা শান্তভাবে বলল: না থাকলে চলবে না বলে।

একটু আশ্চর্য হয়েই প্রশ্ন করল রবীন: কেন বলুন তো?

বড়-বড় দুটি চোখ তুলে শীলা বলল: কোথায় যাব?

ম্লান হাসল রবীন : তা বটে। ঠিক আমারই মত।

এর পরে দুজনেই চুপ করে গেল। সময় মন্থর হয়ে এল ধীরে-ধীরে। দুজনেই বেশ জানে, তাদের মনের মধ্যে অজস্র কথার গুঞ্জন চলেছে। অথচ সঙ্কোচের বাধা কাটাতে পারছে না কেউ।

শেষপর্যন্ত শীলাকেই মুখ খুলতে হল : জানি, আপনি যথেষ্ট আঘাত পেয়েছেন। আমি কিন্তু খুব আশ্চর্য হই নি।

কেন ?

দেশ যখন অনাচারে ছেয়ে যায় তখনই নাকি বিপ্লব আসে। আশ্রমের ভিতরটাও সেই রকম রোগের ডিপো হয়েছিল। তাকে নষ্ট করার জন্যে এই রকম আগুনেরই দরকার ছিল। এ একরকম ভালই হল, রবীন বাবু।

রবীন হেসে ফেলল এবার, বলল : ওটা তো গেল সান্ত্বনার কথা। কিন্তু যে অশিক্ষা আর কুশিক্ষার ফলে অসুখকে নিয়ে এরা এতটা মারাত্মক খেলা খেলে, তার শেষ কোথায় ? কবে এই অকারণ আত্মহত্যার শেষ হবে বলতে পারেন ?

না ! তবে একদিন না একদিন মানুষ তার ভুল বুঝতে পারবেই।

এবার একটু উঁচু করেই হাসল রবীন ; অনেকটা ব্যঙ্গের মতই শোনাল যেন।

আপনি বুঝি সেইদিনের অপেক্ষাতেই বসে থাকবেন ?

জীবনে যখন আর বিশেষ কোন মারাত্মক প্রয়োজনীয় কাজ নেই, তখন সেটুকুও না পারলে চলবে কেন ?

একটু বিরক্ত হয়েই এবার উত্তর দিল রবীন : আপনি কি ভেবেছেন, কয়েকটা কলেরা, বসন্ত, আর প্লেগের মহামারি রোধ করতে পারলেই মানুষ বাঁচবে ? মানুষের রক্তে-রক্তে যে বিকৃত রুচি আর কুশিক্ষার মহামারি চলেছে তাদের প্রতিরোধ করবে কে ?

দুর্ভাবনার কথাই বটে।

আর কোন কথা বলল না রবীন। চেয়ার ছেড়ে উঠে অস্থির ভাবে ঘরময় পায়চারি করতে সুরু করল।

শীলা রবীনের দিকে চেয়ে বলল : রাত অনেক হয়েছে রবীনবাবু। যে-সমস্যা নিয়ে আপনি এখন উদ্ব্যস্ত হযে পড়েছেন, সেটি অসাধারণ। এখনই যে তার কোন একটা সমাধান হওয়া সম্ভব নয়, তা আমার চেয়েও অনেক বেশী আপনি জানেন। তা চেয়ে, কাল সকালেই যদি যেতে হয়, তাহলে আজ বিশ্রাম করুন।

তবুও কোন উত্তর এল না রবীনের কাছ থেকে। সে একই ভাবে পায়চারি করতে লাগল। তারপর এক সময় হঠাৎ ঘুরে এসে শীলার কাছে দাঁড়িয়ে বলল : আপনার এখানে পড়ে থাকা চলবে না।

শীলা মুখ নিচু করে বলল : বললাম তো, যাওয়ার কোন জায়গা নেই আমার।

আমার সঙ্গে চলুন।

চুপ করে রইল শীলা।

রবীন ধীরে-ধীরে শীলার কাছে এসে তার মাথার ওপর আলতো হাত রেখে ডাকল : শীলা।

শীলা দাঁড়িয়ে পড়ল; তারপর রবীনের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে বলল : না।

না?

শীলার কাছ থেকে দ্বিতীয় কোন উত্তর এল না। রবীনও মুখ নিচু করল। তারপর কিছুটা আত্মগত হয়েই যেন বলল : ওঃ; ভেবেছিলাম........

শীলার স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল : কী? কী ভেবেছিলেন আপনি?

সরাসরি কোন জবাব খুঁজে পেল না রবীন। সত্যিই তো, কী ভেবেছিল সে? শীলার বিষয়ে কিছুই তো ভাবে নি; ভাবার সময়ই বা ছিল কোথায় এতদিন? তবু ঠিক এই মুহূর্তেই সে যেন কিছু একটা ভাবতে সুরু করেছিল, কিছু একটা বলতে চেয়েছিল শীলাকে। কিন্তু কিছুই মনে করতে পারল না।

শীলাই তার ভাবনাটিকে বিশ্লেষণ করে দিলে হয়ত : ভেবেছিলেন বুঝি, শীলা সংসারের একটা আবর্জনা? তাকে দয়া করে একবার ডাকলেই সে কৃতার্থ হয়ে যাবে একেবারে।

রবীন অবাক হয়ে চেয়ে রইল শীলার দিকে। না, না; সে নিশ্চয়ই তা ভাবে নি; ভাবলে শীলার কথাকে কশাঘাত ভেবে সে ওভাবে হঠাৎ চমকে উঠবে কেন?

না, না: কী বলছ তুমি?

ঠিকই বলছি রবীনবাবু। আমার পূর্ব ইতিহাস আপনার অজানা নেই। তাই এভাবে অপমান করার সাহস হল আপনার। না, সুকন্যার কাছে আঘাত খেয়ে তাই ফিরিয়ে দিতে এসেছেন আমার কাছে?

একেবারে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রবীন।

শীলা আবার বলল : কিন্তু সে সম্ভব নয়। না, না, না।

একটা উচ্ছ্বসিত আবেগ চাপতে না পেরে শীলা এক রকম প্রায় ছিটকে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কেন যে সে এসেছিল, কিছুই বলে গেল না। রবীন কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল। হঠাৎ একটা লজ্জার ঢেউ এসে তাকে অকস্মাৎ তলিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পরে সম্বিৎ ফিরে এলে দেখল, সামনে একটি নিরেট দীর্ঘ বোবা দেওয়াল তার দৃষ্টি অবরোধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

স্যার।

একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল রবীন ; বলল : আসুন রজনীবাবু।

আচার্যদেব আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

আচার্যদেব ? কোথায় তিনি ?

এখন যে তিনি কোথায় তা জানি নে। তাঁর একখানা চিঠি রয়েছে আপনার নামে।

রজনী কমপাউণ্ডার তার চাপকানের ভিতর থেকে একটা খাম বার করে রবীনের হাতে দিলে। রবীন পড়ল :

রবি,

কিছুদিন ধরে যে আশংকাটি আমার মনের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত সেইটিই বাস্তবে পরিণত হল। মানুষের ওপর একদিন আস্থা হারিয়েছিলাম বলেই বোধ হয় তারাদাসের ওপর আস্থা স্থাপন করেছিলাম। আমি হয়ত হেরেছি ; কিন্তু যে আগুন সে নিজের হাতে জ্বালিয়েছিল, সেই আগুন তাকেও রেহাই দেয় নি ; তাকেও গ্রাস করে তবে সে শান্ত হয়েছে।

আনন্দধামের আজ মৃত্যু হয়েছে। এর জন্যে আমিও কম দায়ী নয়। আমারও প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। তাই আশ্রমের ভার আপাতত আনন্দ মহারাজের ওপর দিয়ে তীর্থভ্রমণে বেরোলাম। নিতাইকেও সঙ্গে নিলাম। কবে ফিরতে পারব জানি না।

সব দিক থেকে বিবেচনা করে দেখলাম, এখন তোর ওখানে না থাকাই ভাল। সম্ভব হলে, আজ রাত্রিতেই চলে যাওয়ার চেষ্টা করিস। পুলিশ সাহেব তোর ওপর প্রসন্ন নন। কিন্তু যেখানেই থাকিস রজনীকে জানাতে ভুলিস নে ; আর আশ্রমের ডাক গেলে আসতে দ্বিধা করিস নে। শুভমস্তু।

চিঠিটি শেষ করে রবীন মুখ তুলে চাইল একবার।

রজনী কম্পাউণ্ডার বলল : রাত্রি তিনটের সময় জিপ তৈরি থাকবে, স্যার। ঠিক সময়ে আপনাকে ডেকে নিয়ে যাব।

২৭

সমস্ত রাত্রিই ঘুমোতে পারেনি রবীন। বিরাট একটি অস্বস্তিতে এপাশ-ওপাশ করেছে কেবল। গত রাত্রির নির্মম ভয়াতুর কোলাহল আজকের নিশীথ আকাশকে ভারাক্রান্ত করেনি; চারপাশে একটা সীমাহীন স্তব্ধতা থমথম করছে। সবই ঠিক; কিন্তু তবু যেন সে মাঝে মাঝে চমকে উঠেছে; ঘুমের ব্যাঘাত ঘটেছে বারবার।

রাত্রি কত হয়েছে জানে না রবীন। জানালার ভিতর দিয়ে যে-আকাশটা দেখা যাচ্ছে, তার বুকে আজ অসংখ্য নক্ষত্র। চাঁদ নেই সত্য; কিন্তু তাই বলে তার দেখার কোন বাধা হচ্ছে না। দূরের আকাশ, আর তারই নীচে অসংখ্য বনস্পতির নিঃশব্দ উদ্‌বেগ, সে সবই নিজের মনে অনুভব করছে। ক্যাম্প হাসপাতালে এখনও অনেক রোগী। হয়ত তারই আশায় সময় গণছে তারা। কিন্তু সে আর যাবে না ওখানে। আর কেউ যাবে কি না, সে-সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে তার। ক্যাম্পের এলাকা ছাড়িয়ে চারপাশে পাহাড়ে ঘেরা এই উপত্যকাটি, এবং সেইগুলিও অতিক্রম করে জনপদের যে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন টুকরোগুলি এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, সেখানে এখনও কোটি-কোটি বসন্তের পীড়াবীজ আপনাদের মত আবেগে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদের দিকে হয়ত কারও লক্ষ্য থাকবে না। সবই ঠিক; হয়ত আবার ঠিকও নয়। ঘটনা অথবা দুর্ঘটনা যাই ঘটুক, ওদের কথা চিন্তা করার সুযোগ আর তার নেই। কিন্তু এতদিনের ভাবনা আর দুর্ভাবনা তার চিন্তার রাজ্যে যে পদচিহ্ন রেখে গিয়েছে তাদের কি এত সহজে মুছে ফেলা যায়? যদি যেত!

স্যার!

আমি তৈরি রজনীবাবু। আসুন।

রজনীবাবু ঘরে ঢুকে এল; বলল : যাওয়ার সময় একটা যদি ক্যারেকটার সার্টিফিকেট দিয়ে যান, স্যার, হাজার হক নতুন মনিব।

রবীন হেসে বলল : আপনিই তো আপনার নিজের সার্টিফিকেট, রজনীবাবু।

একগাল হেসে মাথা দুলিয়ে রজনীবাবু বলল : তা যা বলেছেন, স্যার।

টেকনিক্যাল ম্যান ; যেখানে যাব, লুফে নেবে। এখন চলুন, স্যার ; আপনাকে পৌঁছে দিয়ে তবে আমার ছুটি আপনার জিনিষপত্র সব জিপে তুলে দিয়েছি।

রবীন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল : জিনিষপত্র গোছাল কে ?

আবার কে ? ঐ শীলা। বললে কি শোনে ? কত করে বললাম, যে আমাকে ভার দিয়ে তুমি শুতে যাও। তা, কে কার কথা শোনে ? আমি আপনাকে সত্যি বলছি, এত বড় একগুঁয়ে মেয়ে আমি জন্মে দেখি নি। আচ্ছা, আসুন স্যার।

অন্ধকারে মিলিয়ে গেল রজনী কমপাউণ্ডার।

তারও একটু পরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল রবীন। এ-পথে সে অনেকবারই হেঁটেছে ; কিন্তু আজকের মত উদাসীন তাকে আর কোনদিনই মনে হয় নি। সে শীলার জন্যেই অপেক্ষা করেছিল কিছুক্ষণ। যদি সে আসে। কিন্তু শীলা এল না। যাওয়ার সময় তার সঙ্গে দেখা হলে কিছুটা শান্তি পেত রবীন। এখানকার সকলের কাছ থেকেই সে সুস্থ চিত্তে, স্বাভাবিকভাবে বিদায় নিয়ে যেতে চায়।

অন্ধকারে ঢাকা দুপাশে অজস্র পরিচিতির মধ্য দিয়ে ধীর পায়ে নেহাৎ পরদেশীর মতই সে এগিয়ে চলল। কেউ তাকে বিদায় দিতে এল না, কেউ দাঁড়াল না তার পথ রোধ করে। গোটা পৃথিবীটাই যেন আজ আফিঙের নেশায় আত্মজ্ঞান হারিয়ে শেষ মুহূর্তের জন্যে নিস্তব্ধ হয়ে প্রহর গনে চলেছে। জীবনের সমস্ত কিছু উত্তেজনা, আর হাহাকার আজ এখানে শান্ত, প্রতিহত।

জিপের হর্ণ শোনা গেল। সম্বিৎ ফিরে এল রবীনের। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল সে। অন্ধকারে প্রধান ফটকের পাশে জিপটি দাঁড়িয়ে। দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। একবার শেষবারের মত পিছন ফিরে গোটা আশ্রমটির দিকে চেয়ে দেখল রবীন। অন্ধকারে কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে তার চোখ দুটি ! কার নিঃশব্দ পদসঞ্চার শোনার আগ্রহে তার কান দুটি তখনও সজাগ হয়ে রয়েছে।

কিন্তু না ; কেউ কোথাও নেই।

ঘুরে দাঁড়াল রবীন ; তারপর জিপের দরজাটি খুলে ভিতরে আসার চেষ্টা করল।

জিপের দরজাটি খোলার সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে একটি নরম হাত এসে তাকে টেনে ভিতরে তুলে নিলে।

চমকে উঠল রবীন : শীলা!

হ্যাঁ। উঠে এস।

রবীনের চোখ ছাপিয়ে অকারণে কিছুটা অশ্রু উপচে পড়ল। ভাগ্যে জিপের মধ্যে অন্ধকার জমাট বেঁধে বসে ছিল, তাই কেউ কাউকেই দেখতে পেল না। সে কেবল শীলার হাতটি নিজের হাতের মধ্যে পরম নির্ভরতায় ধরে রইল।

ড্রাইভারের পাশ থেকে রজনী কমপাউণ্ডারের গলার আওয়াজ শোনা গেল : চল না হে। রাত যে পুইয়ে গেল।

জিপ চলতে সুরু করল।